জীবনখাতার কয়েক পাতা

প্রথম খণ্ড

শ্রীসুনির্মল বসু

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-১২

: প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ :
১৩৬২

দাম : তিন টাকা আট আনা

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
[illegible] প্রামাণিক কর্তৃক ১৫এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা-৬
'সাধারণ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত

ভূমিকা

আমার জীবনী লেখার দায় আমার নয়। আমার আত্মকথা পড়ে' কার কি উপকার হবে জানি না। কোনদিনই ভাবি নাই আমার আত্মচরিত লিখতে হবে, কোনোদিন ইচ্ছাও ছিল না,—বরং আপত্তিই ছিল বরাবর। আমার অনুজপ্রতিম বিখ্যাত 'ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী'র স্বত্বাধিকারী শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক আমাকে ক্রমাগত তাগিদ্ দিয়ে এবং তাড়া দিয়ে এই অপকর্ম করিয়েছেন। কাজেই যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে তার জন্যে দায়ী তিনিই,—আমি নই।

এই আত্মচরিতের এই অংশ লিখ্তে গিয়ে সম্পূর্ণ স্মৃতির উপর আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে। তাতে হয়তো অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় বাদ পড়ে' গেছে আর অপ্রয়োজনীয় এবং অবান্তর কথা এসে পড়েছে। ঘটনাগুলিও হয়তো অনেক জায়গায় ঠিক্ পর্যায়ক্রমে সাজানো হয়নি—কিছু এদিক্-ওদিক্ হয়ে গেছে। কারণ আমার স্মৃতির উপর তেমন আস্থা রাখ্তে পারিনি। তবে মোটামুটি ঘটনাগুলি ঠিক্ই রাখবার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। অনেক জায়গায় অনেক ঘটনা যেমন বাদ পড়ে গেছে, আবার অনেক ঘটনা স্বেচ্ছায় বাদ দিতে হয়েছে।

চাকুরিয়া
৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৬২

শ্রীসুনির্মল বসু

শ্রীসুনির্মল বসু (মধ্য-বয়সে

ইস্কুলের পাঁচ বন্ধু (১৯২০ সাল)

দাঁড়ানো—(বাম দিক থেকে) অজিত নাগ, অরুণ ঘোষ (পাখী)

বসা—(বাম দিক থেকে) আমি, শান্তি রক্ষিত, সুশীল মিত্র

—এক—

সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর রাত প্রায় বারোটায় আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ মেঘের ফাঁকে হেসে উঠল। আঁতুর-ঘরের খোলা জানালা দিয়ে এক ঝলক জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়লো মেঝের উপর। বাড়ীতে হৈচৈ শুরু হোলো, শাঁখ বেজে উঠ্‌লো, উলুধ্বনি হতে লাগল, আমি ভূমিষ্ঠ হলাম। (৪ঠা শ্রাবণ, বাংলা ১৩০৯ সাল, ইংরেজী ২০শে জুলাই, ১৯০২ খৃষ্টাব্দ)।

গিরিডি শহরের এ অঞ্চলটার নাম মকৎপুর। এখন যেখানে সাধারণ ব্রহ্ম-মন্দির আছে,—তারই খুব কাছে, হাবুর মায়ের বাড়ী নামে খ্যাত এক বাড়ীতে আমার দাদামশাইরা থাকতেন। সেখানেই অর্থাৎ মামাবাড়ীতেই আমি জন্মগ্রহণ করি।

আমাদের দেশ পাকিস্থানের ঢাকা জেলার অন্তর্গত মালখাঁনগর গ্রাম। বাবা ৺পশুপতি বসুঠাকুর কৃষ্ণনগরে পড়তেন,—সেখানে তাঁর ভীষণ ম্যালেরিয়া হয়,—তাতে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে।

দাদামশাই ৺মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা গিরিডিতে অভ্রের কারবার করতেন। তিনিই বাবাকে সেখানে আনেন। তখন গিরিডির জল-হাওয়া ছিল খুব ভালো। বাবার ভাঙা-স্বাস্থ্য অল্প দিনেই সেরে ওঠে। তিনি ছিলেন দাদামশাইয়ের বড় জামাই। কাজেই আমিও তাঁর বড় নাতি হয়ে প্রচুর আদর যত্নে মানুষ হতে লাগ্‌লাম। আমার আগে আমার দিদির জন্ম হয়েছিল,—তিনি আমার চেয়ে মাত্র দেড় বছরের বড়।

সে সময় দাদামশাইয়ের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই সচ্ছল। অভ্রের কারবারে তাঁর অজস্র ধনাগম হচ্ছে। অতি জনপ্রিয় দরদী লোক ছিলেন তিনি। তাঁকে সে সময়ে বলা যেত 'Prince of mica mines.'

টাকা থাক্‌লেই হৃদয় বড় হয় না। কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণের পরিচয় যে একবার পেত সেই মুগ্ধ হয়ে যেত। কত অজানা অচেনা লোককে তিনি ঘরে ঠাঁই দিয়েছেন, রাস্তার লোককে ডেকে ডেকে এনে ভাত খাইয়েছেন। প্রার্থী এসে কোনো দিন শূন্য হাতে ফিরে যায় নাই। কত যে সাধু-সন্ন্যাসীর দর্শন আমরা পেয়েছি সে বাড়ীতে তার আর সীমা সংখ্যা নাই।

আমার দিদিমা ৺মনোরমা দেবীকে আমি চোখে দেখি নাই। তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর সাধিকা ছিলেন। শুনেছি, ধ্যান করতে বসে তাঁর সমাধি হোত—আর সেই অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন।

প্রতি রবিবার দুপুরে দাদামশাই কাঙালী-ভোজন করাতেন। হাজার, দু'হাজার কাঙালী আমাদের বাড়ীর কাছের প্রকাণ্ড মাঠে এসে জড় হোত। ডাল, ভাত, তরকারী তারা পেট পুরে পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেত। এই উপলক্ষ্যে বাড়ীতে যে পরিমাণে ভাত, ডাল, তরকারী রান্না হোত তার কথা ভাব্‌লে এখনও অবাক হয়ে যেতে হয়।

মামাবাড়ীতে অনেক দারোয়ান ছিল, পাঞ্জাবী, নেপালী প্রভৃতি। একজন পাঞ্জাবী দারোয়ানকে আমি বড়ই ভয় করতাম। তাকে দেখলেই আমি ভয়ে পালাতাম। প্রকাণ্ড ছিল তার চেহারা, গায়েও ছিল অসীম জোর। সে বাঁ-হাত দিয়ে আকাশে টেনিস বল্ ছুঁড়ত, আর সে বল্ এত উঁচুতে উঠ্‌ত যে আমরা প্রায় চোখেই দেখতে পেতাম না। তার নাম ছিল রাম সিং।

মামারা বাইরের ঘরে বসে টাকার হিসাব করতেন। টেবিলের উপর রাশি রাশি টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি সব সারি সারি সাজানো থাকত, আর ক্রমাগত টাকা বাজাবার ঠং ঠং আওয়াজ শুন্‌তাম। সেখানে গিয়ে যদি বিরক্ত করতাম—তবে বড়মামা গম্ভীর হয়ে ডাক্‌তেন "রাম সিং!" আর আমরা অম্‌নি হাওয়া। মামারা আমাদের এই দুর্বলতা জান্‌তেন। তাই রামসিংয়ের নাম

করলেই আমাদের আর সে তল্লাটে খোঁজ পাওয়া যেত না। রাম নামে ভূত পালায়, আমরাও রামসিংয়ের নামে অদৃশ্য হতাম।

দাদামশাইকে সবাই খুব শ্রদ্ধাভক্তি করলেও বিশেষ একটা শ্রেণী তাঁকে সুনজরে দেখত না। এই শ্রেণীটি হচ্ছে বৃটিশ সরকারের পুলিশ-বাহিনী।

দাদামশাই রাজনৈতিক নেতা, গরম গরম বক্তৃতা দেন, বৃটিশের বিরুদ্ধে উত্তেজনামূলক প্রবন্ধ লেখেন, কলকাতার বিপ্লবীদের কাগজ 'নবশক্তির' সম্পাদনা করেন। শ্রীঅরবিন্দ, বিপিন পাল, অশ্বিনী দত্ত প্রভৃতির অন্তরঙ্গ বন্ধু। গোপনে বিপ্লবীদের সাহায্য করেন। বাড়ীতে অনুশীলন-সমিতির সভ্যদের আশ্রয় দেন। তাঁর সেজ ছেলে অর্থাৎ আমার সেজমামা ৺চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা তাঁরই প্ররোচনার ফলে কিশোর বয়সে বরিশাল শহরে বে-আইনী 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করার অপরাধে পুলিশের লাঠির ঘা খেয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় পুকুরের জলে পড়েন। রক্তে পুকুরের জল লাল হয়ে ওঠে।

কাজেই পুলিশ, সি-আই-ডি নানাভাবে নানাবেশে এসে তাঁর খোঁজ নিয়ে যায়। তাদের নজরে লোকটা নাকি 'সাংঘাতিক' শ্রেণীর। বেশীদিন একে বাইরে রাখা চলে না। দাদামশাইয়ের চিঠিপত্র সব তারা পড়ে দেখে।

একদিন বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। মেয়েরা কেঁদে আকুল, মায়ের বুড়ী ঠান্‌দি ডাক ছেড়ে চিৎকার করতে লাগলেন। আশে পাশের বাড়ীর লোক জমে গেল। আমরা ছেলেমানুষ, বিশেষ কিছুই বুঝ্‌লাম না, শুধু বুঝলাম হঠাৎ বাড়ীতে কোনো বিপদ এসে উপস্থিত হয়েছে।

পুলিশ দাদামশাইকে ধরে নিয়ে গেল-আর বিনা-বিচারে তাঁকে নির্বাসিত করলো ব্রহ্মদেশের ইন্‌সিন জেলে। পরে শুন্‌লাম, দাদামশাইয়ের এক কর্মচারী খাদ থেকে চিঠি

লিখেছিলেন,—'১২ বোঝা মাল পাঠাইলাম'। বুদ্ধিমান পুলিশ 'বোঝা'টাকে পড়লো 'বোমা' আর তাতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হোলো। আব্ছা মনে পড়ে, দেশী পুলিশের সঙ্গে সেদিন একজন ভীষণ লালমুখো ইংরাজ এসেছিল।

এর মধ্যে আমরা ছেলের দলে ভারী হয়ে উঠেছি। আমার আরো দু-একটি ভাই জন্মেছে, মামাতো ভাইদের জন্ম হয়েছে, প্রায় সবাই পিঠাপিঠি। কাজেই এক সঙ্গেই খেলাধূলা করে দিন কাটাই। আনন্দেই দিন কাটে।

একদিন সেই ভয়ঙ্কর রাম সিং বিদায় নিয়ে দেশে চলে গেল। আমরাও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্লাম।

হাবুর মার বাড়ীটি ছিল দুই অংশে ভাগ করা। এক অংশে আমরা থাক্তাম, অন্যটিতে হাবুরা। বাড়ীর বাগান ছিল প্রকাণ্ড। বাগানের সামনের অংশ থেকে পিছনের অংশটাই ছিল বড়। সে অংশটা আমাদের কাছে বড়ই রহস্যময় ছিল। বড় বড় আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি গাছে সে অংশটা ছিল পূর্ণ। আমরা ছেলের দল সেদিকে যেতে সাহস করতাম না। শুন্তাম, বড় বড় ময়াল সাপ আছে সে দিক্টায়। চাঁদনী-রাতে নাকি পরী নামে ঐখানে।

এক একদিন স্তব্ধ দুপুরবেলায় ঘরের জানালা খুলে বাগানের ঐ অংশটার দিকে তাকিয়ে থাক্তাম। দেখ্তাম এলোমেলো বাতাস বইছে। গাছের ডালপালাগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে; ঝুর্ ঝুর্ করে পাতা ঝরে' ঝরে' পড়ছে, আর সেই ঝরাপাতার গাদার মধ্যে কী যেন সুড়্ সুড়্ করে এগিয়ে আস্ছে আমার জান্লার দিকে। ময়াল সাপ নয় তো? দড়াম্ করে জান্লা বন্ধ করে ছুটে পালাতাম।

একদিন মায়ের ঠান্দি বারান্দায় বসে খই ভাজ্ছিলেন। এমন সময় কি যেন একটা হল্হলে বস্তু তাঁর হাতের উপর দিয়ে পিছলে গিয়ে সড়াৎ করে উঠানে পড়ল।

তিনি চিৎকার করে উঠ্‌লেন। দেখা গেল একটা মস্ত সাপ। তাকে তক্ষুণি সাবাড় করে ফেলা হোলো।

চাঁদনী-রাতে পরী দেখার সাহস হয় নি। তবে, কান্‌ পেতে শুনেছি কত রকম শব্দ উঠ্‌ছে ঐ বাগানটা থেকে। ঝুর্‌ ঝুর্‌ ঝির্‌ ঝির্‌, পরীরা ঘুঙুর পায়ে নাচ্‌ছে নাকি ?

বর্ষাকালে একদিন আমাদের উঠানটা জলে ভরে গেল। আমাদের চাকর মোহনা, বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে উঠানের নর্দমাটা সাফ করতে লাগ্‌ল যাতে জল বেরিয়ে যায়। হঠাৎ বাঁশ দিয়ে খোঁচা মারতেই সেই বাঁশে ভর দিয়ে ভিতরে এলো এক পাতিহাঁস, সেই রহস্যময় বাগানটার দিক থেকে। ভারী মজা লাগ্‌ল সেই দৃশ্য দেখে।

আমাদের বাড়ীর বাইরের বারান্দায় একদিকে বাতিল করা অভ্রের কুচো গাদা করা থাকৃত। তার উপরে আমরা লাফালাফি খেলা করতাম। একদিন আমার মামাতো ভাই পলু (শ্রীস্বদেশরঞ্জন গুহঠাকুরতা, বর্তমানে নিউ দিল্লীর পদস্থ রেল-কর্মচারী) সেখান থেকে কয়েকটা ছোট ছোট সম্পুর্ণ গোলাকার ডিম আবিষ্কার করে আমাকে দেখালো। ঐ অদ্ভুত ডিমগুলো পেয়ে আমি আরো ডিমের খোঁজ করতে লাগলাম সেই অভ্রের গাদার মধ্যে। এমন সময় বড়মামা এসে প্রশ্ন করলেন "কী খুঁজছিস্‌ ওখানে ?"

"ডিম।"

"কিসের ডিম ?"

ডিমগুলি তাঁকে দেখাতেই তিনি বল্লেন "শীগ্‌গির পালিয়ে আয়, ওগুলি সাপের ডিম। নিশ্চয় সাপ আছে ওখানে।"

আর একদিন শোনা গেল সেজমামাকেও পুলিশ ধরতে আস্‌ছে। আবার বাড়ীতে শোকের ঝড় উঠ্‌ল। মায়ের বৃদ্ধা ঠান্‌দিকে আমরাও ঠান্‌দি বলে ডাকতাম। তিনি আবার চিৎকার করে' বাড়ী ফাটিয়ে সমস্ত পুলিশের মুণ্ডপাত্‌ করতে লাগ্‌লেন।

সেজমামা তাড়াতাড়ি স্নান করে' খাওয়া-দাওয়া সেরে প্রস্তুত হয়ে রইলেন পুলিশের সঙ্গে শ্রীঘরে যাবার জন্যে। কিন্তু পুলিশ আর আসে না। সেজমামা অস্থির হয়ে থানায় খবর জান্‌তে পাঠালেন,তারা কখন তাঁকে ধরতে আস্‌ছে। তাঁর বৃথা সময় নষ্ট হচ্ছে। পুলিশ খবর পাঠালো তাঁকে গ্রেপ্তার করবার কোনো কথাই ওঠেনি।

একদিন রাত্রে আমরা ঘুমিয়েছি,—এমন সময় মা আমাদের ধাক্কা দিয়ে তুল্‌লেন—"শীগ্‌গির ওঠ, বাড়ীতে আগুন লেগেছে।" বাড়ীর সবাই উঠে পড়েছে। আমরা তাড়াতাড়ি বাইরের মাঠে এলাম। দেখলাম,—খোলার চালের বাতায় দাউ দাউ করে' আগুন জ্বল্‌ছে।

ব্যাপারটা কী ঠিক বুঝ্‌লাম না। আগুন তাড়াতাড়ি নিভিয়ে ফেলা হোলো। ক্ষতি বিশেষ কিছু হোলো না। কেউ বল্লে,—"চোর এই কাজ করেছে।" কেউ বল্লে— "এ ডাকাতের কাজ।" ঠান্‌দি বল্লেন,—"পুলিশ ছাড়া আর কারুর কাজ এ নয়।"

শেষে জানা গেল, আমাদের ঝি ঝানিয়ার হাত থেকে কেরোসিনের কুপী পড়ে যাওয়ায় এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। প্রথম একটা কাপড়ের বোঁচকার উপর আগুন লাগে তারপর ক্রমে চালে আগুন ধরে।

এই সময়ে আমাদের মামাদের নিজস্ব বিরাট বাড়ী তৈরী হচ্ছে খুব কাছেই। প্রায়ই বাড়ী দেখ্‌তে যাই, আর কৌতুহলে মিস্ত্রিদের কাজ দেখি ভাইরা মিলে। খুব মজা লাগে।

একদিন বাড়ী তৈরী করবার সময় ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে একজন রাজমিস্ত্রি মারা গেল। তাই শুনে আমার মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। এই রাজমিস্ত্রিটি আমাদের খুবই চেনা ছিল। তার হাস্যময় মুখটা আমার আজও মনে পড়ে।

—দুই—

একদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দেখ্‌লাম বাড়ীতে খুব সোরগোল পড়ে গেছে।

মা আমাদের ছেলের দলকে সাজাতে লাগলেন। কয়েকটি চাদর আগে থেকেই গেরুয়া রঙে ছোপানো হয়েছিল। তাই দিয়ে আমাদের মাথায় পাগ্‌ড়ী বেঁধে দিলেন। পরিষ্কার ধুতী, জামা পরলাম। শুন্‌লাম চৌদ্দ মাস পরে সেইদিন দাদামশাই আস্‌ছেন খালাস হয়ে। মামারা ষ্টেশনে গেছেন তাঁকে আন্‌তে। আমরা বাড়ীতে গান গেয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করব।

একটি গান আমরা শিখেছিলাম, ঠিক্ হোলো দাদামশাই বাড়ী এসে পৌঁছালেই সমস্বরে আমরা সেই গানটি গাইব।

গানটির কয়েকটি লাইন আমার মনে আছে,—

"বন্দে মাতরম্, মাতরম্—
উঠ্‌ছে ধ্বনি কি মধুরম্,—
মরতের জয়ধ্বনি স্বর্গের আসন কাঁপাইল।"
ইত্যাদি।

মনে পড়ে ঐ 'মরতের জয়ধ্বনি' কথাটা আমরা 'বারো তেরো জয়ধ্বনি' বলে উচ্চারণ করতাম। ঠিক মানে বুঝতাম না।

দাদামশাই একটু বেলায় বাড়ী পৌঁছালেন। সঙ্গে চেনা-অচেনা অনেক লোক এলো। খবর পেয়ে গিরিডি শুদ্ধ লোক ভেঙে পড়লো আমাদের বাড়ীতে। ঐ ভিড়ের স্রোতে আমরা তলিয়ে গেলাম। তাঁকে আর গান গেয়ে অভ্যর্থনা করা হোলো না।

দাদামশাই তাঁর এই বন্দীজীবন অবলম্বনে "নির্বাসন কাহিনী" নাম দিয়ে একখানা চমৎকার বই লেখেন।

এই সময়ে স্বদেশী আন্দোলনের যুগ চলেছে সারা বাংলায়,—তার ঢেউ এসে পড়েছে সারা ভারতের আনাচে-কানাচে। পুলিশের চর ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা দিকে। অচেনা কোনো লোক এলেই সন্দেহ হয় পুলিশের চর বলে।

শ্রীঅরবিন্দের ভাই বারীন্দ্রকুমার, রবীন্দ্রপুত্র রথীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সে সময় প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আস্‌তেন।

দাদামশাই আদেশজারি করলেন, বাড়ীতে কেউ কোনো বিলাতী জিনিষ ব্যবহার করতে পারবে না।

কিছুদিন পর আমরা কয়েকদিনের জন্যে উঠে গেলাম, গিরিডির পচম্বা অঞ্চলে! দাদামশাই সেখানে 'গোলবাংলা' নামে প্রকাণ্ড এক বাড়ী ভাড়া করলেন।

এ জায়গাটি বড় সুন্দর। বাড়ীর কাছে প্রকাণ্ড মাঠ, আশে পাশে ছোট বড় পাথরের টিলা, আর সাম্‌নেই তর্‌তর্‌ করে বয়ে যাচ্ছে শ্লেট নদী। তখন এ জায়গাটা ছিল বেজায় ফাঁকা,—দূরে দূরে কয়েকটি বাড়ী, দোকান বাজার অনেক দূরে।

বড়লোক বলে দাদামশাইয়ের খুব নাম-ডাক হয়েছিল। এত ফাঁকা জায়গায় ডাকাতি হতে পারে বলে দাদামশাই বাড়ীতে একজন বলিষ্ঠ দারোয়ান রাখলেন,—নাম তার রাবণরাম। লোকটার চেহারা দেখে তাকেই ডাকাত বলে সন্দেহ হোত। কিন্তু আসলে লোকটা ছিল বড়ই ভালো।

সে আমাদের বেড়াতে নিয়ে যেত ঐ শ্লেট-নদীর ধারে, উঁচু টিলাগুলির দিকে, আরো কত জায়গায়। তার কাঁধে চাপ্‌তাম, কোলে চাপ্‌তাম, সে আমাদের কাছে তার দেশের গল্প বল্‌ত খৈনি খেতে খেতে।

হাতে পাকিয়ে সে মোটা মোটা রোটা তৈরী করত আর ছোলার ঘন ডাল দিয়ে তাই খেত। আমরা হাঁ করে' তাই দেখতাম।

তখনো লেখা পড়া কিছু আরম্ভ করি নি, মুখে মুখে কিছু কিছু ছড়া শিখেছি, যেমন—

"আম পাতা জোড়া-জোড়া,
মারব চাবুক, চল্‌বে ঘোড়া।"

গাছ থেকে আম পাতা পেড়ে দুটি পাতা এক সঙ্গে লাগিয়ে একটু আল্‌গা করে আবার টান্‌তেই খটাস্ খটাস্ করে আওয়াজ হোত,—আর মুখে মুখে ঐ ছড়াটা বল্‌তাম।

বাড়ীর খিড়কীর দরজায় একটা আতা গাছ ছিল। আতা পাতার সোঁদা গন্ধ আমার খুব ভালো লাগ্‌ত। তাই তার পাতা ছিঁড়ে একটু কচ্‌লে গন্ধ শুঁক্‌তাম। একদিন একটা পাখী এসে বস্‌লো সেই আতা গাছে। কী পাখী জানি না। ছড়া মুখস্থ ছিল, বল্লাম,—

"আতা গাছে তোতা পাখী,
ডালিম গাছে মৌ,
কথা কওনা কেন বৌ?"

পাখীটা ডানা ঝট্‌পট্ করে উড়ে পালালো আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে।—

বাড়ীর ধারে ছিল মেহেদী গাছের ঝাড়। সেই ঝাড়ের পাতা থেঁত্‌লে আমরা নোখ্ রঙ করতাম।

ঐ সময়ে আমার মামা সম্পর্কীয় একটি ছেলে এসে জুট্‌ল,—আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। ভীষণ চট্‌পটে আর ডান্‌-পিটে ছেলে।

তার সঙ্গে মিশতে যাই, আর পিছিয়ে হটে আসি। বুদ্ধিতে তার ধারে-কাছেও যেন ঘেঁষতে পারিনা। সেও আমাদের মত হাঁদা-গোবিন্দদের সঙ্গে মিশে সুখ পায়না।

এক এক দিন দেখা যেত মাঠের কোনো ছাড়া ঘোড়ার পিঠের উপর ঝুঁটি ধরে' বসে সে 'জন্ গিলপিনে'র মত মাঠের মধ্য দিয়ে বেগে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

একদিন ঘুড়ি উড়িয়ে সে এক চিল ধরে' ফেল্ল। চিলটাকে কায়দা করে' সুতোয় জড়িয়ে অতি তৎপরতার সঙ্গে সে মাটিতে নামিয়ে আন্‌লো। আমরাতো দেখে অবাক্।

একদিন অনেক বেলা পর্যন্ত সে বাড়ী ফেরেনা। বাড়ীর লোকেরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন, পরের ছেলে গেল কোথায়? অবশেষে দেখা গেল একটা কাঠের চাকাওলা ছোট কেরোসিন কাঠের বাক্সে সে বসে আছে, আর আমাদের এক ছোকরা চাকর দড়ি দিয়ে তা টেনে নিয়ে আস্‌ছে হাঁফাতে হাঁফাতে।

গুরুজনেরা প্রশ্ন করলেন,

"কোথায় গেছিলি এত বেলা পর্যন্ত?"

ছেলেটি হাসি মুখে উত্তর দিল, "একটু বেরিয়ে এলাম, প্লেট নদীর ওপার থেকে।"

তার বুদ্ধির বহর দেখে আমরা অবাক্ হয়ে যেতাম, আর মনে মনে তাকে খুব সমীহ করতাম।

কিছুদিন এখানে থাকার পর আবার ফিরে গেলাম সেই মকৎপুরের হাবুর মার বাড়ীতে। এখানে কিছুদিনের জন্যে কেন যে এসেছিলাম তা আমার ঠিক মনে নাই।

দাদামশাইদের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই ভালো হচ্ছে। সেটা মোটর গাড়ীর যুগ নয়; মোটর গাড়ী আমরা চোখেও দেখিনি। তাই আমাদের বাড়ীতে এলো খুব দামী পাল্‌কী গাড়ী আর বড় বড় তেজী ঘোড়া।

হঠাৎ একদিন একটা ঘোড়া ক্ষেপে গিয়ে আস্তাবলের সহিসের ছেলের গালের খানিকটা মাংস কামড়ে ছিঁড়ে নিল।

ছেলেটি অনেকদিন ভুগে তারপর ভালো হোলো। তার গালের ঘা অনেকদিন পর্যন্ত আমরা দেখেছি।

মামাদের নতুন বাড়ী তৈরী হয়ে গেল, মামাদের সঙ্গে আমরাও সে বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লাম।

বাড়ী নয়তো যেন রাজপুরী। বাড়ীটি একতলা, কিন্তু এত উঁচু তার ভিত্ যে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠ্তেই পা ধরে' যেত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর, ভিতরের দিকে প্রকাণ্ড চাতাল, আর তার পর বাড়ীর উঠান। সেই উঠানটা এত বড় যে আমরা ছেলেরা সেখানে ক্রিকেট পর্যন্ত খেলতাম। উঠানের চারিধারে নানামহল, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, ঢেঁকি ঘর ইত্যাদি। তা ছাড়া ফল ফুলের বাগান তো ছিলই।

দাদামশাইয়ের কারবারের অবস্থা জেনে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্মে তাঁর অংশীদার হয়েছিলেন।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, আমার দুই মামা (রাঙামামা ও ছোটমামা) শান্তিনিকেতনের প্রথম দিক্কার ছাত্র।

রাঙামামা যোগরঞ্জন গুহঠাকুরতা শান্তিনিকেতনেই ছাত্রাবস্থায় মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ আকুল হয়ে এই গানটি গেয়েছিলেন—

"অল্প লইয়া থাকি তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়,
কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে
প্রাণ করে' হায় হায়।
নদী-তট সম কেবলি বৃথাই
প্রবাহ আঁকড়ি' রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া
ঢেউগুলি কোথা যায়।"
ইত্যাদি।

রাঙামামার সমাধি এখনো হয়ত শান্তিনিকেতনে আছে।

—তিন—

আমার ঠাকুরদার নাম ছিল ৺গিরীশচন্দ্র বসু ঠাকুর। তিনি সেকালে বাংলার একজন বিখ্যাত দারোগা ছিলেন। তাঁর জীবনে অনেক বড় বড় ডাকাত ধরে' তিনি সরকার থেকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। তাঁর লেখা একটি চিত্তাকর্ষক বই "সেকালের দারোগার কাহিনী" আমরা ছেলেবেলায় পড়েছি। ডাকাত ধরার অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী তাতে আছে। সেই বইটি আজকাল আর কোথাও দেখি না।

আমার ঠাকুরমাও কবিতা লিখতেন। কাজেই উত্তরাধিকার সূত্রে বাবাও বেশ সাহিত্য-রসিক হয়েছিলেন। ছেলেবেলায় বাবার আলমারীতে আমরা কত ভালো ভালো বই দেখেছি। ৺মোহিত সেন সম্পাদিত রবীন্দ্র কাব্যগ্রন্থ সমস্ত খণ্ডগুলিই আমাদের ছিল, তাছাড়া, শেলী, ওয়ার্ডসোয়ার্থ, বাইরণ সেক্স্পীয়ার প্রভৃতির লেখা মূল্যবান সংস্করণের গ্রন্থগুলিও বাবা কিনে তাঁর আল্মারীতে রেখেছিলেন।

প্রথম জীবনে বাবা গিরিডি স্কুলে মাষ্টারি করতেন। শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, শ্রীঅমল হোম প্রভৃতি বাবার কাছে পড়েছেন শুনেছি। এখনো তাঁরা বাবার নাম, মাষ্টারমশাই বলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেন।

আমার জন্মের সময় আকাশে মেঘের ফাঁকে পূর্ণিমার নির্মল চন্দ্র উঠেছিল বলে বাবা আমার নাম রাখলেন নির্মলচন্দ্র। পরে তার পরিবর্তন করেন। আমরা চার ভাই, চার বোন। এক দিদি ছাড়া আমি সকলের বড়। আমাদের ভাইদের নাম রাখা হোলো—সুনির্মল, সুবিমল, সুকোমল আর সুশীতল।

বাবা স্কুল-মাষ্টারি বেশীদিন করেন নাই। মাষ্টারি ছেড়ে তিনি একটা মণিহারী দোকান দিলেন, আর তার কিছুদিন পরেই স্বাধীন ভাবে হরিতকীর ব্যবসা ও পরে অভ্রের ব্যবসা আরম্ভ করলেন।

রোজ সকালে আমরা দাদামশাইয়ের সঙ্গে গাড়ী চড়ে' পচম্বার দিকে বেড়াতে যেতাম। সঙ্গে থাকত দুধ, সন্দেশ ইত্যাদি খাবার।

পচম্বার কোনো নির্জন টিলার ধারে বসে আমরা ঐসব খাদ্যের সদ্ব্যবহার করতাম। দাদামশাই অত্যন্ত ভক্ত লোক ছিলেন, তিনি চোখ বুজে ভগবানের নাম করতেন।

এই সময়ে আমি একটু বড় হয়ে উঠেছি। সামান্য সামান্য লেখাপড়াও করছি। দাদামশাইয়ের কাছে অনেক পত্র-পত্রিকা আসত। তাই নাড়াচাড়া করে দেখতাম। তখনকার দিনে 'সঞ্জীবনী' কাগজ খানার খুব প্রচার ছিল। সে কাগজখানা আমাদের বাড়ীতে আস্‌ত। দাদামশাই 'পাহাড়িয়া পাখী' এই ছদ্মনামে অনেক কবিতা লিখ্‌তেন। তাঁর লেখা পাঠ্যপুস্তক, কবিতা-কলিকা, কবিতা-রঞ্জন প্রভৃতি আমরা পড়েছি।

এই সময়ে দাদামশাই 'বিজয়া' নামে একটি মাসিক পত্রের সম্পাদক হন। কাগজটি কল্‌কাতা থেকে বার হোত। এই কাগজেই আমি প্রথম কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রভৃতির কবিতা পড়ি। কুমুদরঞ্জনের একটি কবিতার একটি লাইন আমার এখনো মনে আছে—

"ঝরাপাতার আসন পাতা,
গাছটি ভরা মল্লিকাতে।"

একদিন মামাবাড়ীতে একটি অদ্ভুত লাল রংয়ের চোঙা-ওলা যন্ত্র আনা হোলো। শুন্‌লাম ওটি কলের গান। যন্ত্রের চাকা ঘুরলেই গান বের হয়। আমরা ছেলেমেয়ের দল সব হুড়োহুড়ি করে ঐ যন্ত্রটা ঘিরে বস্‌লাম।

কে একজন খুব গম্ভীর হয়ে যন্ত্রটি নিয়ে বসলেন, চোঙাটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার উপর বসালেন, তারপর খুব কায়দা করে' তাতে দম দিয়ে, একটি কালো চাকতি তাতে বসাতেই তা বন্‌বন্

করে ঘুরতে লাগ্‌ল। তারপর তার উপর পিন্‌ওলা হাতলটা দিতেই অবাক্‌ কাণ্ড,—সুরু হোলো গান,—লালচাঁদ বড়ালের গান—

'ধিন্‌তা ধিনা পাকা নোনা
ঘুচ্‌লো ভবের আনাগোনা,
তোর হাতের ফাঁসি রইলো হাতে
আমায় ধরতে পারলি না—' ইত্যাদি।

একী তাজ্জব ব্যাপার রে বাবা! ভাব্‌লাম গানটা চোঙার মধ্যে থেকেই বের হচ্ছে, আবার ভাব্‌লাম তা নয়, বোধ হয় গায়কপ্রবর ঐ ছোট্ট বাক্সের মধ্যেই আত্মগোপন করে' আমাদের গান শোনাচ্ছেন।

গানটা হচ্ছে আর বাদকমশাই কায়দা করে' চোঙাটা নানান্‌ দিকে ঘোরাচ্ছেন, আর তাতে আওয়াজও হচ্ছে নানা রকমের। এক একটা করে' গান হয়ে যাচ্ছে, পান্নাময়ী দাসীর,—

"কানু কহে রাই, ধবলী চরাই
কহিতে ডরাই মুই,"
"ছিছি বন্ধু কেমন করে",— ইত্যাদি।

কমিক গান শুনে আমরা হেসেই বাঁচি না,—চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর—

"ও-রি-রি রাবণ আসিল যুদ্ধে
পরে বুট জুতো,
হনুমান মারে তারে
লাথি চড় গুঁতো।"

আমরা মনে মনে বাদকের কেরামতির তারিফ করছি। দাদা-মশাই পরে বুঝিয়ে দিলেন ঐ কালো চাক্‌তির মধ্যেই গান্‌টা দাগে দাগে বন্দী হয়ে আছে।

এই প্রথম গ্রামোফোন শুন্‌লাম।

মকৎপুর অঞ্চলে নরুবাবুর বাড়ী ছিল খুব প্রসিদ্ধ। শহরের

যত অভিনয়, মজ্‌লিস ইত্যাদি হোত ঐ বাড়ীর প্রাঙ্গণে। এজন্য সেখানে একটি মঞ্চই তৈরী করা ছিল। নরুবাবুর বাড়ীতে কিছু হবে শুন্‌লেই আমরা মেতে উঠ্‌তাম। মেবার-পতন, চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান, রিজিয়া প্রভৃতি বই আমরা ওখানে দেখেছি। বেশ মনে পড়ে একবার রিজিয়ার মাথায় সিন ভেঙে পড়েছিল। রিজিয়া তলোয়ার নিয়ে আস্ফালন কর্‌ছেন, এমন সময় সহসা বজ্রাঘাতের মত তাঁর মাথায় পড়ে গেল গোটানো ভারী সিন্‌টা। মাথায় তাঁর বেশ চোট লেগেছিল। রিজিয়া সেজেছিলেন স্থানীয় একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

কিছু যাত্রাও দেখেছি এইখানে। কল্‌কাতা থেকে সব নর্ত্তক ছেলেদের ভাড়া করে' এখানে আনা হোত আর তারা মেয়ে সেজে ঘুঙুর পরে' নাচ্‌ত আর গান গাইত। তাদের গানের একটা কলি আমার মনে আছে—

"প্রেম পরশমণি
হৃদয়ের আবেশিনী
সুজলা সুফলা ধরণী।"

একবার শোনা গেল, নরুবাবুর বাড়ীতে বায়োস্কোপ দেখানো হবে। তখন বায়োস্কোপের প্রথম যুগ। কল্‌কাতাতেও তার বিশেষ প্রচার হয়নি। শুধু কেবল একটু একটু নাম শোনা যাচ্ছে মাত্র।

দল বেঁধে হাজির হলাম নরুবাবুর বাড়ী। বাড়ীর মেয়েরা গেলেন, বাবুরা গেলেন, ঠাকুর চাকর তারাও বাদ রইল না। এমন আজব জিনিষ তারা দেখবে না?

উঃ কী ভিড়! কী ভিড়! যেন শহর ঝেঁটিয়ে লোক জড় হয়েছে সেই আসরে। তখন বিজলী বাতির কোনো রেওয়াজ ছিল না। এদিকে ওদিকে কয়েকটি গ্যাস্‌ বাতি জ্বল্‌ছে, তারই মধ্যে পথ করে কোনো রকমে ভিতরে এসে বস্‌লাম। একদিকে

একটি সাদা পর্দা টাঙানো হয়েছে, তারই কাছাকাছি জায়গা করে' নিলাম।

গ্যাসের বাতিগুলি নিবিয়ে দেওয়া হোলো, আমরা রুদ্ধ নিশ্বাসে দেখলাম, সেই সাদা পর্দায় দেখা যাচ্ছে একটা বড় গাছ, বাতাসে তার পাতাগুলি নড়ছে। তারপর একটা ঝর্ণা দেখলাম, পাহাড়ের উপর থেকে খুব বেগে নীচে পড়ছে। কয়েকটি মুরগী একটা খামারে চরে বেড়াচ্ছে, একজন লোক কতগুলি ভেড়া নিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে কতগুলো টুক্‌রো ছবি দেখবার পর, দেখলাম অতি দ্রুত একটা ট্রেণ এসে স্টেশনে থাম্‌লো। হাতে একটা মস্ত পোঁট্‌লা নিয়ে একজন লোক সেই ট্রেণ থেকে নাম্‌লো, তারপর ছুটে চলে এলো একটা বাগানের দিকে। সেখানে একজন মেয়ে কাঁটা দিয়ে উল বুন্‌ছিল। লোকটি তাকে সেই পোঁট্‌লাটা দিল। মেয়েটি আনন্দে সেই পোঁট্‌লাটা খুল্‌তে লাগ্‌লো। পোঁট্‌লাটি থেকে ক্রমাগত খালি মোড়কের কাগজ বের হচ্ছে। শেষে ছোট্ট একটা বাক্স থেকে বার হোলো একটা রুমাল। তাই দেখে দু'জনের সে কী হাসি!

জীবনে প্রথম বায়োস্কোপ দেখে কৃতার্থ হয়ে তার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে বাড়ী ফিরলাম। ছবি নড়ছে-চড়্‌ছে,—একী কম আশ্চর্যের কথা? আমাদের ঝি বল্লে,—"আমি পর্দার আড়ালে উঁকি মেরে দেখেছি, ভিতরে সত্যিই লোকগুলি ঐ রকম 'থ্যাটার' (থিয়েটার) করছিল, তার ছায়া পড়ছিল বাইরের পর্দায়।"

মামাদের নতুন বাড়ীতে এসে আমার বড়ই ভূতের ভয় করত। বাড়ী তৈরী হবার সময় সেই যে রাজমিস্ত্রিটি ছাদ থেকে পড়ে' মরে' গেছিল, সে নাকি ভূত হয়ে এই বাড়ীতেই বাস করছে—এ কথা কে যেন আমায় বলেছিল। তাই একলা কোনো খালি-ঘরে দিনের বেলাতেও ঢুক্‌তে সাহস হোত না। মধ্যে মধ্যে শুন্‌তাম রহস্যময় সব শব্দ। ছাদে বাঁশি বাজছে, ঢেঁকী ঘরের দিকে কে যেন হাস্‌ছে, কে যেন খালি-ঘরের জানালার খড়খড়িগুলি খুলছে আর বন্ধ করছে,—এই সব মনে হোত।

তবে বাড়ীতে লোকজনের তো অভাব ছিলনা, তাই একা আমাকে কখনও থাক্‌তে হোত না। ছোটুয়া আর লাটুয়া নামে দুটি ছোকরা সঙ্গী পেয়েছিলাম। তারা আমাদের বাড়ীতেই থাকত, হাজারিবাগ জেলার লোক।

মামাবাড়ীর সামনে একটা বটগাছ তলায় একটা দু'চাকার পুশ্‌পুশ্‌ গাড়ী রাখা ছিল। দরকার মত সেটাকে লোকে টেনে নিয়ে যেত। সাম্‌নের দিকে কয়েকজন লোক টানত, আর পিছনে কয়েকজন ঠেল্‌ত।

আমরা বাড়ী শুদ্ধ সবাই এই পুশ্‌পুশ্‌ গাড়ী চড়ে' কত জায়গায় বেড়াতে যেতাম। এতে লোক আঁটত অনেক,—তাই খুব সুবিধা ছিল। পাহাড়ে, জঙ্গলে, ঝর্ণায় চড়াইভাতি করতে যেতেন বাড়ীর সবাই প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিয়ে। সে কী আনন্দ!

একদিন আমরা কয়েকটি ভাই ছোটুয়া-লাটুয়ার সঙ্গে উশ্রী নদীর ওপারে বেড়াতে গেলাম সকালবেলা।

নদীর ওপারে জঙ্গল। বেড়াতে বেড়াতে পথ ভুল করে' ফেল্লাম,—বাড়ীর পথ আর খুঁজে পাইনা। এদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে, খিদেতে পেট জ্বলছে, আবার মনে ভয় হচ্ছে,—বাড়ীতে

ভীষণ বকুনি খেতে হবে বলে। এক জায়গায় দেখলাম 'ঘাঙ্‌রা'র ক্ষেত (প্রায় বরবটির মত)। সেই ঘাঙ্‌রা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগ্‌লাম।

অনেক ঘুরে ঘুরে যখন নদীর ধারে এলাম, তখন অনেক বেলা। দেখলাম, নদীর ধারে একটা পাথরের উপর বড়মামা চুপ করে' বসে আছেন, আর তাঁর লোকজন ব্যস্ত হয়ে আমাদের খোঁজাখুঁজি করছে।

আমাদের দেখে বড়মামা খুব মন্দ বল্লেন। এদিকে নাকি কয়েকদিন থেকে বাঘ বার হচ্ছে।

আমি ভয়ে কেঁদে ফেল্লাম। বড়মামা সঙ্গে করে' আমাদের জন্যে দুধ এনেছিলেন। সবাই তাই খেয়ে আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরলাম।

এইবার আমাদের বাড়ীতে প্রচণ্ড শোকের ঝড় বইল। আমাদের অবিচ্ছিন্ন আনন্দময় জীবনের মধ্যে মস্ত বড় একটা ধাক্কা খেলাম। কয়েকদিন অসুখে ভুগে আমার বড়মামা মারা গেলেন। জীবনে এই প্রথম প্রত্যক্ষ মৃত্যু দেখলাম।

দাদামশাই ছিলেন মূর্তিমান ধৈর্য,—অথচ এবার দেখলাম তাঁরও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি ছেলের শোকে পাগলের মত হয়ে গেলেন।

আমরা তখন ছেলেমানুষ। সবাইকে কাঁদতে দেখে আমরাও আকুল হয়ে কাঁদছিলাম। মৃত্যুটা যে কী জিনিষ ভালো করে' বুঝতাম না।

যখন বড়মামাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, আমার কান্না শুনে পাড়ার এক ভদ্রলোক আমাকে বল্লেন, "মিছে কাঁদছিস্ কেন, তোর মামাকে ওজন করতে নিয়ে যাচ্ছে। ওজনের পর আবার জ্যান্ত হয়ে ফিরে আসবে।"

আমার শিশু-বুদ্ধিতে ঐ রকম কিছু একটা বিশ্বাস করে' যেন

আশ্বস্ত হয়ে চুপ করলাম। বড়মামা আর ফিরলেন না। বাড়ীতে একটা বড়রকম ওলোট-পালোট হয়ে গেল।

এই সময়ে কিছু কিছু লিখতে পড়তে শিখেছি। হাসিখুসি, মোহনভোগ, হিতোপদেশ, পদ্মমালা প্রভৃতি বই পড়তে পারি।

এইসব ছবির বইগুলো আমার মনকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করত। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে রাত্রিবেলা মশারীর বাইরে মোমবাতি জ্বালিয়ে ঐ ধরণের বই লিখতে চেষ্টা করতাম। তখন সবাই ঘুমিয়ে অচেতন, আমার এই গোপন সাধনার কথা কেউ জান্‌তেন না। একমাত্র আমার দিদি এই কথা জানতেন। তিনি আমার থেকে মাত্র দেড় বছরের বড়।

আমার বই লেখা দেখে দিদিরও বই লেখার দিকে ঝোঁক হোলো, তিনিও আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করলেন।

বই লিখি আর লেখকের নাম দেই 'সুনির্মল শর্মা'। এই 'শর্মা' লেখার একটা কারণ আছে। তখন বিদ্যাসাগর মশাইয়ের পুস্তকে তাঁর ফটোর নীচে সই থাকৃত 'ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।' তাই দেখে ভাবতাম, লেখক হলেই বুঝি 'শর্মা' লিখতে হয়। আমার দেখাদেখি দিদিও লিখতে আরম্ভ করলেন, "অমিয়া শর্মা।"

তবে ক্রমেই দিদির উৎসাহে ভাটা পড়ে গেল, আর আমার উৎসাহে নতুন নতুন জোয়ার আস্‌তে লাগল। আমি নীরব সাধনা চালাতে লাগ্‌লাম।

তখনো রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান নাই; তখন তাঁর নাম কেবল উচ্চশিক্ষিত সংস্কৃতি-সম্পন্ন ভদ্রসমাজে কিছু কিছু প্রচার হয়েছে। কেউ কেউ তাঁর বিশেষ ভক্ত, আবার কেউ কেউ তাঁর নামে বিরূপ।

গিরিডির ব্রাহ্মসমাজ তখন বিশেষ প্রসিদ্ধ। বহু বিশিষ্ট ব্রাহ্ম তখন গিরিডির বাসিন্দা এবং বাড়ী করেছেন স্থায়ীভাবে বাস করবার জন্যে। সুখ্যাত ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার, সিটি

কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, শ্রীপ্রশান্ত মহলানবিশের পিতা প্রবোধ মহলানবীশ, হাসিখুসির লেখক যোগীন্দ্রনাথ সরকার, বর্দ্ধমান স্কুলের প্রধান-শিক্ষক শশিভূষণ বসু প্রভৃতি গিরিডিতে থাকেন কিংবা কাজের অবসরে বিশ্রাম করবার জন্যে আসেন।

একদিন শুনলাম রবিঠাকুর গিরিডিতে এসেছেন এবং বারগণ্ডায় এক বাড়ীতে উঠেছেন। বাবা বিশেষভাবে রবীন্দ্র-ভক্ত ছিলেন। একদিন স্থানীয় ভদ্রলোকেরা রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করলেন কোনো বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়ীতে। উদ্দেশ্য কবির কণ্ঠে তাঁর স্বরচিত গান শোনা।

বাবা আমাকে নিয়ে নির্দিষ্ট বাড়ীতে গেলেন। সেদিন জ্যোৎস্না রাত। বাইরের বারান্দায় সতরঞ্চি বিছানো হয়েছে। কয়েকজন ভদ্রলোক সেখানে বসে আছেন রবীন্দ্রনাথের প্রতীক্ষায়। তিনি তখনো আসেন নাই।

বাবার সঙ্গে আমিও সেই আসরে গিয়ে বস্‌লাম। বড় বড় ইউকিলিপটাস গাছের আড়াল দিয়ে চাঁদের আলো এসে বারান্দায় পড়েছে, বাতাসে ঝাউগাছের পাতাগুলো ঝির্ ঝির্ করে' কাঁপছে; ভদ্রলোকের সাজানো বাগানের অপূর্ব শোভা হয়েছে, এমন সময় কবি এলেন।

শিশু আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম কবিকে। তাঁর কবিতা শুনেছি দাদামশাইয়ের মুখে, বাবা মার মুখে; কতই না আনন্দ পেয়েছি। আজ কবিকে স্বচক্ষে দেখে কৃতার্থ হলাম।

কী সুন্দর চেহারা, কী সুন্দর রং, আর কী সুন্দর তাঁর কণ্ঠস্বর।

ভাব্‌লাম কবি হলে ঠিক এইরকমই হতে হয়—না হলে কেউ কি আর কবিতা লিখ্‌তে পারে!

সুদীর্ঘ আকার, গায়ে শাদা উত্তরীয়, মাথায় কালো [illegible] বাব্‌ড়ি চুল, মুখে কুচকুচে কালো চাপ্-দাড়ী, আর গায়ের রং চাঁপা ফুলের মত ফুট্‌ফুটে। অবাক্ হয়ে দেখলাম, দেখে অবাক্

হলাম—ইনিই রবি ঠাকুর! হাঁ এঁকে সত্যি কবি বলা যায়। ইনি যে রামা-শ্যামা-যদু-মধু ন'ন তা দেখলেই টের পাওয়া যায়। বারেবারে তাঁর আপাদমস্তক দেখতে লাগ্‌লাম গভীর আগ্রহ সহকারে। নাক মুখ চোখে কোথাও যেন কোনো খুঁৎ নাই।

বাবা প্রভৃতি দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে নমস্কার করে' বস্‌তে বল্লেন। রবি ঠাকুর সতরঞ্চিতে বস্‌লেন। ইউকিলিপটাসের ছায়া সরে' গিয়ে কবির গায়ে মাথায় চাঁদের আলো পড়লো। অবাক্ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। উঃ কী রূপ!

কবিকে তাঁর স্বরচিত গান গাইতে অনুরোধ করা হোলো। বিন্দুমাত্র ভনিতা না করে' তিনি খালি গলায় বিনা যন্ত্রে গান ধরলেন—

"কেন জাগে না, জাগে না অবশ পরাণ
নিশি দিন অচেতন ধূলি শয়ান,
তোমারি মাধুরী কেন জাগে না প্রাণে,
কেন নাহি হেরি তব প্রেম-বয়ান।"
ইত্যাদি।

তারপর আর একখানা—

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা;
যেথা আমি যাই নাকো
তুমি প্রকাশিত থাকো,
অভয়-কিরণ দিয়ে ঢালগো করুণা ধারা।"
ইত্যাদি।

একটা যেন রোমাঞ্চকর স্বপ্ন দেখে বাড়ী ফিরলাম। এর পর আরো কয়েকবার রবীন্দ্রনাথ গিরিডিতে এসেছিলেন।

—পাঁচ—

অভ্রের ব্যবসা আরম্ভ করে' বাবার খুব আম্‌দানি হতে লাগ্‌ল। তিনি কিছুদিন পরই আমাদের নিয়ে অন্য একটা বাড়ীতে উঠে গেলেন আর নিজের সংসার পাত্‌লেন।

এতদিন মামা-বাড়ীতে পালিত হয়েছি, জন্ম থেকেই তাঁদের দেখেছি, তাঁদের স্নেহ ভালোবাসা পেয়েছি—কাজেই এই নতুন বাড়ীতে আসবার সময় তাঁদের ছেড়ে আসতে মনে খুব কষ্ট হোলো।

মামা-বাড়ীর কাছেই আমাদের বাড়ী ভাড়া করা হোলো, তাই প্রায় সব সময়েই তাঁদের বাড়ীতে আনাগোনা করতাম। মামাতো ভাইরাও আমাদের বাড়ীতে আসত, একসঙ্গেই খেলা-ধূলা করতাম।

এই নতুন ভাড়াটে বাড়ীতে এসে দেখলাম, বাবার আল্‌মারিতে কয়েকটি নতুন বই, তার মধ্যে একটি বই ছিল ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'।

এই বইটি আমি দখল করে বস্‌লাম। ভালো পড়তে পারিনা, তবু পড়তে চেষ্টা করি,—আর উল্টে-পাল্টে তার রঙীন ছবিগুলি দেখি। ভারী ভালো লাগে। চিত্রকরদের নামগুলি ছবির নীচে ছাপা, রবি বর্মা, মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতি।

রামায়ণখানা খুলে বাবা আমাকে শ্লোক মুখস্থ করান—

"রামং লক্ষ্মণং পূর্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরম্
কাকুস্থং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্মিকম্"!

অনেক চেষ্টা করে' আমি শব্দগুলি উচ্চারণ করি। বাবা আমাদের চাণক্য-শ্লোক থেকেও শক্ত শক্ত শ্লোকগুলি মুখস্থ করাতেন। তিনি বল্‌তেন "সংস্কৃত শ্লোকগুলি পরিষ্কার উচ্চারণ করলে জিভের জড়তা নষ্ট হয়।"

এই সময়ে একদিন বাবা আর একখানা বই এনে আমার সামনে ধরে' বল্লেন—"কি লেখা আছে পড়্ত?"

দেখ্লাম বাঁধানো লাল মলাটের উপর সোনার জলে কয়েকটি অদ্ভুত অক্ষর লেখা আছে,—আর নীচে ঠিক ওই ধরণের অক্ষরে লেখকের নাম।

অনেক চেষ্টা করেও পড়তে পারলাম না। বাবা বল্লেন 'রাজকাহিনী' আর লেখকের নাম 'শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর'।

বাবা বুঝিয়ে দিলেন 'বাংলা অক্ষরই একটু কায়দা করে' উর্দ্দু অক্ষরের ধরণে লেখা হয়েছে।'

বাঃ, বেড়ে কায়দা তো। এইবার বেশ পড়তে পারলাম— 'রাজকাহিনী—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

ভিতরে নন্দলালের আঁকা কয়েকটি একরঙা ছবি। গল্পগুলি পড়ি। শিলাদিত্য, গোহ, বাপ্পাদিত্য, পড়ি আর মুগ্ধ হই। গায়েব গায়েবীর কথা পড়ে' চোখে জল আসে। এখনো মনে পড়ে—শিলাদিত্য ডাক্লেন—"গায়েবী, গায়েবী, কোথায় গায়েবী?" অন্ধকার থেকে উত্তর এলো "হায় গায়েবী, কোথায় গায়েবী।" পড়তে পড়তে চোখ ছল্ছলিয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা সুর করে' আবৃত্তি করি—

"ঐ দেখো মা আকাশ ছেয়ে
মিলিয়ে এলো আলো,
আজ্কে আমার ছুটোছুটি
লাগ্ল না আর ভালো।"

কিম্বা

"আকাশ জুড়ে' মেঘের খেলা কোথায় বা সীমানা,
দেশে দেশে খেলে বেড়ায়, কেউ করেনা মানা।

মনে পড়ে ঘরের কোণে মিটি মিটি আলো,
চারিদিকে দেওয়ালেতে ছায়া কালো কালো।
বাইরে কেবল জলের শব্দ্ ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্,
দস্যি ছেলে গল্প শুনে একেবারে চুপ।”

কী ভালোই লাগ্‌ত এইসব কবিতা। পড়ে’ আর আবৃত্তি করে’ যেন আশ আর মিটত না।

আরো কয়খানি বই এই সময়ে আমার হাতে আসে। ৺যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত লঙ্কাকাণ্ড, কুরুক্ষেত্র, ৺উপেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরীর লেখা টুনটুনির বই, সীতাদেবী শান্তাদেবী প্রণীত হিন্দুস্থানী-উপকথা ইত্যাদি। এই শেষের বইখানাতে ৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আঁকা খুব মজার মজার একরঙা পাতা-জোড়া ছবি ছিল।

এই সব বই যে কী আগ্রহে পড়তাম তা আর কি বলব। নাওয়া-খাওয়া, খেলা-ধূলার কথা মনে থাক্‌ত না, বইগুলো নিয়েই মশ্‌গুল্ থাক্‌তাম।

প্রতিদিন খুব ভোরবেলা আমাদের রাঁধুনে বামন বাইরের বারান্দায় বসে জোরে জোরে সুর করে’ চণ্ডী পাঠ করত।

আমারও ইচ্ছা করত ঐ রকম ভাবে সুর করে কোনো বই পড়ি।

আমার পড়ার আগ্রহ দেখে বাবা খুব উৎসাহ দিতেন আর নতুন নতুন বই আনিয়ে দিতেন।

গিরিডিতে বই পাওয়া যেতনা, তাই কল্‌কাতা থেকে ভিঃ পিঃতে বই আনাতেন।

একদিন ভিঃ পিঃতে এলো নতুন দুখানা বই। ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘আরব্য-উপন্যাস’ আর ৺মণিলাল গাঙ্গুলীর লেখা ‘ভূতুড়ে কাণ্ড’।

'আরব্য-উপন্যাস'খানা খুব মোটা ছিল বলে প্রথম আমি সেটা দখল করে নিলাম, দিদিকে দিলাম 'ভুতুড়ে কাণ্ড'।

আমাদের বাড়ীর কাছেই ছিল পণ্ডিতমশাইয়ের প্রাইমারী স্কুল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঐ স্কুলে পড়ত। দিদিকে ভর্তি করে দেওয়া হোলো ঐ স্কুলে।

ছুটির সময় দেখ্‌তাম, পণ্ডিতমশাই স্কুলের বাইরের বারান্দায় পায়চারি করতে করতে ছেলেমেয়েদের নাম্‌তা শেখাতেন, ছেলে-মেয়েরা সুর করে' নাম্‌তা পড়ত।

আমাদের ঘরের জানালা দিয়ে পণ্ডিতমশাইকে পরিষ্কার দেখ্‌তে পেতাম। একদিন জান্‌লার ধারে বসে আয়না নিয়ে নাড়াচাড়া করছি,—হঠাৎ দেখি পণ্ডিতমশাই হন্তদন্ত হয়ে আমাদের বাড়ীর দিকে আস্‌ছেন।

তিনি এসেই বাবাকে ডাক্‌লেন। বাবা বেরিয়ে এলেন, পণ্ডিত-মশাই অনুযোগ করলেন—"আপনার ছেলে আমাকে পড়াতে দেবে না।"

বাবা প্রশ্ন করলেন "কেন, কী হোলো।"

পণ্ডিতমশাই বল্লেন—"আয়না দিয়ে আমার চোখে সূর্যের আলো ফেলছে। চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।"

কথাটা আমি শুন্‌তে পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। আয়না নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম সত্যি, তাতে কিভাবে যে পণ্ডিতমশাইয়ের মুখে সূর্যের আলো পড়লো,—ঠিক বুঝতে পারলাম না। হয়তো কোনো রকমে তাঁর চোখে আলো পড়ে থাক্‌বে।

বাবা আমাকে ডেকে পণ্ডিতমশাইয়ের সাম্‌নেই ধম্‌কে দিলেন। পণ্ডিতমশাই সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন।

একদিন পণ্ডিতমশাইয়ের স্কুলের মেয়েরা টিফিনের সময় সাম্‌নের মাঠে কাণামাছি খেল্‌ছে। দিদিও সেই দলে আছেন।

ত্রিগুণধারিণী নামে একটি মেয়ের চোখ বাঁধা,—সে ছুটে ছুটে সবাইকে ধরতে যাচ্ছে, আর মেয়েরা দৌড়াদৌড়ি করে সবাই এদিকে ওদিকে পালাচ্ছে। সেই খেলার মাঠে ছিল একটা পাতকূয়ো। হঠাৎ চোখ বাঁধা 'ত্রিগুণধারিণী' দেখতে না পেয়ে ঝপাং করে সেই কূয়োর মধ্যে পড়ে গেল।

মেয়েরা ভয়ে চিৎকার করে উঠল। দিদি দৌড়ে এসে বাড়ীতে খবর দিলেন। বাবা একটা প্রকাণ্ড দড়ি নিয়ে ছুটে এলেন কূয়ার ধারে, উঁকি মেরে দেখলেন, মেয়েটি এক-কোমর জলে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা দড়ি নামিয়ে দিলেন, মেয়েটি শক্ত করে' তা ধরলো, আর বাবা তাকে টেনে টেনে উপরে তুল্‌লেন।

ধন্যি মেয়ে বাবা! অন্য কোনো মেয়ে হলে ভয়েই আধমরা হয়ে যেত, কিন্তু দেখা গেল ত্রিগুণধারিণীর অনেক গুণ, সে উপরে উঠে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাস্‌ছে।

মেয়েটির বেশী চোট লাগেনি। তার সাহস দেখে বাবা তাকে একদিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন।

—ছয়—

নরুবাবুর বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে দিদির খুব ভাব হয়েছিল। দিদি বিকেলবেলা ঐ বাড়ীতে খেলতে যেতেন, মধ্যে মধ্যে সঙ্গে আমিও যেতাম।

তবে আমার খুবই মুশ্‌কিল হোত, মেয়েদের সঙ্গে খেল্‌তে আমি আনন্দ পেতাম না। সে বাড়ীতে আমার বয়সী কোনো ছেলে ছিল না। কাজেই তাদের সঙ্গেই খেল্‌তে নাম্‌তাম। কুমীর-কুমীর, কাণামাছি, চোর-পুলিশ প্রভৃতি খেলা হোত। আমি বয়সে ছিলাম সবার ছোট, তাই আমাকে অনেক সময় বাদ দেওয়া হোত, কিংবা 'এলে-বেলে' পর্যায় ফেলা হোত।

নরুবাবুর বাড়ীতে একটি অদ্ভুত ধরণের ঝি কাজ করত। প্রকাণ্ড লম্বা ছিল তার চেহারা, রং কুচ্‌কুচে কালো, আর হাত-পাগুলি ছিল বাঁকা-চোরা। কথাবার্তাও সে ঘুণ্ডিয়ে ঘুণ্ডিয়ে বল্‌ত। নাম ছিল তার বুধি।

তাকে দেখলেই আমার বুক দুর্ দুর্ করত। কে যেন আমাকে বুঝিয়ে ছিল, বুধি হচ্ছে একটা পেত্নী। দিনের বেলা মানুষ হয়ে কাজকর্ম করে, আর রাত্রিবেলা ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে শ্মশানঘাটে মড়া খেতে যায়।

তাই বুধিকে দেখ্‌লেই আমি লুকাতে চেষ্টা করতাম, ভীষণ ভয় করত।

একদিন দিদিদের সঙ্গে আমি ছুটোছুটি খেলা করছিলাম। খেল্‌তে খেল্‌তে সবাই নরুবাবুর তিনতলার ছাদে হাজির হলাম। আবার সবাই ছুট্‌তে ছুট্‌তে নীচে নেমে গেল। আমিও নীচে নাম্‌তে গিয়ে দেখি তিনতলার কাঠের সিঁড়ির এক জায়গার খানিকটা অংশ ভাঙা।

নাম্‌তে আর সাহস হয় না। সবাই নীচে নেমে গেছে,—

আমি আর নামতে পারি না। অসহায় আমি নির্জন ছাদে সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়ে আকুল হয়ে একলা কাঁদতে লাগ্‌লাম।

এমন সময়ে হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন এসে আমার হাত ধরলো। পিছনে তাকিয়েই দেখি সর্বনাশ, বুধি এসে আমার হাত ধরেছে। আমি থতমত খেয়ে গেলাম। বুধি আমার হাত ধরে' জিজ্ঞাসা করল, "খোঁকাবাঁবু, কাঁদছ কেঁন ?"

নির্জন ছাদ,—একলা আমি, আর সেই ভয়ঙ্কর বুধি এসে আমাকে পাক্‌ড়েছে, আর রক্ষা নাই। আমার যে সে কী অবস্থা কি করে বোঝাই !

কিন্তু বুধি কিছুই করল না, কিছুই বল্‌ল না, আমার বিপদ বুঝে হাত ধরে' ধীরে ধীরে নীচে নামিয়ে দিল। সে ছাদের উপরে শুক্‌নো কাপড় জামা তুলতে এসেছিল।

সেইদিন থেকে বুধির উপর আমার ধারণাটা সম্পূর্ণ বদ্‌লে গেল। এই কুৎসিৎ কদাকার চেহারাটার ভিতরে যে একটা পরম স্নেহময় হৃদয় বাস করছে, তার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

তারপর থেকে আমি বুধির কাছ থেকে জল চেয়ে খেতাম, দেখলে কথা বল্‌তাম আর বুধি যখন কাজ করতে করতে খোনা সুরে গান করত কাছে গিয়ে তাই শুন্‌তাম।

নরুবাবুর সেই পুরাণো আমলের প্রকাণ্ড বাড়ীটা এখন আর নাই। ভেঙে চুরে নতুন একতলা বাড়ী তৈরী হয়েছে।

এই সময়ে একদিন সারা গিরিডিতে সাড়া পড়ে গেল। পঞ্চম জর্জ রাজা হয়ে সিংহাসনে বস্‌বেন—সেই উপলক্ষ্যে সারা-ভারতে উৎসব। তার ঢেউ এসে গিরিডিতেও পোঁছালো।

সেদিন সন্ধ্যায় দোকানে দোকানে, বাড়ীতে বাড়ীতে আলো জ্বালানো হোলো,—বাজী পোড়ানো হোলো,—ফানুষ উড়লো—। সেই উপলক্ষ্যে থানায় থানায় শিশুদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা

হোলো—আর সেই সূত্রে স্কুলে স্কুলে খেলাধূলার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হোলো।

বৃটিশের ভয়েই হোক বা ভক্তিতেই হোক, কয়েকদিন ধরে' গিরিডিতে মহাসমারোহে উৎসব চল্ল। আমরা এক একটি করে' রাজারাণীর মূর্ত্তি খোদানো বড় দস্তার মেডেল বুকে ঝুলিয়ে ঘুরতে লাগ্‌লাম।

স্কুলের খেলাধূলার প্রতিযোগিতায় পুরস্কার আনার ভার পড়ল বাবার উপর। বাবা স্কুলের টাকা নিয়ে কল্‌কাতা চলে গেলেন আর কিছুদিনের মধ্যেই বড় বড় বাঁশের প্যাঁট্‌রায় খেলনা ভর্তি করে ফিরে এলেন।

কত রকম খেল্‌নাই তিনি আনলেন। বাড়ীতে সেগুলি খুলে আমাদের দেখালেন।

দম্‌ দেওয়া পুতুল, স্প্রিংয়ের বন্দুক, কড়ির ঝাঁপি, করতাল লাগানো ঢোলক, আরো কত কি! সবগুলিই আমাদের কাছে নতুন।

আমার মেজভাই সুবিমল (শ্রীসুবিমল বসু, বর্তমানে বিখ্যাত চিকিৎসক) পণ্ডিত মশাইয়ের স্কুলে দৌড়ে একটি পুরস্কার পেল। দিদির ভাগ্যেও একটা কড়ির ঝাঁপি জুটে ছিল। আমি কিন্তু ঐ রাজারাণীর মেডেল ছাড়া আর কিছুই পাইনি।

স্কুলে পুরস্কার বিতরণের দিন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতিত্ব করলেন। স্কুলে পৎ পৎ করে বৃটিশ পতাকা উড়তে লাগলো, নিমন্ত্রিত বিশিষ্ট লোকেরা গদগদ হয়ে ইংরাজদের গুণগান করলেন, আর ছাত্রেরা সমবেত কণ্ঠে গান ধর্‌লো—

"God save the king."

একদিন দুপুরবেলা আমাদের বাড়ীতে এক অপরিচিত ভদ্রলোক এলেন। তাঁর সঙ্গে দেখলাম সেই চোঙাওলা কলের গান। তিনি কিছুদিন আমাদের বাড়ী থাকতে চাইলেন।

তখন আমার কাকা আমাদের বাড়ীতে থাক্‌তেন। তিনি অপরিচিত ভদ্রলোকটিকে আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় দিতে চাইলেন না। কারণ তখন চারিধারে পুলিশের চর নানা বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—নতুন লোক দেখ্‌লেই সন্দেহ হয়।

ভদ্রলোকটিকে ভালো করে খাইয়ে-দাইয়ে কাকা বিদায় দিলেন। তিনি যতক্ষণ ছিলেন আমরা তাঁর কলের গানটি শুন্‌লাম। অনেকগুলি রেকর্ড ছিল; ডালিম দাসী, বেদানা দাসীর গান, কিশোর বালক মাষ্টার মদনের গান, কে, মল্লিকের (মন্নু মিয়া) গান, পান্নাময়ী দাসীর কীর্তন, চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর নতুন কমিক ইত্যাদি।

ভদ্রলোকটির জন্য আমাদের ভয়ানক দুঃখ হোলো। কত লোকই তো আমাদের বাড়ীতে খাচ্ছে, থাকছে; কিন্তু এঁকে স্থান দেওয়া হোলো না কেন? কিছুদিন থাক্‌লে কেমন মজা করে' গ্রামোফোন শুনতাম।

শেষে একদিন শুনতে পেলাম লোকটি সত্যিই পুলিশের চর। কোন্ বাড়ীতে ধরা পড়ে' গ্রামোফোনটা ফেলে সট্‌কে পড়েছে।

এ খবরটা কাকার মুখেই পেলাম। আহা লোকটা যদি আমাদের বাড়ীতেই ধরা পড়ত আর গ্রামোফোনটা ফেলে পালাত, তবে কী মজাই না হোত। রাতদিন কল চালাতাম আর গান শুনতাম আর একটা দুটো কালো চাকা ভেঙে দেখতাম গানগুলো কোথায় আট্‌কে আছে!

এইবার আমাদের নিজের বাড়ী উঠ্‌তে লাগ্‌লো মামাবাড়ীর ঠিক পিছনে বারগণ্ডা অঞ্চলে। তখন ওদিকটা চারিধারে ফাঁকা ছিল।

বাবা রোজ গিয়ে বাড়ীর কাজ দেখেন, মিস্ত্রী খাটান। নিজের পছন্দমত অদল বদল্ করান। মধ্যে মধ্যে আমাকেও নিয়ে যান।

চারিধারে শাল-মহুয়ার গাছ, আমি ঐসব গাছ তলায় ঘুরি,—শালফুল কুড়াই, এদিকে ওদিকে নুড়ি পাথর সংগ্রহ করি। উড়ন্ত ফড়িং আর রঙীন প্রজাপতি ধরবার চেষ্টা করি—ভারী ভালো লাগে।

একদিন বাবা বল্লেন—"তোকে এবার স্কুলে ভর্তি করে দেব।"

শুনেই মন্‌টা নেচে উঠ্‌ল। বাড়ীতে একা একা কাটে, স্কুলে কত সঙ্গী পাব, সাথী পাব, নতুন নতুন বই পড়ব, কত মজা হবে।

একটা বিলাতী বইতে একটা রঙীন ছবি দেখেছিলাম, একটি মেয়ে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে স্কুলে যাচ্ছে, তার হাতে একখানা খোলা বই। বই পড়তে পড়তে সে চলেছে।

ভাব্‌লাম এই রকম কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে আমি স্কুলে যাব, পদ্যমালা পড়তে পড়তে পথ হাঁটব।

পদ্যমালা বইখানার নাম করলাম এই জন্যে যে এই বইখানা আমার খুব ভালো লাগতো।

"রাতি পোহাইল, উঠ প্রিয়ধন—
কাক ডাকিতেছে কররে শ্রবণ।
উঠেছে প্রবোধ, উঠেছে বিপিন,
চারু চুণী মতি, উঠেছে নবীন।
সেজে এসে ওই ডাকিছে তোমায়,
তুমি গেলে তারা বেড়াইতে যায়।

এই লাইনগুলি যে আমার কী ভালোই লাগত তা কী বলব।

—সাত—

৺বামনদাস মজুমদার নামে একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম ভদ্রলোক বারগণ্ডায় একটা স্কুল করেছিলেন অনেকটা শান্তি-নিকেতন পদ্ধতিতে। তিনি একাই পড়াতেন। সকালে মেয়ে ও শিশুদের ক্লাস নিতেন, দুপুরে বড় ছেলেরা পড়ত। সে সময়ে ঠাকুরবাড়ীর কয়েকটি মেয়েও তাঁর কাছে সকালে পড়ত।

ঠিক হোলো আমি এই বামনবাবুর স্কুলেই ভর্তি হব।

এই সময়ে আমি হঠাৎ অসুখে পড়লাম। কয়েকদিন জ্বরে ভুগে যেদিন ভালো হলাম, ঠানদির পরামর্শে মা আমাকে সেদিন পটলের ঝোল দিয়ে ভাত খেতে দিলেন। ঠান্‌দি আমাদের বাড়ীতেই থাক্‌তেন।

মনে পড়ে, সেদিন বারান্দায় আমার ভাত দেওয়া হয়েছে। অনেকদিন পর ভাত পেটে পড়বে, আনন্দের আর সীমা নাই। বাবা বাড়ীতে ছিলেন না, হঠাৎ সেই সময়ে বাড়ী ফিরলেন।

আমাকে ভাত দেওয়া হয়েছে দেখে তিনি চটে উঠ্‌লেন। মা আমাকে খাইয়ে দিচ্ছেন, সবে দু'এক গ্রাস ঝোলমাখা ভাত মুখে দিয়েছি। বাবা এসে এক লাথি মেরে থালাটাকে উঠানে ফেলে দিলেন। ঝন্‌ ঝন্‌ করে ভাতশুদ্ধ থালাটা উঠানে গিয়ে পড়্‌ল।

আমার পথ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে বাবা ডাক্তারের কাছে গেছিলেন। ডাক্তার সাতদিনের মধ্যে ভাত খেতে বারণ করেছেন, কিন্তু বাড়ী এসেই বাবা দেখেন আমি ভাত খাচ্ছি। তাতেই তিনি খাপ্পা হয়ে এই কাণ্ড করে বস্‌লেন।

আমার আর ভাত খাওয়া হোলোনা। মা খুব ধমক খেলেন।

যাক্‌ ক্রমেই আমি সুস্থ হয়ে উঠ্‌লাম, এবং একটু ভালো হয়েই বামনবাবুর স্কুলে ভর্তি হলাম। দিদি আগেই ভর্তি হয়েছিলেন ঃ

সকালে মেয়েদের সঙ্গে পড়ি। আরো তুই চারিটি ছেলেও আমার সঙ্গে পড়ে, কিন্তু সকালে ক্লাশ করতে আমার ভালো লাগে না।

বামনদাসবাবুর স্কুলে বাংলা বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ইংরাজী বই পড়লাম King Primar।

একদিন বামনদাসবাবু বল্লেন, "এবার তুই ইংরাজী 'রবিনসন্ ক্রুশো' পড়বি।"

তাই শুনে আনন্দে সে রাত্রে আমার ভালো করে ঘুম হোলো না। সকালে উঠেই পাড়ার এক বন্ধুর কাছ থেকে বইখানা জোগাড় ক'রে আন্‌লাম। আর যেন তর্ সইছে না। নিজে নিজেই সে বইখানা পড়তে চেষ্টা করতে লাগ্‌লাম। পড়ার আগ্রহ ছিল ভীষণ।

রমা, এণা, সাগরিকা নামে ঠাকুরবাড়ীর কয়েকটি মেয়ে এসে ভর্তি হোলো সকালের ক্লাশে, আরো বহু মেয়ে আসে। মেয়েদের সঙ্গে পড়তে আমার বড়ই লজ্জা করে, সঙ্কোচ বোধ করি।

ইচ্ছা করে তুপুরে ছেলেদের সঙ্গে স্কুলে আসি। কিন্তু আমার ইচ্ছাতে তো কিছু হবে না, বাবার হুকুম। সকালে দিদির সঙ্গে একসঙ্গে স্কুলে যাই।

স্কুল ছুটির পর বাড়ী আসবার সময় পথে দেখি ছেলেরা স্কুলে চলেছে। অনেকেরই মুখ চেনা। আমি মেয়ের দলে চলেছি। তাই কেউ কেউ মুখ টিপে হাসে। আমাকে ঠাট্টা করে 'খুকুমণি ফিরছে।'

একদিন সাহস করে বামনবাবুকে বল্লাম "মাষ্টার মশাই আমি তুপুরে পড়ব।"

মাষ্টার মশাই বল্লেন "কাল থেকে তাই আসিস্, বুঝ্‌তে পারছি তোর অসুবিধা হচ্ছে।" অন্যান্য ছেলেদেরও বল্লেন, "তোরাও কাল থেকে তুপুরে আস্‌তে পারিস।"

আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্লাম। আমার উৎসাহ অনেক বেড়ে গেল। বাবাকেও সেই কথা বল্লাম, তিনি রাজী হলেন।

পরের দিন দুপুরে স্কুলে গেলাম, গিয়ে দেখি সকালে-পড়ুয়া ছেলেরা সকালেই স্কুলে যাচ্ছে মেয়েদের সঙ্গে, আর তাদের সঙ্গেই পড়াশোনা করছে।

মামাবাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের ঠিকই আছে। সময় পেলেই ছুটে যাই সে বাড়ীতে, তারাও আসে। আমার মামাতো দুই ভাই পলু আর নলু (স্বদেশরঞ্জন ও শান্তিরঞ্জন) আমাদের সঙ্গে খেলা করে, গল্প করে, আড্ডা মারে। তাদের আকর্ষণ বড় কম ছিল না।

এর মধ্যে একদিন নলুর পা ভীষণ ভাবে পুড়ে গেল। অনেক দিন ভুগে শেষে সে ভালো হোলো—কিন্তু তার পায়ের পোড়া দাগ আর ভালো হোলো না।

দাদামশাই নাকি আমার মধ্যে কোন অলৌকিক ক্ষমতা দেখতে পেতেন। সেজমামা বিয়ে করতে গেছেন ঢাকায় টিকাটুলীতে। বিয়ের দিন গিরিডিতে দাদামশাই আমাকে বল্লেন —"কোনো ঢোলের শব্দ পাচ্ছিস কিনা—শোন্‌তো।"

আমি কোনো অলৌকিক শক্তিতে ঢাকার বিয়ের বাজনা শুনতে পাচ্ছি কিনা, দাদা মশাইয়ের তাই জানতে ইচ্ছা।

আমি চোখ বুজে কান খাড়া ক'রে বল্লাম "হ্যাঁ, টাক্‌ডুমা ডুম্ ডুম্" আওয়াজ পাচ্ছি।

আমার এক মামা কাছেই ছিলেন, তিনি বল্লেন—"ঢোল বাজছে টিকাটুলীতে নয়, চামারটুলীতে, ভূতের পূজো হচ্ছে।"

মামাবাড়ীর কাছেই চামারদের বস্তি ছিল, সেখানে প্রায়ই ভূতের পূজো হোত ঢোল বাজিয়ে।

সবাই শুনলো, সেখানেই ঢোল বাজছে।

আর একদিন দাদামশাই আমাকে বল্লেন, "তাড়াতাড়ি স্নান ক'রে আয়—তোকে দিয়ে একটা জিনিষ পরীক্ষা করব।"

তাড়াতাড়ি স্নান ক'রে দাদামশাইয়ের কাছে এলাম। এসে দেখলাম আয়নার মত ফ্রেমে বাঁধানো একটা কুচকুচে কালো কাঁচ একটা জলচৌকীতে বসানো রয়েছে। তার সামনে একটা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে।

দাদামশাই বল্লেন, "এই আয়নার সাম্‌নে স্থির হয়ে বোস্, আর তাকিয়ে দেখ কিছু দেখতে পাস কি না। এর নাম ত্রিকালদর্শী আয়না। ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্তমানের ঘটনা সব দেখা যায় এর মধ্যে।"

আমি আয়নার সাম্‌নে আসন ক'রে স্থির হয়ে বসলাম। ঘিয়ের বাতি নড়ছে চড়ছে, কালো আয়নায় তার ছায়া পড়ছে। আমি এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছি আর একমনে লক্ষ্য করছি কোনো অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায় কিনা।

দাদামশাই জিজ্ঞাসা করলেন "কি দেখছিস্?"

বল্লাম, "কতগুলি ভূতের মত ছায়া নড়ছে। প্রদীপের শিখাটার আশে-পাশে কতগুলি কি যেন দেখতে পাচ্ছি, ঠিক বুঝতে পারছি না। মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে।"

দাদামশাই বল্লেন, "আজ থাক,—এখন যা, অন্য সময়ে আবার হবে।"

দাদামশাই ঘিয়ের প্রদীপটা নিবিয়ে দিলেন; আমি উঠে গেলাম।

এই সময় মামারা 'প্ল্যানচেট্' নিয়ে পড়লেন।

পানের আকারের একটা কাঠের পাত্‌লা তক্তা, নীচে দুটো চাকা, আর ছুঁচ্‌লো দিকটায় পেন্‌সিল লাগাবার জায়গা। এক কথায় এটা পরলোকগত আত্মা আনবার যন্ত্র।

ঘর বন্ধ ক'রে কয়েকজন প্ল্যানচেট্‌কে ঘিরে বস্‌বে, আর একমনে কোনো মৃত-লোককে মনে করতে হবে। একজনের হাত থাকবে প্ল্যানচেট্‌টির উপর। প্ল্যানচেটে পেনসিল আঁটা আর তার নীচে লিখবার কাগজ।

আত্মা এলেই প্ল্যানচেট্‌টি একটু নড়াচড়া করবে। তখন তাকে প্রশ্ন করতে হবে "কী নাম?"

আত্মা তার নাম লিখে দেবে তার নিজের হাতের অক্ষরে। তারপর নানা প্রশ্নের উত্তর সে দিয়ে যাবে।

একদিন এক আত্মা এসে লিখল "আমার নাম ক্ষুদিরাম বসু।"

কিছুকাল আগে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়ে গেছে। তাঁর আত্মা আসতেই প্রশ্ন করা হোলো—"দেশ স্বাধীন হবে কবে?"

পুলিশের চরের ভয়ে প্রশ্নটা চুপে চুপেই করা হোলো।

প্ল্যানচেট্‌টা চক্রাকারে ঘুরতে লাগ্‌ল আর তাতে কি সব হিজিবিজি লেখা পড়তে লাগ্‌ল।

সেই হিজিবিজি লেখা থেকে অনেক কষ্টে পাঠোদ্ধার করা হোলো—"দেরী আছে।"

একদিন আমরা ছেলের দল প্ল্যানচেট্‌ নিয়ে বসলাম। কত রকম দেশী বিদেশী মৃত আত্মার সাড়া পেতে লাগ্‌লাম। লেখা-গুলি কিছুই বুঝতে পারি না। বড়মামাকে আনতে চেষ্টা করলাম,—তিনি এলেন না। হঠাৎ কাগজে লেখা প'ড়ল—সপ্তম এডোয়ার্ড।

সপ্তম এডোয়ার্ড কি বাংলা লিখ্‌তে পারতেন নাকি? ভাব্‌লাম মৃত আত্মাদের হয়ত অনেক ক্ষমতা থাকে,—তারা সব পারে।

প্রশ্ন করা হোলো—"ইংরাজরা এদেশ থেকে পাত্‌তাড়ি গুটোবে কবে?"

এবার প্ল্যানচেট্‌টা খুব বেগে বন্‌ বন্‌ করে ঘুরতে লাগল। তার হিজিবিজি লেখার চোটে কাগজটা ছিঁড়ে গেল। মনে হোলো ভূতপূর্ব সম্রাট আমাদের প্রশ্নে খুব চটেছেন।

অবশ্যি এইসব ব্যাপারের মধ্যে কতটা সত্য আছে তা জানি না। অনেক সময় নিজের ইচ্ছাশক্তিই প্ল্যানচেট্‌ চালায়,—চালক ভাবে আত্মাই বুঝি ধরা দিয়েছে। আমরা নিছক খেলা হিসাবেই এটা নিয়েছিলাম, গুরুত্ব কিছুই দেই নি।

যখনই আত্মাকে কোনো কঠিন প্রশ্ন করেছি,—কিম্বা ভবিষ্যতের কিছু কথা জানতে চেয়েছি, তখন আত্মা আর কিছুই উত্তর দেয় নাই, শুধু হিজিবিজি কেটে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছে।

একবার কল্‌কাতা থেকে বাবা আমাদের জন্যে একটা ছোট বায়োস্কোপ কিনে আনলেন। এর আগে একটা ম্যাজিক ল্যানটার্ণও এনেছিলেন। তেলের বাতি জ্বালিয়ে একটা পর্দায় ছবি ফেলা হোত। হাতল ঘুরালেই পর্দায় ছবি পড়ত—চলন্ত ছবি, ঘোড়ার গাড়ী যাচ্ছে, দুটো লোক দৌড়ে চলেছে, একটা ছেলে চাকা চালাচ্ছে, একটা ঘোড়া ছুটছে ইত্যাদি।

এসব দেখে কী আনন্দই পেতাম।

—আট—

বামনদাসবাবুর স্কুলে দুপুরে যাই, বহু সঙ্গী পেয়ে গেছি। সব ছেলের দল, কেউ আর 'খুকুমণি' বলে না, তাই বেশ গর্ব অনুভব করি।

কিছুদিন পর দেখি সকালে-পড়ুয়া সেই ছেলে কয়টি দুপুরে আসতে আরম্ভ করেছে! প্রশ্ন ক'রে জানলাম, মাষ্টারমশাই তাদের আর সকালে আসতে বারণ করেছেন। তাই তারা এখন থেকে দুপুরেই আস্‌বে।

বামনদাস বাবু একলাই আমাদের সকলকে পড়াতেন। বাইরের বারান্দায় টেবিল আর বেঞ্চ পাতা ছিল, তিনি সেখানে এক একজন ক'রে পড়াতেন। আর বাকী ছেলেরা তখন সমস্ত স্কুলময় হৈ চৈ হুটোপুটি করে বেড়াত। বামনদাসবাবু কিছুই বলতেন না। ছেলেরা খেলাধূলার মধ্যে, আনন্দের মধ্যে লেখাপড়া শিখুক, তিনি তাই চাইতেন।

স্কুলের হাতার মধ্যে একটি উঁচু কাঁটালগাছ ছিল, পড়ার অবসরে তার নীচে আমরা রবারের বল নিয়ে ক্রিকেট খেলতাম।

গরমের দিনে দুপুর বেলা বামনদাসবাবুর স্ত্রী জানালা খুলে ঘুমাতেন,—মধ্যে মধ্যে, আমাদের বল্‌ গিয়ে তাঁর ঘরে পড়ত। তিনি বিরক্ত হতেন।

একদিন একটা বল্‌ সবেগে গিয়ে তাঁর নাকের উপর পড়ে। তিনি ঘুমোচ্ছিলেন হঠাৎ আঘাত পেয়ে চমকে উঠলেন,—আর ব্যাপারটা বুঝে দরজা খুলে বাইরে এসে আমাদের খুব তিরস্কার করতে লাগলেন।

সেই থেকে আমরা ক্রিকেট খেলা বন্ধ করে দিলাম। তবে ছুটোছুটি, হুটোপুটি সমান ভাবেই চল্ল।

এখানে আমার কয়টি অন্তরঙ্গ বন্ধু জুটেছিল! তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে প্রভাত (প্রভাতচন্দ্র বসু, এখন টাটানগরে একজন

দায়িত্বশীল বড় কর্মচারী) আর একজন হচ্ছে জ্যোতি (জ্যোতির্ময় রায়—যৌবনেই মারা যায়)।

আমি ছিলাম একটু নিরীহ প্রকৃতির আর ওরা ছিল খুব ডানপিটে ধরণের ছেলে,—আমার স্বভাবের সম্পূর্ণ উলটো। তবুও ওদের আমার খুব ভালো লাগত, ওদের সঙ্গেই বেশী মিশতাম।

স্কুলের একটি ছেলে খুব মিথ্যা কথা বল্‌ত, অর্থাৎ সে নাকি সত্য কথাই বলতে জানত না। একদিন বামনদাসবাবুর স্ত্রী ঠাট্টা ক'রে আমাদের বল্লেন—"ওর একটা জীবন-কাহিনী তোমরা কেউ লিখতে পার?"

আমি দুই দিনের মধ্যেই বই লিখে বামনবাবুর স্ত্রীকে দেখালাম "—র অনৃতের মহাভারত।"

বইয়ের ভাষা দেখে বামনবাবুর স্ত্রী খুশি হলেন। "তুমি লিখেছ? বেশ হয়েছে। মনোরঞ্জন বাবুর নাতি, ভালোত হবেই।"

বামনদাসবাবুও লেখাটির প্রশংসা করলেন, আর বল্লেন—"ও হতচ্ছাড়ার কথা লিখে সময় নষ্ট করলি কেন, অন্য কোনো বিষয় লেখ্‌। মনে হচ্ছে লিখতে পারবি।"

বামনদাসবাবু নিজেও সাহিত্য-রসিক ছিলেন। তাঁর লেখা বই 'সিটি বুক সোসাইটি' থেকে বার হয়েছে। তাঁর লেখা আরব্য-উপন্যাসের গল্পও আমরা আগ্রহের সঙ্গে শুনেছি।

বামনবাবুর স্কুলে আর একটি ছেলে পড়ত। তার এক একটি বাংলা উচ্চারণ ছিল বড় মজার। একদিন সে স্কুলের বারান্দায় বসে চীৎকার ক'রে পড়ছিল "হরধনু ভঙ্গ করিয়া রাম সীতাকে বিহবা করিলেন।"

বামনদাসবাবু শুনে বল্লেন, "ওরে, ওটা বিহবা নয় বিবাহ।" এই বলে তিনি কি একটা কাজে বাড়ীর ভিতরে গেলেন।

ছেলেটি উচ্চারণ শুধরে নিয়ে বল্লে "রাম সীতাকে বিবাহ করিলেন।" কিন্তু তারপরেই আবার পড়লো, "ভরতের সহিত

মাণ্ডবীর বিহবা হইল, লক্ষ্মণের সহিত বিহবা হইল উর্মিলার আর শত্রুঘ্ন বিহবা করিলেন শ্রুতকীর্তিকে।”

এমন সময় বামনদাসবাবু এসে তাকে ধম্‌কে বল্লেন, “থা লক্ষ্মীছাড়া,—বিহবা, বিহবা করে গাধার মত চেঁচিয়ে কান ঝালাপালা করে দিল। তুই থাম্।”

ছেলেটি অপ্রস্তুত হয়ে থামলো। তারপর থেকে তাকে দেখলেই আমরা বল্‌তাম “ঐ বিহবা যাচ্ছে।”

বামনদাসবাবু আমাদের মধ্যে মধ্যে উশ্রী নদীর ওপারে নিয়ে যেতেন, আর গাছ তলায় বসে নিজের লেখা গল্প প’ড়ে শোনতেন।

কী মজাই যে লাগত তা আর কি বলব।

সব স্কুলের মাষ্টার যদি এ রকম হোত তবে কি আর ছাত্রদের কিছু ভাবনা থাকত।

এত আনন্দের মধ্যেও পড়াশোনা কিন্তু আমাদের ঠিকই হতে লাগল।

একদিন স্কুল থেকে বাড়ী ফিরতে গিয়ে দেখি আমাদের গেটের সামনে একটা ঘোড়ার গাড়ীতে মস্ত মোটা একজন লোক বসে আছেন। কাকা তাঁর সঙ্গে কি কথা বল্‌ছেন।

পরে শুনলাম তিনি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথের ভাইপো ৺দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অর্থাৎ দীনু ঠাকুর। রবিবাবুর গানের অধিকাংশ সুরই ইনি দিয়েছেন।

তারপর আরো অনেকদিন এই দীনুবাবুকে পথে দেখেছি—ঘোড়ার গাড়ী ক’রে যেতে।

ক্রমে মেয়েদের বিভাগ বন্ধ হয়ে গেল। গ্রীষ্মে আমরা সকালে স্কুলে যেতে লাগলাম।

এক একদিন ছেলেরা পাল্লা দিতাম কে কত ভোরে স্কুলে আসতে পারে।

একদিন প্রায় অন্ধকার থাকতেই স্কুলে গেলাম ভাবলাম আজ নিশ্চয়ই বাজিমাৎ করব, এত ভোরে কেউই স্কুলে আসে নি। ও হরি, গিয়ে দেখি একটি ছেলে স্কুলের বেঞ্চে ভোঁসভুঁসিয়ে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে।

পরে শুন্‌লাম; সে রাত্রে খেয়ে দেয়ে স্কুলে এসেই ঘুম দিয়েছে সকলকে হারাবে বলে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা এক ভদ্রলোক আমাদের বাড়ীর বাইরের বারান্দায় বসে গান গাইছেন শুনতে পেলাম—

"আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে
বাজায় বাঁশি।"

যেমনি সুর, তেমনি গান, তেমনি গলা। রবীন্দ্রনাথের এই গানখানা সেদিন প্রথম শুন্‌লাম ভদ্রলোকর মুখে। এঁর নাম জ্ঞানচন্দ্র দত্ত, পরে গিরিডিতে বড় মুদির দোকান করেন।

এই গান শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। বাঙালীর ছেলে হয়েও খাঁটি বাংলা দেশ দেখি নাই—কী লজ্জার কথা, কী দুঃখের কথা। গানটির মধ্যে যেন বাংলা দেশের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। মুগ্ধ হয়ে শুনছি—

"মা তোমার ওই খেলাঘরে
শিশুকাল কাটিল রে—
তোমার ধূলো মাটি অঙ্গে মাখি
ধন্য জীবন মানি—"

কিন্তু আমার শিশুকালতো ঐ রকম বাংলা দেশে কাটে নাই, তার ধূলো মাটি অঙ্গে মেখে তো ধন্য হতে পারি নাই। জীবনে ধিক্কার এলো।

স্থির করলাম যে ক'রেই হোক সোনার বাংলার ধূলো গায়ে মাখতে হবে।

বাংলার সঙ্গে বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না বটে, তবে ছোটনাগপুরে হিন্দী-ভাষীদের মধ্যে বাস করলেও বাঙালীর সঙ্গে যথেষ্ট সম্পর্ক ছিল। যে সময়ের কথা বলছি, তখন বাঙালীরাই গিরিডিতে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন।

স্কুলের হেড-মাষ্টার, ষ্টেশন-মাষ্টার, পোষ্ট-মাষ্টার, ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্‌সেফ, ওভার-সিয়ার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার প্রভৃতি সবাই ছিলেন বাঙালী।

বারগণ্ডা অঞ্চলে অনেক নামজাদা বাঙালী বাস করতেন। কাজেই বহু বিশিষ্ট বাঙালীর সঙ্গ পেয়েছি। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের শুধু বন্ধুত্ব নয়, আত্মীয়তা হয়ে গেছিল। প্রায় প্রত্যেক পরিবারের সঙ্গে আমাদের নিবিড় সম্বন্ধ হয়েছিল। মামা, কাকা, মেসো, পিশে আর মামী, কাকী, মাসী, পিশি ইত্যাদি আমরা বহু পেয়েছিলাম। কাজেই এদিকে আমাদের বিশেষ কোনো ক্ষোভ ছিল না।

আমাদের অঞ্চল থেকে উশ্রী-প্রপাত ছিল প্রায় নয় দশ মাইল দূরে। সে সময় এই পথে উটের গাড়ী চলত। প্রকাণ্ড ছাউনী দেওয়া গাড়ী উটে টানত। আমরা একদিন বাড়ীর সবাই উটের গাড়ী চড়ে উশ্রী-প্রপাত দেখতে চল্লাম।

গাড়ী ছুটে চল্ল। উট তার লম্বা গলা নিয়ে অতি অদ্ভুত ভঙ্গিতে মুখ তুলে ছুটছে। মজাও লাগছে ভয়ও করছে। তার লম্বা লম্বা পিছনের পায়ের দিকে আমরা বসেছি, ভয় করছে যদি তেড়ে একবার ঠ্যাং চালায় তবে আর রক্ষা থাকবে না।

তবুও গাড়ী থেকে বলছি—

"উট চলেছে মুখটি তুলে—"
উটের গাড়ী চলছে দুলে।

—নয়—

আমাদের নিজস্ব বাড়ী তৈরি হয়ে গেল। শুভদিন দেখে গৃহ-প্রবেশ করা হবে বলে ঠিক হোলো।

ছয় বিঘা জমির উপর আমাদের বাড়ীটা আকারে খুব বড় নয় কিন্তু দেখতে বড় সুন্দর। যে দেখে সেই তারিফ করে।

বাবা নিজে পছন্দ করে নিজের মনের মত এই বাড়ী করিয়েছেন—সব রকম সুব্যবস্থা তাতে আছে।

ঠিক গৃহ-প্রবেশের আগে আমার সেজভাই সুকোমলের কঠিন অসুখ করল। আমাদের গৃহ-প্রবেশের দিন পিছিয়ে গেল।

আমাদের এই বাড়ীর পাশের বাড়ীতে দিদির এক বন্ধু ছিল। একদিন তাদের বাড়ীর উঠানে মেয়ের দল চড়াইভাতি করছিল। হঠাৎ খিচুড়ী রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে দিদির সেই বন্ধুর শাড়ীতে গেল আগুন ধ'রে। অনেক ক'রে আগুন নেবানো হোলো বটে, কিন্তু তার শরীরের অনেক জায়গা পুড়ে গেল। চড়াইভাতির আনন্দ সব পণ্ড হয়ে গেল।

এই সময়ে মামাবাড়ীতে আর একটি ছেলে এসে জুটেছে। রক্তের কোনো সম্পর্ক না থাকলেও—আমরা তাকে ভাই বলেই জানতাম। সে বয়সে আমার কিছু ছোট হলেও, ভাইদের দলপতির কাজ করত। ভাইরা তার উপদেশ গ্রহণ করত—সিগারেট খেয়ে মুখে গন্ধ হলে, মুখে কি করে লেবু পাতা ঘষতে হয়, সর-পড়া দুধ থেকে সর না নেড়েও নল দিয়ে কি করে লুকিয়ে দুধ খেতে হয়, কি করে অভিভাবকদের না জানিয়েও অনেক কিছু করা যায় ইত্যাদি নানা হিতোপদেশ সে ভাইদের দিত। আর ভাইরা সাধ্যমত তার উপদেশ গ্রহণ করত।

একদিন তার পরামর্শ মত ভাইরা মামাবাড়ীর ঢেঁকী ঘরের বাগানে মনের আনন্দে খিচুড়ি চড়িয়েছে চড়াইভাতি করবে বলে। খিচুড়ি টগবগ করে ফুটছে, ভাইরা আসন করছে খেতে

বস্‌বে বলে। আগেই বেগুন-ভাজা হয়ে গেছে। সবাই ক্ষুধার্ত্ত, পেট চুঁই চুঁই করছে, এমন সময় দূরে দাদামশাইকে দেখা গেল। তিনি গাড়ু হাতে কোথায় জানি যাচ্ছিলেন—হঠাৎ এদিকে এগিয়ে এলেন।

একবার তিনি বল্লেন 'ষ্টুপিড', তারপর কাছে এসে ফুটন্ত খিচুড়ির মধ্যে গাড়ুর জল ঢেলে দিলেন্। দাদামশাইকে দেখে ভাইয়ের দল সবাই আগেই সট্‌কে পড়েছে।

দাদামশাই উনানের আগুন নিবিয়ে দিলেন। খিচুড়ি বেগুন ভাজা সব গাড়ুর জলে পবিত্র করে চলে গেলেন।

কিছুদিন আগে চড়াইভাতি করতে গিয়ে একটি মেয়ের শাড়ীতে আগুন লেগেছে দাদামশাই জানতেন,—তাই তিনি আর একটা বিপর্যয় হবার আগেই তার মূলোচ্ছেদ করলেন।

অনেকদিন ভুগে আমার সেজভাই ভালো হোলো, কিন্তু এত দুর্ব্বল যে হাঁট্‌তে পারে না।

একদিন খুব ভোরে, তখনও আকাশ অন্ধকার, বাবা সেজভাই সুকোমলকে কোলে ক'রে নিয়ে আমাদের সঙ্গে ক'রে নতুন বাড়ীতে এলেন।

আমরা আমাদের নতুন বাড়ীতে এলাম।

নতুন বাড়ীতে এসে আমাদের আনন্দের আর সীমা নাই। ভিতরের ঘরের উত্তর দিকের জানালা দিয়ে দেখি,—নদীর ওপারের খাণ্ডুলী পাহাড়ের উঁচু মাথাটা দেখা যাচ্ছে, শালবনের মধ্যে দিয়ে।

বাইরের বারান্দা থেকে দেখা যাচ্ছে, পরেশনাথ পাহাড়ের আবছা-নীল চূড়ো। আশেপাশে ফাঁকা মাঠ, সেই মাঠের মধ্যে বট, মহুয়া, অশত্থ প্রভৃতি বড় বড় পত্রবহুল গাছ, আমাদের হাতার মধ্যেও অনেক গাছ।

বাবা বাড়ীটাতে অনেক সুবিধা করেছেন। গিরিডিতে জলের কলের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু বাবা আমাদের মুখ ধোবার

জন্যে, স্নানের জন্যে কলের বন্দোবস্ত করেছিলেন। চৌবাচ্চায় ইঁদারার জল রাখা হোত, তার সঙ্গে কল লাগানো হয়েছিল। কল টিপলেই জল পড়ত। স্নানের ঘরে ঝাঁঝরি পর্যন্ত ছিল।

বাবা বৈঠকখানাটাকেও সুন্দর ভাবে সাজালেন। বড় বড় সুন্দর সুন্দর রঙীন্ ছবি টানালেন। তাদের মধ্যে দুখানা প্রকাণ্ড ছবি ছিল, 'কাদম্বরী' গল্পের দুটি ঘটনা অবলম্বনে আঁকা। দামী দামী বই ভরা আলমারী রাখা হোলো। সব ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে।

এইবার বাবা বাড়ীটা ফুলের বাগান দিয়ে সাজাতে লাগলেন। ফুলের বাগানের তাঁর ছিল বেজায় সখ। পুণা, বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ প্রভৃতি জায়গা থেকে ভালো ভালো ফুলের বীজ আনাতে লাগলেন,—আর নিজে হাতে বাড়ীর সামনের দিকটায় সেগুলি লাগাতে লাগলেন।

গেটের দুপাশের রাস্তায় গোলাপ ফুল ফুটতে লাগলো—কত কি নাম, ব্ল্যাকপ্রিন্স, গ্র্যাণ্ড-মোগল, মার্সাল-নীল কত রকমের রং, কত রকমের আকার।

পাশের বাগানে ইঁদারার ধারে সব্জীর চাষ হতে লাগল। লাউ, কুমড়ো, সিম, কপি, বেগুন ইত্যাদি।

কত লোক আমাদের বাড়ী দেখতে আসত। কেউ কেউ বলত, "পশুপতি বাবু বেশ সৌখীন লোক দেখছি।"

সত্যি বাগান করার দিকে বাবার নেশা বরাবরই দেখেছি।

হোসেন আলী গোয়ালা প্রতিদিন তার গরু নিয়ে এসে আমাদের বাড়ীতে খাঁটি দুধের যোগান্ দিত। টাকায় দুধ ছিল ষোলো সের। তার আগে মামাদের কাছে শুনেছি, টাকায় দুধ ছিল কুড়ি সের।

একজন বুড়ী আসত মাখন নিয়ে আর ভাল ভাল মাখন দিয়ে যেত আমাদের বাড়ীতে। আমরা সেই মাখন জ্বাল দেওয়া ঘি খেতাম।

মাথায় শাদা পাগ্‌ড়ি বেঁধে ইস্‌মাইল নামে রুটিওলা প্রতিদিন বিকালে ঝুড়ি করে আমাদের দৈনিক বরাদ্দ পাঁউরুটি দিয়ে যেত। মাসকাবারে দাম দেওয়া হোত। সেই টাট্‌কা পাঁউরুটির গন্ধ এখনও ভুলতে পারি নাই। পাঁউরুটির বোঁটা খেতে আমাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত।

খাবারের মধ্যে মাছ মাংস পেতাম না, কারণ তখন তা গিরিডির সহরে দুর্ল্ভ ছিল। তবে সস্তায় মুর্গীর ডিম পাওয়া যেত—দু পয়সা তিন পয়সা জোড়া।

স্থানীয় দেহাতী মেয়েরা মধ্যে মধ্যে আসত ন্যাটা, পুঁটি, বাটা মাছ নিয়ে।

মা তাই রাখতেন। তারা অল্প পয়সায় অনেক মাছ দিয়ে চলে যেত।

মাথায় ঝুড়ি ক'রে মেয়েরা কয়লা নিয়ে আসত, দুই তিন পয়সা ঝুড়ি। গিরিডিতে তো কয়লার অভাব নাই। ঝুড়ির পর ঝুড়ি কয়লা দিয়ে তারা চলে যেত।

কোনো অভাবই ছিল না আমাদের। যা দরকার সবই সস্তা, অর্থাৎ জলের দর।

বাড়ীতে প্রচুর দুধ রাখা হোত, তার উপর আবার দেহাতী টক্‌ দই, সোণার মত আখের গুড় দিয়ে খেতে আমরা খুব ভালো বাসতাম। তাই দইও রাখা হোত ভাঁড়ে ভাঁড়ে।

সপ্তাহে রবিবার একদিন হাট বসত। বাবা হাটে গিয়ে সরু চিড়ে, সোনালী রংয়ের এখো গুড় ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে নিয়ে আসতেন।

রবিবার হাটের দিন আমরা বহু সাঁওতাল দেখতে পেতাম। সাঁওতাল পুরুষদের বলা হোত 'মাঝি' আর মেয়েদের 'মাঝিয়ান'। মেয়েরা মাথায় করে কাঁদা-কচু, লাউ-কুমড়ো, ঘাংড়া-বরবটি, নানান্‌ জংলা-শাক, কুদ্‌রুম্‌ প্রভৃতি হাটে বিক্রী

করতে নিয়ে যেত। তাদের যাবার সোজা রাস্তা ছিল আমাদের বাড়ীর ধার দিয়ে।

আমরা কয়েকটি সাঁওতালী কথা শিখেছিলাম। কৌতুক ক'রে তা প্রয়োগ করতাম, "হাপে হাপে।" (থামো থামো)। থামলেই প্রশ্ন করতাম--"ওকা ওরা তাম?" (তোমার বাড়ী কোথায়)। হয়ত বলত—"খাড়ুলী" (খাণ্ডুলী পাহাড়ের ধারে)। তারপরেই বলতাম—"দেলা বাং।" (তাড়াতাড়ি যাও)।

আমাদের বিদ্যে এইটুকুই ছিল। তাই প্রয়োগ ক'রেই খুশী হতাম।

মধ্যে মধ্যে আমাদের জানা এক বুড়ো সাঁওতাল আমাদের বাড়ীতে আসত—ছোট্কু মাঝি।

সে নেচে নেচে তাদের ভাষায় গান গাইত—

"বুড়ুরে সিং আড়া—দাড়েগে বাং—
কচারে লাবয় গিয়ে তেঙ্গাঙ্গে বাং।"

দশ

মায়ের অনেক দিনের ইচ্ছা দেশ দেখবার। কিন্তু যাবার অনেক হাঙ্গামা বলে বাবা এতদিন রাজি হন নাই। আমাদের দেশ তো আর এখানে নয়, সে অনেক দূর—পদ্মা পার হয়ে যেতে হবে। এখান থেকে ট্রেণে কলকাতা, কলকাতা থেকে গোয়ালন্দ, গোয়ালন্দ থেকে পদ্মা পাড়ি দিয়ে নারায়ণগঞ্জ, সেখানে আবার হয় ষ্টীমার বা নৌকায় তালতলা, সেখান থেকে পাল্কী কিম্বা ডুলীতে মালখাঁনগরের বাড়ী। ঢাকা হয়ে গেলে আরো দূর।

নতুন বাড়ীতে এসে বাবা দেশে যেতে রাজি হয়ে গেলেন, এবং যাত্রার দিন-ক্ষণও ঠিক হয়ে গেল।

তাই শুনে আমি তো মেতে উঠলাম। আমার এত দিনের সাধ পূর্ণ হতে চলেছে। জ্ঞানতঃ প্রথম ট্রেণে চড়ব, সোনার বাংলা দেশ—আমার স্বপ্নের দেশ দেখব, কলকাতা সহর দেখব, ষ্টীমারে চড়ব—আঃ ভাবতেও যেন উল্লাসে আত্মহারা হয়ে উঠলাম। রাত্রের ঘুম নষ্ট হয়ে গেল। খালি ঐ কথাই ভাবি।

জন্মের থেকেই গিরিডি সহরে প্রায় কূয়োর ব্যাংয়ের মত আছি, এইবার বাইরের দুনিয়াটা দেখব,—প্রাণ ভরে মুক্তির নিশ্বাস নেব।

অবশ্য আমার বয়স যখন সবে দুই বছর, শুনেছি তখন মাসির বিয়েতে একবার কল্‌কাতায় গেছিলাম। আমার মেজভাই সুবিমল সে সময় কলকাতাতেই জন্মায়। সে কথা আমার কিছুই মনে নাই। তাই জ্ঞান হবার পর এই প্রথম কলকাতায় যাচ্ছি।

বন্ধু-বান্ধবদের যাকে পাই তাকেই এই সুসংবাদটা দেই। কেউ আনন্দ প্রকাশ করে, কেউ আমার এই সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করে।

শেষে সত্যিই একদিন দেশে রওয়ানা হলাম।

ট্রেণ চলেছে ধিকি ধিকি—আর কী মজাই লাগছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে বাইরের সমস্ত দৃশ্যটাকে দুই চোখে যেন পরিপূর্ণ

করে ভরে' ফেলেছি, এক একবার ঝুঁকে পড়ে' দেখছি—চলন্ত ট্রেণের চাকাটা দেখা যায় কিনা। বাঁকের মুখে দেখছি চলন্ত ইঞ্জিনটাকে দেখা যাচ্ছে। রাশ রাশ ধোঁয়া ছাড়ছে।

মধুপুরে গাড়ী বদল করলাম। আর কিছু পরেই সমতল ভূমিতে গিয়ে পড়ব—দেখব ছোটনাগপুরের মাটির সঙ্গে তার তফাতটা কি?

বর্ধমান ছাড়িয়ে সত্যিই দৃশ্যের পরিবর্তন হোলো। দুই ধারে চোখ-জুড়ানো শ্যামল শোভা, আশে-পাশে জলা-জায়গার ধারে ধারে ঘন সবুজ কচু, ঘেঁটু গাছের ঝোপ, কুটিরের ছাদ ছাপিয়ে উঠেছে কলাগাছের ঝাড়,—মাঠে মাঠে হাওয়ায় দুলছে কচি কচি ধানের চারা,—বাংলা মা সত্যিই যেন হাসছেন। মনে পড়ল কবির গান—

"অঘ্রাণে তোর ধানের ক্ষেতে
কী দেখেছি মধুর হাসি।"

মুগ্ধ হয়ে দেখছি, এমন সময় ট্রেণ এসে থাম্‌লো বেলুড়। এখানে রেল-কর্মচারীরা এসে ট্রেণের প্রতিটি কামরা চাবি দিয়ে এঁটে দিল, পরের ষ্টেশন লিলুয়াতে চাবি খুলে টিকিট সংগ্রহ করা হবে। আগে এইরকম নিয়মই ছিল, হাওড়ায় আর টিকিট নেওয়া হোত না।

ঠিক সন্ধ্যার মুখে কল্‌কাতায় এসে পৌঁছুলাম। আলো, আলো, চারিধারে রকমারী আলো,—লাল, নীল, বেগুনী—সারা ষ্টেশনটায় যেন রঙীন আলোর ফুলঝুরি।

কত রকম লোক, কত রকম শব্দ—মাথা যেন ঘুলিয়ে যায়। কুয়োর ব্যাং হঠাৎ সাগরে এসে পড়েছে যেন।

ঘোড়ার গাড়ী করে' গঙ্গার কাঠের পুল পার হতে লাগলাম।

ঈস্, কত বড় গঙ্গা, কত জাহাজ, ষ্টীমার ভোঁ ভোঁ করছে।

মা বল্লেন—"গঙ্গা-মাকে প্রণাম কর।" আমরা মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম।

এই প্রথম কলকাতার সঙ্গে পরিচয়। প্রথম দেখলাম রাস্তার উপর দিয়ে ঢং ঢং আওয়াজ করে' ট্রাম চলছে—মধ্যে মধ্যে এদিক ওদিক দিয়ে মোটর গাড়ী ঝড়ের বেগে ছুটে যাচ্ছে, কত দোকান-পশার, কত বড় বড় বাড়ী, তাক্ লেগে যাচ্ছে। অবাক্ হয়ে দেখছি, সবই নতুন লাগছে। কোথায় ছিলাম, কোথায় এসেছি, এ যেন রূপকথার রাজ্য।

এক আত্মীয়ের বাড়ী একরাত একদিন কাটিয়ে আবার শিয়ালদায় গোয়ালন্দ-মেলে চড়লাম।

পরের দিন ষ্টীমার, প্রথম প্রথম চড়তে ভয় করছিল। কত বড় পদ্মানদী, যদি ষ্টীমার থেকে পড়ে যাই আর রক্ষা থাকবে না। আর ষ্টীমারই যদি ডুবে যায়—ভাব্‌তেও গায়ে কাঁটা দেয়। সাঁতার শিখি নাই—নদীতে পড়লে একেবারে সঙ্গে সঙ্গে অতলে তলিয়ে যাব। মনে হোলো আমার গিরিডিই ভালো, সেখানে বড় নদী নাই, ষ্টীমারে চড়তে হয় না—কোনো ঝামেলা নাই।

যাই হোক, বড় বড় ঢেউ তুলে জল কেটে ষ্টীমার ছুট্‌লো। ছুটন্ত ষ্টীমারের মধ্যেই হেঁটে চলে বেড়াচ্ছি। রেলিংয়ে ভর দিয়ে নতুন নতুন দৃশ্য দেখছি, আর ভয় করছে না—বরং মজাই লাগছে।

ঠিক সন্ধ্যার আগেই আমরা দেশের ষ্টীমার-ঘাটে পৌঁছালাম। মা ডুলীতে চল্লেন, আমরা হেঁটেই চল্লাম দেশের বাড়ীর দিকে। বাংলাদেশের গাঁয়ে সন্ধ্যা নামছে, গাছ-পালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সূর্যাস্তের লাল আকাশ। আমার চোখে নেশা লাগ্‌ছে। ঘরমুখো পাখীরা নানান সুরে ডাক্‌তে ডাক্‌তে আকাশ পাড়ি দিচ্ছে। কোথায় জানি একটা কোকিল ডাকছে

অবিশ্রান্ত। ঝিরি ঝিরি করে' মিষ্টি বাতাস বইছে—মনে পড়ল কবির গানের লাইন—

"চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস—
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।"

সত্যি আমার প্রাণেও যেন বাঁশি বাজছে।

পথে বাবার সঙ্গে আত্মীয়দের দেখা হচ্ছে। বাবা কাউকে প্রণাম করছেন, কেউ আবার বাবাকে প্রণাম করছে। বাবার নির্দেশ মত আমরাও কারুকে কারুকে প্রণাম করছি।

এইবার দেশের বাড়ীতে এসে ঢুক্‌লাম। জীবন যেন সার্থক মনে হোলো। নিজেকে গর্বিত মনে করতে লাগ্‌লাম। গিরিডির বন্ধুদের জন্যে মনে মনে দুঃখ অনুভব করলাম, ভাবলাম গিরিডি ফিরে গিয়ে এইসা গল্প তাদের কাছে করব!

এই বাংলাদেশ, এখানে সবাই বাঙালী, ধোপা-নাপিত, চাষী-মজুর, মুচি-মেথর সবাই বাংলা কথা বলে। মনে হয় সবাই যেন আমার আত্মীয়—সবাই আমার আপন জন।

যদিও এদের ভাষার টান্ একটু ভিন্ন ধরণের তবুও তো এরা বাংলাভাষী বাঙালী। কথা শুনে অসীম তৃপ্তি পাই।

—এগারো—

কিছুদিন দেশে কাটিয়ে এবার ঢাকা হয়ে আবার কলকাতায় ফিরলাম। কলকাতায় কিছুদিন থেকে, অনেক কিছু দেখলাম— চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, বোটানিক্যাল গার্ডেন। বোধহয় জীবনে প্রথম মোটরেও চড়লাম।

মনে পড়ে, সে সময়ে বোধহয় গড়ের মাঠে 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল' তৈরি হচ্ছিল। তার চারিধারে বাঁশের ভারা বাঁধা ছিল।

প্রচুর বাইরের জ্ঞান সঞ্চয় করে আবার গিরিডিতে ফিরে এলাম।

বন্ধু-বান্ধবদের কাছে গল্পের আর শেষ নাই। যা দেখেছি তার দশগুণ বাড়িয়ে গল্প করি, তারা অবাক হয়ে শোনে আর ঢোঁক গেলে।

এই সময়ে গিরিডির আকাশে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম।

শুন্‌লাম আকাশে ধূমকেতু উঠছে। ধূমকেতুর কথা আগেই জান্‌তাম, কিন্তু স্বচক্ষে দেখি নাই।

এইবার নিজের চক্ষে ধূমকেতু দেখলাম।

একটা জল্‌জ্বলে তারা আকাশে উঠেছে, সুদীর্ঘ তার পুচ্ছ। কিন্তু পুচ্ছটা অত উজ্জ্বল নয়, কিন্তু আকাশের অনেকখানি স্থান জুড়ে সেটাকে দেখা যাচ্ছে।

শুন্‌লাম ঐ পুচ্ছটা নাকি কোটি কোটি মাইল লম্বা।

অনেকদিন পর্যন্ত আমরা আকাশে এই অপূর্ব দৃশ্য দেখেছি।

একটা কবিতায় লিখেছিলাম—

ধূমকেতু, ধূমকেতু
আলোমাখা গাটা,
আকাশেতে যেন তুই
আলোকের ঝাঁটা।

লেজ সাথে ঘুড়ি যেন
আকাশেতে ওড়ে,
নিকটেতে আয় তুই,
নিয়ে আসি ধরে'।

দেশ থেকে ফিরে এসে কিছুদিন পর আমরা ভাই-বোনেরা ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগতে আরম্ভ করলাম।

প্রতিদিন কাঁপিয়ে জ্বর আসে। গরমের দিনেও শীতে কাঁপ্‌তে থাকি, পথ্য সাবু আর বার্লি, বার্লি আর সাবু।

অসুখ আর ভালো হয় না। বাড়ীশুদ্ধ যেন হাসপাতাল, কারুর মনে শান্তি নাই, আনন্দ নাই।

ডাক্তার আসেন, তিতো-ঝাঁঝালো বিস্বাদ ওষুধের ব্যবস্থা করে যান্। বাধ্য হয়ে নাক টিপে তাই খাই—অনেক সময় বমিও হয়ে যায়।

অসুখ আর ভালো হয় না, দিদি থেকে আরম্ভ করে ছোট ভাই পর্যন্ত সবাই ভুগে ভুগে সারা, সবাই প্রায় অস্থিচর্মসার হয়ে উঠলাম।

ঠিক এইসময়ে স্যার নীলরতন সরকার গিরিডিতে বেড়াতে এলেন। বাবার সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল, তিনি তাঁকে দিয়ে আমাদের দেখালেন। তিনি আমাদের পেট টিপে বল্লেন—"পিলে বেড়েছে। ভালো হলেও কিছুদিন কাঁচা ঘি খেতে দেবেন না।"

আমাদের এই অসুখের মধ্যেই বাবা স্যার নীলরতনের ছোট ভাই যোগীন্দ্রনাথ সরকারের লেখা "শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী" আমাদের কিনে দিলেন।

এই বই হাতে পেয়ে আমরা যেন নতুন জীবন ফিরে পেলাম। মোটা লাল-মলাটের বই—উপরে সোনার জলে লেখা "শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী"।

বইখানা পেয়ে আমার ও দিদির মধ্যে [illegible] পড়ে

গেল, কে আগে দেখবে, কে আগে পড়বে। শেষে আমরা সময় ভাগ করে নিলাম।

কত রকম ছবি, গল্প, কবিতা, ছড়া,—একবার পড়্‌লে আশ মেটে না, বারেবারে পড়ি। পড়্‌তে পড়্‌তে কবিতা ছড়াগুলি মুখস্থ হয়ে যায়, কোথায় কোন ছবি আছে চোখ বুজে বলতে পারি, কোন্ পাতায় কোন্ গল্প আছে মুহূর্তে বল্‌তে পারি। এক কথায় বইখানা নিয়ে আমরা মশ্‌গুল হয়ে উঠলাম।

যাক এর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের অসুখ ভালো হয়ে গেল। আমরা ভাত-পথ্য পেলাম।

এই সময়ে মামাবাড়ীর সবাই অল্প কিছুদিনের জন্যে কলকাতায় চলে গেলেন, তাদের বাড়ীতে রইলেন কয়েকজন কর্মচারী।

আমাদেরতো অসুখ ভালো হোলো কিন্তু আমাদের বাড়ীর কাছে মিস্ত্রি-পাড়ায় লাগলো প্লেগ। ক্রমাগত লোক মরতে আরম্ভ করল। বাবা ভয় পেয়ে আমাদের নিয়ে বারগণ্ডার শেষ অঞ্চলে 'পাহাড়িয়া কুঠি' নামে আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিলেন। আমাদের বাড়ীটা খালিই পড়ে রইল।

একটা উঁচু জায়গায় এই বাড়ীটা তৈরি হয়েছিল বলে এর নাম রাখা হয় 'পাহাড়িয়া কুঠি।' একটু নীচেই উশ্রী নদী। বাড়ীর ভিতরের বারান্দা থেকেই নদী দেখা যায়,—ওপারের ঘন শালবন দেখতে পাওয়া যায়।

আমরা যখন-তখন নদীতে বেড়াতে যাই, গ্রীষ্মের জলহীন নদীতে সাদা বালুর উপর ছুটোছুটি করি, ওপারে শালের জঙ্গলে খেলা করি। দিন বেশ সুখেই কাটে।

প্রায় দুই তিন মাস পর আবার আমরা নিজের বাড়ীতে ফিরলাম। তখন পাড়ার প্লেগ কমে গেছে।

আবার ব[illegible]র স্কুলে পড়াশোনা আরম্ভ করেছি।

আবার পুরাণো বন্ধুদের সঙ্গে হৈ চৈ করছি। এখানে পড়া-শোনার চেয়ে খেলাধূলাই বেশী।

একদিন স্কুলের ছেলেরা দল বেঁধে গেলাম নদীর ওপারে চড়াই-ভাতি করতে। রান্না হবে খিচুড়ী আর মুর্গীর মাংস।

এইখানে আমার সেই বন্ধু জ্যোতির কেরামতি দেখলাম। অনেকগুলি জ্যান্ত মুর্গীর গলা একসঙ্গে ধরে' সে ছুরি দিয়ে ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্ করে' কেটে ফেল্ল। মুর্গীগুলির ছট্‌ফটানি দেখে আমি শিউরে উঠলাম। জ্যোতি হেসে বল্লে—"আমি আরো বেশী মুর্গী একসঙ্গে কাটতে পারি।"

এই জ্যোতি ছিল দুর্দান্ত সাহসী আর বেপরোয়া গোছের ছেলে। রাগলে তার আর কোনো জ্ঞান থাকতো না।

একবার ছেলেমানুষী ঝগড়া করতে করতে হঠাৎ খাপ্পা হয়ে সে গোব্‌রা নামে আমাদের আর এক বন্ধুর রগে লাট্টুর আল্ দিয়ে এমন মারলো যে, তার রগ ফুটো হয়ে অঝোরে রক্ত পড়তে লাগল। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

গুজব উঠল জ্যোতিকে পুলিশ ধরতে আসছে। সবাই জ্যোতিকে আত্মগোপন করতে বল্ল, কিন্তু জ্যোতি বল্লে—"পালাব কেন রে, দোষ করেছি যখন, পুলিশের কাছে অবশ্যই ধরা দেব।"

অবশ্য পুলিশ আর তাকে ধরতে আসে নাই। গোবরাও ক্রমে ভালো হয়ে উঠল। আবার দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বটা বেশ জমে উঠল।

বামনদাসবাবুর স্কুলে একটা কৃষ্ণচূড়ার উঁচু গাছ ছিল, তার উপর উঠে আমরা 'দোলপাত্তা' খেলতাম। একদিন একটি ছেলে তার একটা ডালে বসে ভাবে বিভোর হয়ে গুন্ গুন্ করে' গান গাইছে, আর একটি ছেলে দুষ্টুমি করে হঠাৎ সেই ডালটি ধরে' ঝুলে নীচে লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সেই

ডালটি স্প্রীংএর মত লাফিয়ে উপরের দিকে উঠল, আর চোখের নিমেষে সেই গায়ক ছেলেটি মুখ থুব্‌ড়ে নীচে পড়ে' গেল।

তারপর মাটিতে পড়ে' তার সে কী কান্না! বেচারার বেজায় চোট্‌ লেগেছিল।

বামনবাবু এসে বিরক্ত হয়ে বল্লেন—"তোরা যদি এত দুষ্টুমি করিস্‌, তো স্কুল বন্ধ করে দেব।"

স্কুল বন্ধের নামে আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল, কারণ এই স্কুলটাকে আমরা প্রাণের চেয়ে বেশী ভালোবাসতাম।

বামনদাসবাবুর স্ত্রী খুব ভালো গান গাইতে পারতেন। দিদি তাঁর কাছে গান শিখতে আরম্ভ করলেন। দিদি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে রোজ গান শিখে বাড়ীতে তার অভ্যাস করতেন।

এইসব গান তাঁর মুখে শুন্‌তাম—

"উঠগো ভারতলক্ষ্মী, উঠ আজি জগতজন-পূজ্যা
দুঃখ-দৈন্য সব নাশি কর দূরিত ভারত লজ্জা।" ইত্যাদি।

কিম্বা

"সম্মুখে রাঙা মেঘ করে খেলা
ওগো তরণী বেয়ে চল গগনে নাহি বেলা—"

অথবা

"হে সখা মম—
ধ্যানে-জ্ঞানে হৃদয়ে রহ।
সংসারের সব কাজে
ধ্যানে-জ্ঞানে হৃদয়ে রহ।"

এই সময়ে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখ্‌তাম, ছবিও আঁকতে চেষ্টা করতাম। একটি ছোট খাতা করেছিলাম, তাতে ধারে ধারে রঙীন পেনসিল দিয়ে ছবি এঁকে তার মধ্যে কবিতা লিখ্‌তাম।

মনে পড়ে সেই খাতার কয়েকটি কবিতার নাম—কবীরের জন্ম, রাণী ও সারিকা (শালিক), ভক্ত প্রহ্লাদ ইত্যাদি।

দিদি গান শেখায় প্রচুর উৎসাহ পেতেন, কিন্তু আমার এই সাহিত্য সাধনায় বিশেষ কোন উৎসাহ পাই নাই। বরং ধরা পড়লে, পড়ায় ফাঁকি দিচ্ছি বলে বকুনি খেয়েছি। তাই গোপনেই সাহিত্যচর্চা করি। নিজেই লিখি, নিজেই পড়ি।

একদিন ছুটির দিন, দিদি ঘরে বসে গান শিখছেন—

"লাল তমাল তাল, লাল কুসুম দল,
লাল যমুনাজল লীলায় বহিয়া যায়—"

আমি পাশের ঘরে বসে একমনে একটি ধারালো ছুরি দিয়ে একটা রবারের পাতে নিজের নাম খোদাই করতে চেষ্টা করছি, হঠাৎ ছুরির ধারালো ফলাটা ঘ্যাঁচ্ করে আমার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে ঢুকে গেল। আর যায় কোথায়— আমার বুড়ো আঙুলের মাংসশুদ্ধ খানিকটা চামড়া কেটে খুলে পড়ল, আর সেকি রক্ত!

দিদি ও ঘরে বসে গান সাধ্ছেন 'লাল তমাল তাল'—আর এ ঘরে আমার বুড়ো আঙুল রক্তে লাল হোলো।

যন্ত্রণায় চীৎকার করে' উঠলাম। বাড়ীর সবাই দৌড়ে এলেন। বাবা বাড়ী ছিলেন না। কে জানি এক বাটি রেড়ির তেল এনে আমার বুড়ো আঙুলটা তাতে ডুবিয়ে দিল, সমস্ত তেলটা রক্তে লাল হয়ে গেল।

ঐ অবস্থায় আঙুলটা বেঁধে দেওয়া হোলো। আঙুলটা বেজায় টন্ টন্ করতে লাগ্ল।

দুই তিনদিন আঙুলটা এভাবেই বাঁধা রইল। কিন্তু তারপরই আঙুল থেকে দুর্গন্ধ বার হতে লাগ্ল, মনে হোলো আঙুলটায় যেন পচ্ ধরেছে।

বাবা আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন, সেখানে ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে' দেখ্লেন আঙুলে দূষিত ঘা হতে আরম্ভ করেছে।

তিনি ওষুধ-পত্র লাগিয়ে নতুন করে' আবার আঙুলটা বেঁধে দিলেন। অনেকদিন পর আঙুলটা ভালো হোলো। আজও বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলে আমার ঐ কাটা দাগটা আছে।

বাবা দিদির স্কুল ছাড়িয়ে দিলেন, এবং বাড়ীতে মাষ্টারের ব্যবস্থা করলেন।

মাষ্টার এসে রোজ সকালে আমাকে ও দিদিকে পড়াতে লাগ্লেন। দুপুরে আমার স্কুল ঠিকই চল্তে লাগ্ল।

দিদি ও আমি একই বই পড়ি, একই অঙ্ক কষি।

দিদি পড়া না পারলে মাষ্টারমশাই আমাকে মারেন। দিদি মেয়ে-মানুষ বলে তাঁকে কিছু বলেন না, আমাকে মেরে তাঁকে শিক্ষা দেন। অথচ পড়া আমি ঠিকই করি।

একদিন দিদি হাতের লেখা লেখেন নাই বলে মাষ্টার আমার মাথাটা দেওয়ালের সঙ্গে ঠুকে দিলেন।

আমি কেঁদে বল্লাম—"আমিতো হাতের লেখা লিখেছি,—মিছিমিছি মারছেন কেন?"

মাষ্টার বল্লেন, "তুমি তো লিখেছ; কিন্তু ও লেখে নাই কেন?"

বল্লাম, "ওকে মারুন না কেন।"

মাষ্টার বল্লেন—"ওতো মেয়ে-লোক, তোমাকে মারলেই ও বুঝ্‌বে ওকেই মারা হচ্ছে।"

আচ্ছা বিচার-ব্যবস্থা বটে। উদো করবে দোষ, আর বুদোর হবে সাজা। শত হোক্ স্ত্রীলোকের গায়ে কি হাত দেওয়া যায়?

যাক্ এই মাষ্টারের হাত থেকে শীগ্‌গিরই রেহাই পেলাম।

দাদামশাইরা এই সময়ে কল্‌কাতা থেকে ফিরেছেন—আর তিনি রোজ সকালে আমাদের বাড়ী আসেন আর বাইরের ঘরে ইজিচেয়ারে বসে ইংরাজী খবরের কাগজ 'ইংলিশম্যান' পড়েন।

এই ঘরেই মাষ্টার আমাদের পড়াতেন। একদিন তিনি মাষ্টারের এই অন্যায় বিচার লক্ষ্য করে' তাঁকে খুব তিরস্কার করলেন আর বাবাকে বলে দিলেন।

সেইদিন থেকে মাষ্টার পাত্‌তাড়ি গুটালেন।

দাদামশাই বল্লেন, "তোকে আমি 'মেঘনাদ বধ' পড়াব। তাহলে বাংলাভাষা ভালো শিখ্‌তে পারবি।"

আমাদের বাড়ীতে রান্নার কাজ করত ভিখারী দোবে নামে এক পশ্চিমা ব্রাহ্মণ।

একদিন ভোরের ডাকে তার নামে একখানা বাংলাভাষায় লেখা চিঠি এলো তার দেশের গ্রাম থেকে, তাতে তার কাকার মৃত্যুসংবাদ দেওয়া ছিল।

চিঠিখানা পড়ে' বাবা মার কাছে দিলেন। মা আমাকে বল্লেন, "চিঠিখানা এখন বেমালুম চেপে রাখ্। এখন দোবেকে চিঠি দিলে ভয়ানক কান্নাকাটি করবে,—নাওয়া-খাওয়া আর করবে না। তার চেয়ে দুপুর বেলা দোবের খাওয়া-দাওয়ার পর তুই চিঠিখানা ওকে পড়ে শোনাবি।"

মা একটা ভীষণ কাজের ভার আমার উপর চাপালেন।

দুপুরে দোবে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমাদের উঠানে দাঁড়িয়ে দাঁতে খড়্কে দিচ্ছে—এমন সময় মা আমাকে ইসারা করলেন চিঠিখানা তাকে পড়ে শোনাতে।

আমি চিঠিখানা নিয়ে তার কাছে গিয়ে বল্লাম, "দোবে তোমার দেশ থেকে চিঠি এসেছে।"

দোবে আগ্রহের সঙ্গে বল্লে—"পড়ুন না কি লিখেছে।"

আমি কয়েকবার ঢোঁক গিলে তার কাকার মৃত্যুর সংবাদটা যেই পড়েছি—"গত শুক্রবার রাত্রে তোমার কাকা রঘুবর দোবে মারা গেছে।" অমনি সে দুহাত লাফিয়ে উঠে বল্লে—"শালা মরেছে ভালো হয়েছে। শালা আমার কাছ থেকে অনেক টাকা পেত।"

আমি তো অবাক্। ঘরের ভিতরে মা ভাব্ছেন—এক্ষুনি দোবে চিৎকার ক'রে কান্না জুড়ে দেবে, ও হরি একি!

দোবের খাওয়ার আগে চিঠিখানা পড়লে ও দেখছি আনন্দের চোটে অনেক বেশী ভাত খেত।

ওর কাণ্ড দেখে আমরা তো হেসেই বাঁচি না।

এই সময়ে আমাদের সঙ্গে মাঠে বল্ খেল্তে আসত এক সাহেবের বাচ্চা। খাস্ বিলাতী ছেলে, ফুট্‌ফুটে করছে শাদা রং।

নাম 'ম্যাল্‌কম্‌'। আমাদের পাড়াতেই সে থাক্‌ত তার বাবা মার সঙ্গে।

পাড়ার ছেলেরা তাকে খ্যাপাত white monkey বলে।

এই সুমধুর সম্ভাষণ শুনে সে মাঠে আসা বন্ধ করল।

একদিন তাদের বাড়ীর কাছ দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি 'ম্যাল্‌কম্‌' আমাদের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তার মাকে বল্‌ছে, "Mamma, they say me white monkey". শুনেই আমরা দে ছুট্‌—দে ছুট্‌।

—তেরো—

দাদামশাইয়ের কাছে অনেক মাসিক পত্রিকা আসত। সবগুলিই বড়দের কাগজ'। গৃহস্থ, নারায়ণ, মহিলা, বিজয়া, যমুনা, মানসী ও মর্মবাণী ইত্যাদি কাগজ প্রতিমাসেই আমি নাড়াচাড়া করতাম। কোনো কোনো কাগজে ছবি থাকত। এই ছবিগুলি আমার খুব ভালো লাগত,—বিশেষতঃ রঙিন ছবি থাকলে খুব খুশী হতাম। হরেকৃষ্ণ সাহা প্রভৃতি কয়েকজন শিল্পীর আঁকা দৃশ্য-চিত্রগুলি আমার প্রাণে পুলক জাগাত। একবার একটি কাগজে একটি গ্রাম্য ছবি দেখলাম, সন্ধ্যাবেলা সূর্য ডুবছে, গাছ-পালার আড়াল দিয়ে লাল আকাশ দেখা যাচ্ছে,—আকাশ দিয়ে কতগুলি পাখী উড়ে যাচ্ছে,—ঠিক আমার দেশের গ্রামের ছবি চোখের উপর ভেসে উঠ্‌ল। ঠিক এই রকম দৃশ্যই দেশে দেখেছিলাম।

বড়দের কাগজগুলির লেখাগুলি পড়তে চেষ্টা করি ঠিক বুঝতে পারি না, তবু কবিতাগুলি পড়ি। কালিদাস রায়, কুমুদ মল্লিক প্রভৃতির লেখা কবিতা এই সময়ে আমার নজরে পড়ে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নারীর মূল্য' নামে একটি রচনা, এই সময়ে ছদ্মনামে যমুনায় প্রকাশিত হচ্ছিল। বিজয়ায় 'চাকরের কৃপায় চীনের মুক্তি' নামে একটি বড় গল্প পড়েছিলাম,—খুব ভালো লেগেছিল। পরে শুনলাম ওটি দাদামশাইয়ের লেখা।

চিত্তরঞ্জন দাসের কয়েকটি কবিতা 'নারায়ণ' কাগজে পড়ি,—কিন্তু ঐ বয়সে তার ভাব ধরতে পারতাম না। 'গৃহস্থ' পত্রিকায় একটি মজার ছোট গল্প বেরিয়েছিল,—গল্পটির সব শব্দগুলির প্রথম অক্ষর 'ক' দিয়ে আরম্ভ। যেমন—"কলিকাতার কাছাকাছি কালিঘাটে কমলাকান্ত কর কমলিনীর কর ক্রয় করিলেন।" ইত্যাদি।

এই গল্পটি পড়ে' আমিও 'ব' দিয়ে একটা গল্প লিখতে চেষ্টা করি।

'বারগণ্ডার বরেনবাবু বারান্দায় বসে বেহালা বাজাতে বাজাতে বাক্‌বিতণ্ডা বাধিয়েছেন।' ইত্যাদি।

এই সময়ে হঠাৎ একদিন আমার হাতে একটি ছোটদের পত্রিকা পড়ল। পত্রিকাটির নাম 'দর্শক'। বেশ বড় আকারের লাল মলাটের পত্রিকা, নীচে লেখা ছিল বোধহয়,—সম্পাদক 'জে, এম, বি, ডানক্যান্।'

বুঝ্‌লাম এটি খৃষ্টানদের পত্রিকা। যাই হোক, এই পত্রিকা পেয়ে যেন মেতে উঠ্‌লাম। ছোটদের জন্যেই লেখা গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা,—মুখপত্রে একটি রঙীন ছবিও ছিল বোধ হয়। নীতি উপদেশমূলক গল্পগুলি পড়ে বুঝ্‌তে কষ্ট হয় না,—প্রবন্ধ কবিতাগুলিও বেশ বোধগম্য হয়।

একদিন শ্রাবণ মাসে খুব বৃষ্টি পড়ছে, আমরা খেয়ে-দেয়ে ছাতা নিয়ে তুপুরে স্কুলে রওয়ানা হচ্ছি এমন সময় বাবা তাঁর বালিশের তলা থেকে চারখানা পত্রিকা আমার হাতে দিলেন।

তাকিয়ে দেখি মলাটে চমৎকার রঙীন ছবি আঁকা—উপরে বড় বড় করে' লেখা 'সন্দেশ', নীচে লেখা 'উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী' সম্পাদিত।

আরে এযে কল্পনাই করতে পারি নাই,—সত্যি, খাবার সন্দেশ পেলেও যে এত আনন্দ হোত না। সেই বছরই অর্থাৎ ১৩২০ সালের বৈশাখ থেকেই এই শিশু পত্রিকাটি বার হয়েছে। বাবা আমাকে গ্রাহক করে' দিয়েছেন শ্রাবণ মাসে, তাই বৈশাখ থেকে শ্রাবণ পর্যন্ত চারখানা কাগজ আমার নামে এসেছে,—আবার শুনলাম প্রতি মাসেই আসবে।

স্কুলে পড়াশোনায় মন্ লাগলো না, কখন বাড়ী যাব আর 'সন্দেশ' পড়ব এই চিন্তা।

বাড়ী ফিরে এসে সন্দেশের মধ্যে ডুবে গেলাম। আরে এতো অদ্ভুত বইয়ের কথা তো ধারণাই করতে পারি নাই,—কী সুন্দর

ছবি, গল্প, কবিতা, ধাঁধা, আমায় যেন এক নতুন রাজ্যে নিয়ে গেল।

প্রতি সংখ্যার প্রথমেই রঙীন ছবি আর ভিতরে গল্পের সঙ্গে, কবিতার সঙ্গে সব মজার মজার টুক্‌রো ছবি। প্রতি ছবির ভিতর শিল্পীর নাম U. R. লেখা। ইনি যে উপেন্দ্রকিশোর রায় তা আর বুঝতে দেরী হোলো না,—কারণ তাঁর আঁকা ছবি আগে আরো দেখেছি।

এই 'সন্দেশ' আমার জীবনে একটা রঙীন আনন্দময় যুগ নিয়ে এলো।

বাবা দিদির নামে আর একখানা শিশু পত্রিকা আনাতে লাগলেন 'শিশু।' কিন্তু 'শিশু' 'সন্দেশের' সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কোনো বিষয়েই পারে না—আকারেও কিছু ছোট, আর সময় মত আসত না।

কিন্তু সন্দেশ,—মাসের পয়লা তারিখে আমার হাতে আসবেই। প্রতি মাসের পয়লা তারিখে ডাকের পথ চেয়ে থাক্‌তাম,—আমাদের লোক ভোরবেলা ডাকঘরে গিয়ে চিঠি নিয়ে আসত, যদি পয়লা তারিখে তার হাতে 'সন্দেশ' না দেখতাম, মুখ শুকিয়ে যেত, সমস্ত দিনটাই যেন মাটি হয়ে যেত। তার পরদিন আবার আকুল হয়ে প্রতীক্ষা করতাম, দূর থেকে লক্ষ্য করতাম লোকটির হাতে অন্যান্য চিঠিপত্রের মধ্যে উঁচু হয়ে আছে 'সন্দেশের' বাদামী মোড়ক—আনন্দে প্রাণ নেচে উঠত।

কিন্তু শিশু আসত মাসের অনেক দেরীতে, মধ্যে মধ্যে মাসও পার হয়ে প্রকাশিত হোত।

এই 'শিশুতে' দক্ষিণারঞ্জনের লেখার সঙ্গে, কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের লেখার সঙ্গে পরিচিত হই। হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্তের হাসির কবিতা আমার খুব ভালো লাগত। তাতে মজার মজার ছবি থাকৃত,—শিল্পীর নাম লেখা থাকত P. Ch.

'শিশু' কিন্তু বেশী দিন চলে নাই, বন্ধ হয়ে গেল। দিদির নামে আর কাগজ আসে না কিন্তু আমার সন্দেশ নিয়মিত আসতে লাগল।

আমার সন্দেশ দেখে গিরিডির আরো কয়েকটি বন্ধুও সন্দেশের গ্রাহক হোলো।

একবার লুকিয়ে লুকিয়ে ধাঁধার উত্তর দিলাম,—পরের সংখ্যায় দেখি উত্তরের মধ্যে নাম বেরিয়েছে—সুনির্মলচন্দ্র বসু, প্রভাতচন্দ্র বসু, নিরুপমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমার নামের সঙ্গে আমার আর দুই বন্ধুর নাম দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম। ভেবেছিলাম আমার নাম বেরুলে ওরা আশ্চর্য হয়ে যাবে,—কারণ ওরা দুজনেই 'সন্দেশের' গ্রাহক।

পরে জান্‌লাম—আমরা সবাই আলাদা আলাদা নাম পাঠিয়েছিলাম,—একজন আর একজনকে অবাক্ করে' দেবো বলে।

ধাঁধার উত্তরে নাম বেরিয়েছে, এইবার ইচ্ছা হোলো কয়েকটি লেখা গোপনে পাঠাই।

ভাব্‌লাম যদি একবার একটা লেখা সন্দেশে ছাপা হয় তা হলে আর দেখতে হবে না, গিরিডির বন্ধুবান্ধবেরা এমনকি আত্মীয় স্বজনেরাও একেবারে হাঁ করে' থাক্‌বে।

লুকিয়ে লেখা পাঠালাম। মাসের পর মাস গত হয়,—প্রতি মাসেই আকুল আগ্রহ,—'সন্দেশ' আসে, কত সুন্দর গল্প কবিতার গাদা—কিন্তু হায়, কোথায় সেখানে এই শিশু কবির স্থান। শিশুতেও লেখা পাঠালাম,—লেখা ফেরৎ এলো—মনোনীত হয় নি।

কুছ্ পরোয়া নাই, না ছাপে নাই ছাপলো। নিজেই হাতের লেখা কাগজ বের করব, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ধাঁধা—সবই লিখব, ছবিও আঁকব,—কেউ যদি না-ই পড়ে, নিজেই পড়ব—ছোটুয়াকে শোনাব।

ছোটুয়ার কথা আগেই বলেছি—হাজারীবাগ জেলার লোক,—আমাদের বাড়ীতেই থাকে। সে আমার গুণের সমঝদার,—আমার লেখা কবিতা শোনে আর বলে—

"বা ভাই,—সাবাস্ ভাই,—বহুৎ আচ্ছা ভাই"—আমি আরো উৎসাহে তাকে কবিতা, গল্প শোনাই। তার ধৈর্য অসম্ভব।

আমি মহা-উৎসাহে হাতের লেখা পত্রিকা বার করলাম। তখন এক পয়সায় খাতা পাওয়া যেত। সেই খাতায় আমার পত্রিকা বার হোলো, নাম 'অমৃত'।

মলাটে ছবি আঁক্‌লাম—একটি লোক একটি ভৃঙ্গারের নলে মুখ লাগিয়ে অমৃত খাচ্ছে।

প্রথম সংখ্যায় প্রথম কবিতা লিখ্‌লাম 'বসন্ত,'—

বসন্ত এসেছে ছুলে
দুইখানি হাত তুলে,
তাইত কানন
ভরিল এমন
গন্ধ-পূর্ণ ফুলে। ইত্যাদি।

—চৌদ্দ—

গিরিডিতে সেবার সার্কাস এলো—Bose's circus. সার্কাস কখনো দেখিনি, টিকিট কিনে সার্কাস দেখতে গেলাম।

প্রকাণ্ড তাঁবু পড়েছে, তার মধ্যে খেলা হবে। চারিধারে গোল করে' সব কাঠের বেঞ্চি আঁটা। ভিতরে ঢুকে দেখি বেঞ্চিগুলি লোকে ভরে' গেছে। আমরাও গিয়ে এক জায়গায় বসলাম।

কত রকম রোমাঞ্চকর খেলা আরম্ভ হোলো—সবই মারাত্মক খেলা। খেলোয়াড়েরা একটু অন্যমনস্ক হলে আর রক্ষা নাই। মধ্যে মধ্যে আজগুবি পোষাক পরে সং আসছে, তাদের অদ্ভুত রং ঢং দেখে আমাদের আনন্দের আর শেষ নাই।

এইখানে দেখলাম বাঙালী পালোয়ান বিখ্যাত ভীম ভবানীকে।

তাঁর বুকের উপর বড় বড় পাথর হাতুড়ি দিয়ে ভাঙা হোলো, পাথরের ভারী 'রোলার' টানা হোলো,—আরো দেখলাম লোক বোঝাই একটা গরুর গাড়ী তাঁর বুকের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল।

আর একটি রোমাঞ্চকর খেলা দেখলাম—একটি বাঙালী মেয়ে—নাম বোধ হয় সুশীলাসুন্দরী—খাঁচার মধ্যে ঢুকে একটা প্রকাণ্ড বাঘের সঙ্গে খেলা করল। বাঘের গর্জন শুনে ভয়ে আমাদের যেন দম বন্ধ হয়ে আস্‌ছিল। বহু বছর পর আগ্রার তাজমহল দেখতে গিয়ে ঐ মেয়েটির শিক্ষাদাতার সঙ্গে পরিচয় হোলো। লোকটি বুড়ো হয়েছে, কিন্তু তার হাতে এখনো 'Bose's circus' কথাটা খোদাই করা আছে। তার ফটোও একখানা তুলে এনেছি।

বোধহয় এই সার্কাসে বিখ্যাত যাদুকর গণপতির খেলাও

দেখেছি। একটি কাঠের বাক্সে তাঁকে বন্ধ করে তালা দেওয়া হোলো। আর বাক্সটার চারিধারে একটা মশারি টানানো হোলো। মুহূর্তের মধ্যে দেখা গেল, সেই বাক্সের থেকে বেরিয়ে মশারির ভিতর থেকে গণপতি মুখ বাড়াচ্ছেন, আর দুই হাতে ঘণ্টা বাজাচ্ছেন। আরো অনেক খেলা দেখ্‌লাম।

এর কিছুদিন পরেই এলেন গোবরা পালোয়ান বা গোবর বাবু (যতীন্দ্রনাথ গুহ) আর তাঁর সঙ্গে এলেন বিখ্যাত অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে। তিনি তখনও এতটা খ্যাতির অধিকারী হন্ নাই।

গোবরবাবুর দেহ দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম, কী বিরাট চেহারা তাঁর, আর শুনলাম খাওয়ার শক্তিও তেমনি। তিনি গিরিডির পালোয়ানদের শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান করলেন।

কুস্তি দেখতে সেই আসরে আমরা গেছিলাম। গিরিডির শ্রেষ্ঠ পালোয়ানটিকে তিনি একটি প্যাঁচে ছিট্‌কে ফেলে দিলেন চোখের নিমেষে।

আমরা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠ্‌লাম। সেইখানে আমরা কৃষ্ণচন্দ্রের কয়েকটি গান শুন্‌লাম,—তাঁর হারমোনিয়াম বাজাবার কায়দা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

এই সময় আমরা নিজেরাও কিছু কিছু আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতি করি—সবই কিন্তু গোপনে। কারণ অভিভাবকেরা পড়াশোনা করা ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন না।

ছুটির দিনে মামাবাড়ীর বাইরের বারান্দায় কাপড় টানিয়ে আবেগের সঙ্গে আবৃত্তি করি দাদামশাইয়ের লেখা কবিতা—

"দুষ্ট দুঃশাসন আমি এতদিন পরে—
পাইনু কি আজি তোরে সম্মুখ-সমরে ?
এতদিনে সুপ্রভাত
হইল কি অকস্মাৎ ?

আজি কি সে দিন মম পুরাতে বাসনা—
উত্তপ্ত শোণিতে তোর জুড়াতে রসনা ?" ইত্যাদি

মধ্যে মধ্যে দিদিও আবৃত্তি করতেন ইংরাজী কবিতা—

"Each little flower that opens,
Each little bird that sings,
God made its pretty colours,
God made its tiny wings."

শ্রোতাদের মধ্যে থাকতেন মাসি-মামীর দল, মাকেও নিয়ে আস্‌তাম।

এই আবৃত্তি-অভিনয়ে আমার ভাই ও মামাতো ভাইরাও যোগ দিত। আনন্দ-কোলাহলে ছুটির বিকেলটা কেটে যেত।

মামাদের বাড়ীটা ছিল একটা হুজুকের বাড়ী। প্রায় দিনই একটা না একটা হুজুক লেগেই থাকত।

আজ কীর্তন, কাল কথকতা, পরশু কে একজন ম্যাজিক দেখাবে, তারপর একদিন একজন 'কমিক' করবে। এই নিয়েই আমরা মেতে থাক্‌তাম। এ বাড়ীতে ছিল নিত্য উৎসব।

স্কুল ছুটি হলেই আমরা খবর পেতাম মামাবাড়ীতে আজ কি উৎসব হবে।

এই সময়ে বিখ্যাত প্রকাণ্ড জাহাজ টাইটেনিকের খবর পেলাম। জাহাজ ছাড়বার আগে জাহাজের কাপ্তান বড় গলায় ঘোষণা করেছিলেন—"এই জাহাজ কিছুতেই ডুব্‌তে পারে না। কারুর ক্ষমতা নাই এই আশ্চর্য জাহাজকে ঘায়েল করতে পারে—সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

কিন্তু যেখানে অহঙ্কার সেইখানেই পতন।

জাহাজ সমুদ্রপথে যাত্রা করল ভরা যাত্রী নিয়ে—আর কিছুদূর গিয়েই একটা ভাসন্ত বরফের চাঁইয়ে ঠোক্কর খেয়ে টুপ্‌ করে' ডুবে গেল সমুদ্রের অতল গভীরে।

বাংলা কাগজ 'সঞ্জীবনীতে' এই খবরটা বেশ ফলাও করে' বার হোলো—কোথায় কিভাবে জাহাজ ডুবলো, যাত্রীরা কি রকম অসহায় অবস্থায় সমুদ্রে তলিয়ে গেল, কত শিশু, কত স্ত্রীলোক মারা পড়ল ইত্যাদি।

এই খবরটা পড়ে' আমার শিশু-মনে দারুণ আঘাত লাগ্‌ল। আমার চোখ জলে ভরে' উঠ্‌ল, সমস্ত দিন যেন খেতে পারলাম না। রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম—আমি যেন জাহাজে দেশের দিকে চলেছি—আর হঠাৎ আমার জাহাজটা চড়ায় আটকে গেছে।...জাহাজটা কাৎ হয়ে ডুবে আছে, আমি যেন ডুব্‌তে ডুব্‌তে চড়ার নাগাল পেয়ে তাতে আশ্রয় নিয়েছি। ঘুম ভাঙ্‌তেই বড় আনন্দ হোলো, এ তাহলে স্বপ্ন! একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লাম।

'সন্দেশ' নিয়ে মেতে উঠ্‌লাম। বিজ্ঞাপনের প্রথম পাতা থেকে মলাটের শেষ পাতা পর্যন্ত আকুল আগ্রহে পড়ি। মনে পড়ে মলাটের শেষ পাতায় গন্ধ-দ্রব্য বিক্রেতা 'এইচ, বসুর' ছবিওলা বিজ্ঞাপন। একজন লোক রুমাল নেড়ে বলছে, "বহুৎ আচ্ছা দেল্‌খোস্ হো গিয়া—" কিম্বা একটি ছোট মেয়ে জলে নৌকা ভাসিয়ে যাচ্ছে, উপরে লেখা 'মৃদুমন্দ পবন হিল্লোলে' ইত্যাদি।

আর ভিতরে? সে তো অনির্বচনীয় অমৃতের পরিবেশন ও পরিবেশ। কত নাম করব, অবনীন্দ্রনাথ, প্রিয়ম্বদা দেবী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, কুলদারঞ্জন রায়, সুখলতা রাও,—আরো কত নাম এখনও স্মৃতির গুহায় হীরা-মাণিক্যের মত চক্‌চক্ করছে। আর একজন প্রতি মাসে লিখ্‌তেন 'বনের খবর' ছদ্মনাম দিয়ে, তাতে থাক্‌ত U. Rএর ছবি। কী ভালোই যে লাগ্‌ত। লুসাই পাহাড়ের কাছে বেণী চাকরের লোটা ফেলে ছুট্ দেওয়া, বালটির জলে ঘটি শুদ্ধ বরফ

হয়ে জমে যাওয়া, হাতীর বাচ্চার শুঁড় ধরে টানাটানি—U. Rএর এ সব ছবির কথা এখনও মনে পড়ে, তার সঙ্গে লেখারই কি অপূর্ব ভঙ্গি আমরা উপভোগ করেছি।

সন্দেশের আর একটি প্রবল আকর্ষণ ছিল। কে একজন বেনামে 'সন্দেশে' মজার মজার গল্প কবিতা লিখ্‌তেন। এত সুন্দর লেখা যে কার আমরা বুঝতে পারতাম না। পাগলা দাশু, চালিয়াৎ, যগ্যিদাসের মামা প্রভৃতি অদ্ভুত সুন্দর গল্প আর বোম্বাগড়ের রাজা, দাঁড়ে-দাঁড়ে-দ্রুম, গানের গুঁতো, গোঁফ চুরি, নারদ নারদ, সৎপাত্র, রামগড়ুরের ছানা প্রভৃতি সচিত্র কবিতাগুলি যে কার মাথা থেকে বার হচ্ছে আমরা বন্ধুরা অনেক আলোচনা করে'ও তা স্থির করতে পারতাম না।

একদিন সন্দেশে একটি পাতা জোড়া ছবি বেরুলো। একটি বকের পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আর কতগুলি চড়াইপাখী তাকে ঠাট্টা করছে। তার সঙ্গে একটি অনবদ্য কবিতা—

চড়াইগুলো বল্‌ছে এসে কিচির্‌ মিচির্‌ কিচ্‌চিরি—
অর্থাৎ কিনা তোমার নাকি চেহারাটা বিছ্‌ছিরি,
বল্‌ছে আচ্ছা বলুক, তাতে ওদেরই তো মুখ ব্যথা
ঠ্যাঁটা লোকের শাস্তি যত ওরাই শেষে ভুগ্‌বে তা।
ওরা তোমায় খোঁড়া বল্‌ছে, বে-আদবতো খুব দেখি
তোমার পায়ের বাতের কষ্ট, ওরা সে সব বুঝবে কি।

ছেলেবেলা থেকেই ভালো মিলের কবিতা আমার খুব ভালো লাগত। এই জন্যে রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির লেখা গান আমি খুব পছন্দ করতাম। দ্বিজেন্দ্রলালের গান—

"ভবনদীর পারে এসে বেড়াল বসেছে আহ্নিকে,
বাল্যকালে লক্ষ্মীর মত পক্ষীর মাংস খান্‌নি কে।"

মিলের জন্যে এই লাইন দুটো আমার খুব ভালো লাগত।

সন্দেশের ঐ বেনামী লেখকটি কে জানবার জন্যে প্রাণ আকুল

হয়ে উঠল,—আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কে একজন বল্লে, রবিঠাকুর ঐসব গল্প কবিতা লেখে আমি জানি। কেউ বলে—U. R নামে ঐ আর্টিষ্টেরই ঐ সব লেখা।—সমস্যার আর সমাধান হয় না।

এমন সময় শোনা গেল U. R অর্থাৎ 'সন্দেশ' সম্পাদক উপেন্দ্রবাবু কিছুদিনের জন্যে গিরিডিতে আসছেন বেড়াতে।

সন্দেশের পরিচয় পেয়েছি, প্রতি মাসেই পাচ্ছি, এবার তার সম্পাদককে দেখে চক্ষু সার্থক করব। কি চমৎকার ছবি আঁকেন তিনি—কি করে' আঁকেন তা একবার দেখতে হবে,—আর ঐ মজার গল্প কবিতাগুলির লেখক কে তাও জেনে নিতে হবে।

শুনেছিলাম উপেন্দ্রবাবুর মুখে লম্বা দাড়ী আছে। মনে মনে কল্পনা করেছিলাম তাঁরই আঁকা পরশুরামের ছবির মত তাঁকে দেখ্‌তে হবে। এ ছবিটা আগেই রামায়ণে দেখেছিলাম।

সত্যি একদিন উপেন্দ্রবাবু এলেন বারগণ্ডা অঞ্চলে 'হোম-ভিলাতে' (অমলচন্দ্র হোমের বাড়ী)। তাঁর দাড়ীওলা সুন্দর চেহারা দেখে আমরা ধন্য হলাম।

ছেলের দলে জট্‌লা করি, কি করে' তাঁর সঙ্গে আলাপ করা যায়। ভিলার আশে পাশে ঘুর্‌ঘুর্ করে' ঘুরি—কিন্তু সাহস হয় না তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে—তাঁকে কিছু প্রশ্ন করতে।

সন্ধ্যাবেলা তিনি বাড়ীর বারান্দায় বেহালা বাজাতেন,—রাস্তার থেকে সেই বাজনা শুন্‌তাম।

ভাব্‌তাম—কত গুণী লোক ইনি। কেমন ছবি আঁকেন, কেমন বেহালা বাজান্, আরো কত গুণ!

—পনেরো—

একদিন আমরা কয়েকটি বন্ধু মিলে সাহস করে' উপেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে তাঁর বাড়ী হাজির হলাম।

দরজা বন্ধ ছিল। কড়া নাড়্‌তে আর সাহস হয় না। শেষে একজন এগিয়ে গিয়ে দরজার কড়া নাড়্‌তে লাগ্‌ল।

ভিতর থেকে মোটা গলায় কে জানি সাড়া দিল "কে গো?"—এ যে উপেন্দ্রবাবুর গলা। যেই সাড়া পেলাম,—অমনি আর কথা নাই—যঃ পলায়তি সঃ জীবতি। সবাই মিলে চোঁচা দৌড় লাগালাম পাঁচীল ডিঙিয়ে। আলাপ করবার আর সাহস হোলো না।

একদিন দেখলাম উপেন্দ্রবাবু বিকালে বেড়িয়ে বাড়ী ফিরছেন। আমাদের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দেখা। আর যায় কোথা! সমস্ত স্নায়বিক দৌর্বল্য ঝেড়ে ফেলে—আমরা তাঁকে নমস্কার করলাম, আর সোজা প্রশ্ন করে' বস্‌লাম—"সন্দেশের ঐসব মজার মজার গল্প-কবিতা কার লেখা?"

উপেন্দ্রবাবু আমাদের দিকে তাকিয়ে তাঁর কালো কুচ্‌কুচে দাড়ী নেড়ে বল্লেন, "তা বল্‌ব কেন বাপু।"

ব্যস্ আমরা প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম,—আর কি সেখানে দাঁড়াই?

একদিন আমাদের বন্ধু মুলু (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ছোট ছেলে প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—অল্প বয়সে সাইকেল থেকে পড়ে' আহত হয়ে মারা যায়) আমাদের সমস্ত রহস্যের উদ্ঘাটন করল। সে বল্লে "এ সব লেখা তাতাদার। তাতাদা হচ্ছেন উপেন্দ্রবাবুর বড় ছেলে সুকুমার রায়।"

এইবার সব যেন পরিষ্কার হয়ে গেল। ঐসব লেখার মধ্যে মজার মজার ছবি থাকৃত, তাতে সই থাকৃত—S. Roy; এইবার বুঝ্‌লাম ছবিগুলিও সুকুমারবাবুর আঁকা।

একদিন শুন্‌লাম উপেন্দ্রবাবু একটা উন্মুক্ত স্থানে গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দেবেন।

উক্ত দিনে আমরা সবাই জড় হলাম নির্দিষ্ট স্থানে। দেখলাম গিরিডির বহু বিশিষ্ট লোক সেখানে উপস্থিত। কিন্তু সেদিন আর বক্তৃতা হোলো না—কারণ সেদিন সন্ধ্যার সময় আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে তো আর গ্রহ নক্ষত্র দেখানো যায় না।

তাই বক্তৃতার ব্যবস্থা হোলো অন্য আর একদিন,—এবং সেদিনও আমরা সেখানে হাজির হলাম।

আজ আকাশ মেঘমুক্ত। উপেন্দ্রবাবু আকাশের দিকে আঙুল তুলে তুলে আমাদের কাছে গ্রহ-নক্ষত্রের পরিচয় দিতে লাগলেন। ভারি সরস বক্তৃতা। কোনটা কালপুরুষ, কোনটা সপ্তর্ষি-মণ্ডল, এসব আমাদের চিনিয়ে দিলেন। বক্তৃতার মধ্যে আমাদের একটি বন্ধু কি যেন একটা মন্তব্য করেছিল। তাতে বিরক্ত হয়ে তিনি বল্লেন "ছ্যাখো ছোক্‌রা—ভদ্রতা শিখে তারপর সভাসমিতিতে যোগ দিও। তোমাদের মত বয়স আমাদেরও ছিল, কিন্তু আমরা এরকম বেহায়া ছিলাম না।"

উপেন্দ্রবাবুর এই উক্তিতে আমি যেন লজ্জায় মরে গেলাম। ছিঃ ছিঃ, সন্দেশ-সম্পাদককে এইভাবে চটানো আমার বন্ধুটির উচিত কাজ হয় নাই। এই লজ্জাটা যেন আমার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে' আমাকে সঙ্কুচিত করতে লাগ্‌ল।

স্থানীয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে রবিবার বিকালের দিকে ছেলেমেয়েদের জন্যে নীতি-বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল।

এখানে উপেন্দ্রবাবু আস্‌তেন, বেহালা বাজাতেন, আর নীতিমূলক গল্প করতেন।

মহাসুযোগ উপস্থিত। আমরা কয়েকজন মিলে ঐ স্কুলে যেতে আরম্ভ করলাম।

উপেন্দ্রবাবু বেহালা বাজিয়ে ছেলেমেয়েদের গান শেখাতেন—

"সকলের প্রভু তুমি
রাজা তুমি জগতের,
কে বুঝে মহিমা তব
হে মহান্ মহতের।" ইত্যাদি।

—ষোলো—

একদিন দিদির পুতুলের সঙ্গে দিদির এক বন্ধুর পুতুলের বিয়ে হোলো খুব ধুমধামের সঙ্গে। দিদির নাম অমিয়া, তাঁর বন্ধুর নামও অমিয়া। আমাদের বাড়ীতেই বিয়ে হোলো, কারণ দিদির পুতুল ছিল মেয়ে। এই উপলক্ষ্যে মা দিদির অনেক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে' ভুরিভোজন করিয়েছিলেন। সে এক ইলাহি ব্যাপার।

মনে পড়ে আমি মেয়ে-জামাইকে নানা উপহার দিয়েছিলাম হাতে তৈরি করে'। ন্যাকড়া ছিঁড়ে ছিঁড়ে মেয়ের সাড়ী তৈরি করেছিলাম আর তাতে লাগিয়েছিলাম নানা কালীর ছোপ,—পাড়ও করেছিলাম নানা রং দিয়ে। জামাইকেও দিয়েছিলাম ছোট লাঠি, ছাতি ইত্যাদি হাতে বানানো। শুধু তাই নয়, বিয়ের সময়ে,—ভাঙা-হাড়ির কানায় আঠা দিয়ে কাগজ আটকে,—ঢোল তৈরি করে' তাই বাজিয়েছিলাম মনের সাধে।

এ বিষয়ে আমার উৎসাহ কম ছিল না।

দিদির কাছে 'শিশু' পত্রিকা আসে, কিন্তু সন্দেশের মত নিয়মিত নয়।

তাতে পড়ি দক্ষিণারঞ্জনের লেখা ক্রমশঃ-প্রকাশ্য গল্প 'ছাঁদন দড়ি, গদা বাড়ি'—হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্তের লেখায় আনন্দ পাই।

> 'ধুম্রলোচন নামে এক
> অসুর বলবান্
> হাজার বছর করেছিল
> মহাদেবের ধ্যান।'

ইত্যাদি কবিতা পড়ে মেতে উঠি।

একটি রঙীন ছবিতে ছিল একজন ডাকাত একটি ছেলেকে ধরে' নিয়ে যাচ্ছে আর তার ছোট ভাই বলছে—

"কিসের ভয় করছ দাদা
থাকো তুমি স্থির—
দেখছি আমি ডাকাত ব্যাটা
কত বড় বীর।"

ছোট ভাইয়ের বীরত্বের কথা শুনে আমাদের মনেও বীরত্ব জাগত।

শিশুর যাঁরা ছবি আঁকতেন তাদের মধ্যে নরেন সরকার, P. Ch. প্রভৃতির নাম মনে পড়ে। আর ছবির ব্লক যিনি তৈরি করতেন, তার নাম ছবির নীচে লেখা থাকত K. V. Seyne.

এই সব এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে—আর সব কথা স্মৃতিপটে আব্‌ছা হয়ে গেছে।

একবার সরস্বতী সম্বন্ধে দক্ষিণাবাবুর একটি প্রকাণ্ড কবিতা শিশুতে বার হোলো—সঙ্গে সরস্বতীর একটি রঙীন ছবি।

দক্ষিণাবাবুর লেখার সঙ্গে পরিচিত হবার পর আমরা তাঁর লেখা 'ঠাকুরমার ঝুলি' হাতে পেলাম।

লাল নীল কালিতে ছাপা রূপকথা। প্রায় প্রতিপাতায় ছবি, কয়েকটি রঙীন ছবিও ছিল। পরে জানলাম ঐ ছবিগুলি দক্ষিণাবাবুর নিজের হাতে আঁকা।

এখনো মনে পড়ে—

"দুধবরণ, দুধবরণ, ক অং কং—।"

এই ছড়াটি প্রায়ই আওড়াতাম।

একদিন দাদামশাই একটা কবিতা লিখে আমার কাছে দিয়ে বল্লেন—"যা এই লেখাটা সন্দেশের জন্যে উপেন্দ্রবাবুকে দিয়ে আয়।"

আমার তো ভারি আনন্দ, উপেন্দ্রবাবুর কাছে নিজে যাব, তিনিও আমার পরিচয় পাবেন যে, আমি অমুকের নাতি। তিনি আমার পরিচয় জানতে না চাইলেও নিজেই আমার পরিচয় দেব।

কবিতাটি বাড়ীতে নিয়ে এলাম, কবিতাটির নাম 'বিড়ালীর বৃন্দাবন যাত্রা।' কিন্তু নীচে লেখকের নাম লেখা 'পাহাড়িয়া পাখী।'

এই নামটি আমার পছন্দ হোলো না, সেটা কেটে নীচে লিখ্‌লাম শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। তারপর উপেন্দ্রবাবুর হাতে দিয়ে পালিয়ে এলাম।

পরের মাসে দেখি উপেন্দ্রবাবুর আঁকা কয়েকটি ছোট ছবির সঙ্গে দাদামশাইয়ের কবিতাটি সন্দেশে বেরিয়েছে—আর নীচে লেখকের নাম ছাপা হয়েছে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

আমার আর আনন্দের শেষ নাই। বই হাতে ছুট্‌লাম দাদামশাইয়ের কাছে। তিনি কবিতাটি দেখে গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলেন—"আমার আসল নাম কে দিয়েছে, তুই বুঝি ?"

আমি গর্বের সঙ্গে স্বীকার করলাম—"ঐ পাহাড়িয়া পাখী কেটে আমি তোমার আসল নামটা দিয়ে দিয়েছি।"

দাদামশাই বল্লেন—"তোর যা বোকার মত বুদ্ধি, নিজের নামে আবার কেউ 'শ্রীযুক্ত' লেখে নাকি! দেখিস্ এতে আমার নিন্দা রটবে।"

পরে সত্যি দেখি কোন কাগজে সমালোচনা হয়েছে—'মনোরঞ্জন বাবুর কবিতাটি উচ্চশ্রেণীর, কিন্তু নিজের নামে কেন যে তিনি শ্রীযুক্ত ব্যবহার করিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না।'

সমালোচনাটি দাদামশাই আমাকে দেখালেন। আমিত অপ্রস্তুত। ভালো করতে গিয়ে মন্দ হোলো।

উপেন্দ্রবাবুর বাড়ীর একটি ছেলের সঙ্গে আমাদের আলাপ হোলো। ছেলেটি আমাদেরই বয়সী। সম্পর্কে তাঁর নাতি।

সে এসে আমাদের খবর দিত উপেন্দ্রবাবু আজ কি ছবি এঁকেছেন, কি গল্প লিখেছেন, কি ধাঁধা বানিয়েছেন ইত্যাদি।

আমরা পরম কৌতূহলে তাঁর প্রতিটি কাজের হিসাব নেই আর জেনে অসীম আনন্দ পাই।

একদিন সেই ছেলেটি বল্লে—"দাদু আজ কতকগুলো বুনো ফুল তুলে এনে তার ছবি আঁকছেন সন্দেশের জন্যে।"

সন্দেশে বুনো ফুলের রঙীন ছবি বেরুবে—আমার ঠিক পছন্দ হোলো না। সন্দেশের মুখপাতে কত সুন্দর সুন্দর মন-মাতানো ছবি বেরোয়, সেখানে গিরিডির শালবনের ছোট ছোট তুচ্ছ বুনো ঘেসোফুলের ছবি কি মানাবে? এই চিন্তায় আমি অস্থির হয়ে উঠলাম, কাগজের মালিক যেন আমি। উপেন্দ্র বাবুর উপর আমার ভয়ানক রাগ হোলো।

একদিন সন্দেশের প্রথম পাতায় সত্যি কতগুলো বুনো ফুলের রঙীন ছবি বেরুলো। নীচে লেখা—'এই ফুলগুলি অনেক গুণ বড় করে' আঁকা হয়েছে।'

ছবি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। সত্যি, বুনোফুল কি দেখতে এত সুন্দর! লাল, নীল, সবুজ, হলদে, বেগুনী কত রকম রং তাদের। কী সুন্দর এঁকেছেন উপেন্দ্রবাবু।

সেইদিনই বিকালে চল্লাম শালের জঙ্গলে বুনোফুলের সন্ধানে।

ছোট ছোট বুনো ঘেসোফুল অনেক দেখলাম আর ছিঁড়ে বাড়ীতে নিয়ে এলাম। সন্দেশের সঙ্গে মিলাতে লাগলাম ছবির সঙ্গে কোন্ কোন্ ফুল মেলে।

দেখলাম আসল ফুলের চেয়ে ছবির ফুলগুলো দেখতে অনেক ভালো।

উপেন্দ্রবাবুর ভাই কুলদারঞ্জন রায় গিরিডিতে এলেন। তিনি খুব ভালো ক্রিকেট খেল্‌তে পারতেন, মাছ ধরতেও ওস্তাদ—আবার ছবি আঁকতে, গল্প লেখাতেও খুব পটু।

বাবার সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। সন্দেশে সে সময় তাঁর লেখা গল্প বের হচ্ছিল 'ঝান্নু চোর চান্নু।' লেখাতে তাঁর

কোনো নাম থাকত না, কিন্তু পরে আমরা জেনেছিলাম ওটা কুলদাবাবুর লেখা।

বাবার কাছে একটা মোটা ইংরাজী বই ছিল—'রবীন হুড্।'

কুলদাবাবু একদিন বইটার অনুবাদ করবেন বলে চেয়ে নিয়ে গেলেন।

কিছুদিন পরেই সন্দেশে কুলদাবাবুর লেখা 'রবিন হুড্' মাসে মাসে বের হতে লাগলো, সঙ্গে বিখ্যাত শিল্পী পি, ঘোষের আঁকা একরঙা ছবি।

একটা ছবির কথা মনে আছে। রবীন হুডের তীর ছোঁড়া দেখে কে একজন তারিফ করে' বল্‌ছে—"কেয়া তোফা বাচ্চা তীরন্দাজ রে।"

এই 'রবিন হুড্' পরে বই হয়ে বার হয় এবং কুলদাবাবু নিজে বাবাকে একখণ্ড বই উপহার দিয়ে যান।

আমাদের স্কুলের মাষ্টার বামনদাসবাবুর দাদা ছিলেন কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার। তিনি অন্ধ ছিলেন। এই 'সন্দেশে' বিজয় বাবুর কবিতা আমরা অনেক পড়েছি। মিলের উপর তাঁর আশ্চর্য দখল ছিল। তিন অক্ষরে, চার অক্ষরে মিল দেওয়া সরস কবিতা তিনি প্রায়ই সন্দেশে লিখতেন। আমার বড় ভালো লাগত।

একবার সন্দেশে একটি কবিতা বার হোলো—'ইল্‌শে গুঁড়ি', লেখক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, আর তার সঙ্গে একটি পাতাজোড়া একরঙা ছবি উপেন্দ্রবাবুর আঁকা।

সত্যেন্দ্রবাবুর লেখার সঙ্গে সেই আমার ভালো করে' প্রথম পরিচয়। এত সুন্দর কবিতা আগে আর পড়েছি বলে মনে হোলো না।

"ইল্‌শে গুঁড়ি ইল্‌শে গুঁড়ি
ইলিশ মাছের ডিম,

ইল্‌শে গুঁড়ি ফুলের কুঁড়ি
রোদ্দুরে রিম্‌ঝিম্‌।”

কী অপূর্ব লাইন। উপেন্দ্রবাবুর আঁকা সেই ছবিটির নীচে লেখা—

“ঢাক্‌লো মেঘের খুঞ্চিপোষে
তাল-পাটালীর থাল।

ছবিও যে এত সুন্দর হতে পারে তার ধারণা করা যায় না। ধন্য উপেন্দ্রকিশোর, ধন্য সত্যেন্দ্রনাথ, তোমাদের জয় হোক, তোমরা চিরজীবী হও। শিশুদের তোমরা কত আনন্দ দিচ্ছ।

‘শিশু’ পত্রিকা অনিয়মিত হতে হতে ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ‘সন্দেশ’ পরিপূর্ণ মহিমায় প্রতি মাসের ঠিক পয়েলা তারিখে আস্‌তে লাগ্‌ল।

কিছুদিন গিরিডিতে থেকে উপেন্দ্রবাবু কল্‌কাতায় চলে গেলেন। আমরা তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ‘হোম-ভিলার’ জানালার আশে-পাশে ঘুরে উপেন্দ্রবাবুর আঁকা বাতিল করা ছবির কিছু ছেঁড়াখোঁড়া টুক্‌রো পাওয়া যায় কিনা তার খোঁজ করতাম।

একদিন রাস্তার ধারে এক টুক্‌রো রং-করা কাগজ কুড়িয়ে পেলাম।

এটা নিশ্চয়ই উপেন্দ্রবাবুর আঁকা সন্দেশের কোনো ছবির অংশ হবে। মহা আনন্দে একটা অমূল্য সম্পদের মত সেই টুক্‌রোটাকে বাড়ী নিয়ে আমার ঘরে টানিয়ে রাখলাম।

বাড়ীতে যাঁরা বেড়াতে আসেন পরম আগ্রহের সঙ্গে সেই ছবির টুক্‌রোটা দেখাই, উৎসাহের সঙ্গে বলি—উপেন্দ্রবাবুর আঁকা।

কেউ তেমন ভ্রূক্ষেপ করেন না, বিশেষ কোনই মূল্য দেন না।

আমার বড় দুঃখ হয়। এমন গুরুতর ব্যাপারটাকে কেউ আমোল দিতে চান্‌ না কেন? এ যে আমার কাছে একটা দুর্লভ সংগ্রহ।

প্রতি বছর সন্দেশের প্রচ্ছদপটে নতুন নতুন ছবি দেখি।

একটি ময়রা বুড়ো সন্দেশ বেচছে, দোকানের কাছে দলে দলে ছেলেমেয়ে জুটেছে।

আর এক বছরের মলাটে দেখি একটি ছেলে আর মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মুখে সন্দেশ ভর্তি, গালগুলো ফুলে আছে, সাম্‌নে সন্দেশের থালা।

কী সুন্দর, কী সুন্দর। ঠিক আমাদের মনের মত জিনিষ আমরা পাচ্ছি।

আমার জ্যাঠ্‌তুতো বোনের বিয়েতে আবার আমরা ঢাকা চল্লাম, সেটা বোধহয় বৈশাখ মাস।

ঢাকায় গিয়ে বিয়ের আনন্দে মেতে আছি, এমন সময় ঢাকার পিওন আমার নতুন বছরের সন্দেশ সেখানে ভিঃ পিঃ তে নিয়ে এলো। গিরিডি থেকে কে যেন ঠিকানা বদ্‌লে ঢাকার ঠিকানায় পাঠিয়েছে।

বাবা আবার সেটা গিরিডির ঠিকানায় ফেরৎ পাঠালেন।

হাতে পেয়েও সন্দেশ ফেরৎ গেল, আমার মনের অবস্থাটা শোচনীয় হয়ে উঠল। বিয়ের উৎসবটা যেন নিস্প্রভ, ম্লান হয়ে গেল। ভাবলাম—এক ছুটে গিরিডি চলে যাই আর নতুন বছরের সন্দেশের নতুন মলাটটা দেখি।

জ্যাঠতুতো দিদির বিয়ের পর আবার আমরা ঢাকা থেকে গিরিডি ফিরলাম। দেখলাম সন্দেশের ভিঃ পিঃ আবার গিরিডিতে এসেছে—এবং বাবাও যথা সময়ে তা ছাড়িয়েছেন।

এই 'সন্দেশ'ই আমার চোখ ফোটালো, আমাকে সাহিত্যের প্রেরণা দিল, নতুন পথের সন্ধান দিল।

যাঁদের লেখা সেই বয়সে পড়েছি, তাঁদের আর ভুল্‌তে পারি নি, তাঁদের চোখে দেখলে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছি, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে আকুল হয়ে উঠেছি। মনে পড়ে সেই সব কবিতা—

"বিজন বনে কুসুম কত বিফলে বাস ছড়ায়ে যায়—
নীরবে আহা ঝরিয়া পড়ে কেহ ত ক্ষতি মানে না তায়

অথবা

"কাজ ভুলানো দুলাল আমার
বস্‌লো এসে কোলটি জুড়ে ;

এটি বোধহয় প্রিয়ম্বদা দেবীর লেখা। সত্যেন্দ্রনাথের নতুন ছন্দের কবিতা সন্দেশে পড়লাম—

"ঝড় রুষিয়ে
ধায় ঢুঁসিয়ে,
ফোঁস্ ফুঁসিয়ে
খুব হুঁশিয়ার।"

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের মজার সন্দেশ ভাগের কবিতা—

"একটি হাতে তিনটি আছে আর এক হাতে ছয়,
যোগ করিয়া খাই যদি তো নয়টি শুধু হয়।
বিয়োগ যদি করি মোটে তিনটি যাবে পাওয়া ;
ভাগ করিলে দুইয়ের বেশী যাবে নাকো খাওয়া।
এবার থেকে গুণ করিয়া সবার আগে খাব—
গুণের ফলে এবার আমি সবার বেশী পাব।
একটু মাথা ঘামিয়ে যদি আঠারোটি পাই
বোকার মত কেন তবে অল্প খেতে যাই।"

কেমন মজার কবিতা—সোজা হিসাব। আমি এই কবিতার ভাব নিয়ে একটা রসগোল্লার ভাগ লিখেছিলাম, সেটা এখন আর মনে নাই।

কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'রাঙাচুরি',' 'বাজের জন্মকথা' প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর কবিতা সন্দেশে পড়েছিলাম। 'রাঙাচুড়ি' কবিতার প্রথম কয়েক লাইন মনে আছে—

"জনক আসিল বাড়ী এনে দিল রাঙাচুড়ি
পূজা দিনে মেয়েটিরে তার,
পরি তাই দুটি হাতে সে আজ পুলকে মাতে
দেখায়ে বেড়ায় দ্বারে দ্বার।"

'বাজের জন্মকথা'র শেষের কয়েকটি লাইন মনে আছে—

"দধীচি তাই হেলায় যবে দিলেন তনু অকাতরে
অস্থিতে তার হোলো ভীষণ বাজ,
সেই বাজেতে পরম পাপী দৈত্যদানব গেল মরে,
স্বর্গ ফিরে পেলেন দেবরাজ।"

প্রায় প্রতি মাসেই সুকুমার রায়ের বেনামা সচিত্র কবিতা বেরুত। আমরা ঠিক বুঝ্‌তে পারতাম লেখাটি কার। "খাই খাই" কবিতা পড়ে নেচে উঠি—

"জল খায়, ফল খায়, খায় যত পানীয়,
জ্যাঠা ছেলে বিড়ি খায়, কান ধরে' টানিও।
টোল্ খায় ঘটি-বাটি, দোল খায় খোকারা,
ঘাবড়িয়ে ঘোল খায় পদে পদে বোকারা।"

এসব কবিতার কি তুলনা হয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাও কিছু কিছু সন্দেশে পড়েছি—অবশ্য অনেক পরে।

সন্দেশের প্রথম পাতার রঙীন ছবিগুলির তুলনা মেলা ভার। এত সুন্দর মন-মাতানো বিভিন্ন বিষয়ের ছবি আজও বেশী চোখে পড়ে না।

—সতেরো—

আর একটা ভারী মজার আকর্ষণীয় জিনিষ হোত। প্রতি বছর শারদীয়া পূজার পর কোজাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় বারগণ্ডার তরুণেরা পূর্ণিমা-সম্মেলন করত। সে সময়ে কলকাতা থেকে বহু বিশিষ্ট-লোক গিরিডিতে হাওয়া বদ্‌লাতে যেতেন। এই সম্মেলনে তাঁদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হোত,—তাঁদের মধ্যে আবার অনেক গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিও এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন।

খোলা যায়গায় পর্দা টানিয়ে মঞ্চ তৈরি করা হোত। সন্ধ্যার আগেই আমরা সবাই ভীড় করে' জুটতাম,—কী আনন্দই যে হোত তা আর কী বলব।

দু একবার এই আসরে যোগীন্দ্রনাথ সরকার, শশীবাবু, এইচ বসু প্রভৃতিকে যোগদান করতে দেখেছি। তাঁরা মঞ্চে উঠে ছেলে-মানুষের মত ধেই ধেই করে' নেচেছেন,—আমরা হেসে গড়াগড়ি দিয়েছি।

বিখ্যাত লেখক কুলদারঞ্জন রায় হাতে মুখে কালী মেখে অদ্ভুত পোষাক পরে' হাতে একটা চোঙা বাঁশি নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে' নেচে নেচে গান ধরতেন—

"আমি বাজিকরের ছেলে,
থাকি খালে বিলে,
আমার ঢোল নিয়েছে চিলে
আমি শানাইটা বাজাইয়া যাই,"

এই বলেই তিনি 'পোঁ' করে তাঁর বাঁশিটা বাজাতেন আবার গান ধরতেন—

"আমি শানাই বাজাই ভালো,
আমার রংটা একটু কালো,
এই কালোর গুণে জগৎ আলো,
যেন অঙ্গারের গোঁসাই।"

আবার 'পোঁ' করে' বাঁশি বাজাতেন।

ছেলে বুড়ো সবাই এই আনন্দে যোগদান করত—এই আসরের প্রতিটি আবৃত্তি, গান, অভিনয় সবাই মনে প্রাণে উপভোগ করত।

নবাগত কেউ কেউ স্বেচ্ছায় জুটে যেতেন। এই অনুষ্ঠানে কেউ বাজাতেন বাজনা, কেউ করতেন গান, কেউ বা কমিক দেখাতেন—তাতে এই পূর্ণিমা-সম্মেলন আরো জোড়দার হয়ে উঠত।

একবার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপকুমার রায় গিরিডিতে এলেন। তখন তিনি তরুণ যুবক। তাঁকে 'পূর্ণিমা-সম্মেলনে' গান গাইতে অনুরোধ করা হোলো। তিনি দুখানা গান ধরলেন—

"একবার গাল-ভরা মা ডাকে",—আর 'চা' খাওয়া সম্বন্ধে একটা হাসির গান।

একদিন দুই ভাই মুলু আর তার দাদা অশোক চট্টোপাধ্যায় (রামানন্দ বাবুর দুই ছেলে) এই সম্মেলনে, সুকুমার রায়ের লেখা এই গানটি করলেন—

—"কেন কেন রে কেন কেন-
মিছে চেঁচিয়ে কাঁচা ঘুম ভাঙ্‌লি কেন।
বিটকেল শব্দ অট্টরোল,
শঙ্খ ঘণ্টা ঢক্ক ঢোল,
স্বর্গপুরী হদ্দ হইল বাদ্যভাণ্ড হট্টগোল।
দেবতা বিল্‌কুল কান্দে গো,
তল্পী তপ্পা বান্ধে গো,
পাগ্‌লা রাহু একলা তেড়ে গিল্‌তে আসে চান্দে গো।"

এই গানটির অনুসরণে আমি একটি গান লিখেছিলাম।

আমার ছোট দুই বোন্ রেণু-বুবুকে নিয়ে মা কোথায় জানি ট্রেণে করে' যাবেন,—তাই সুজির পায়েস রাঁধছিলেন,—ছোট মেয়ে রেণু-বুবু কান্নাকাটি করছিল।

আমি লিখলাম—

রেণু-বুবু কান্দে গো—
(মা) তপ্পী-তপ্পা বান্ধে গো,
ট্রেণের ভিতর খাবে বলে
সুজির পায়েস রান্ধে গো।

সারাটি বছর এই পূর্ণিমা-সম্মেলনের আশায় আমরা দিন গুন্‌তাম।

একবার শুন্‌লাম বারগণ্ডার ছেলেরা রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটি অভিনয় করছে। তার মধ্যে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র অভিনয় করবেন—রবীন্দ্র-শিষ্য অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়।

সেই অভিনয় দেখে অভিভূত হলাম। বৈরাগী-বেশী অজিত বাবুর মিষ্টি গলার গানগুলি যেন এখনো কানে বাজছে—

"গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে"

কিম্বা

"আগুন আমার ভাই আমি
তোমারি জয় গাই।"

প্রতিটি চরিত্রই সু-অভিনীত হয়েছিল। প্রতাপাদিত্যের অংশে নেমেছিলেন অমলচন্দ্র হোম, উদয়াদিত্যের ভূমিকায় শচীন্দ্রনাথ সরকার (যোগীন্দ্রনাথের বড় ছেলে) ইত্যাদি। এতে দুই তিনটি মেয়ে চরিত্র ছিল। ছেলেরাই গোঁফ কামিয়ে এই মেয়ে সেজে চমৎকার অভিনয় করেছিল।

বাস্তবিক এত সুন্দর অভিনয় পূর্বে আর দেখি নাই।

এই সময়ে একদিন হঠাৎ শুন্‌লাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

সে বয়সে নোবেল পুরস্কারটা যে কি তা বুঝতাম না, তবে

শুন্‌লাম রবীন্দ্রনাথকে মস্ত সম্মান দিয়ে বিদেশে অনেক টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

এই পুরস্কার নাকি সারা পৃথিবীতে অল্প লোকের ভাগ্যেই জুটে থাকে—আর ভারতবর্ষে এর আগে কেউ এই পুরস্কার পান নাই।

শুনলাম রবীন্দ্রনাথ পুরস্কার পেয়েছেন এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। বাস্‌রে সে কত টাকা! কে একজন বল্লে 'এক গরুর গাড়ী বোঝাই টাকা।'

যাই হোক্, রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা লেখার জন্যে খুব বড় একটা সম্মান পেয়েছেন, তা বুঝলাম। আর এতে সমস্ত বাঙালী সমাজই যে খুশি হয়েছে তাও নানাভাবে টের পেলাম। গিরিডিতেও বাঙালীদের মধ্যে একটা সাড়া জাগল। বোধহয় ব্রাহ্ম-সমাজে এই জন্যে একটা সভাই হলো।

এই উপলক্ষে আমিও গোপনে একটা কবিতা লিখলাম 'গদ্য ও পদ্য'। কবিতাটি হচ্ছে—

গদ্য বলে পদ্যে ডাকি
ফুলায়ে তার বক্ষ—
—পৃথিবীতে কেহই নহে
আমার সমকক্ষ।
বঙ্কিমাদি মনীষিগণ
আমার তরেই ধন্য,
বিদ্যাসাগর মরেও অমর
কেবল আমার জন্য।
আমার দাপে বিশ্ব কাঁপে,
এমনি আমার শক্তি,
ওরে অধম পদ্য মূঢ়,
কররে আমায় ভক্তি;

পদ্য বলে—মিথ্যা কেন
করছ তিরস্কার,
আমার তরেই রবিবাবুর
নোবেল পুরস্কার।

এই কবিতাটি আমি গোপনেই রেখেছিলাম। তারপর আমার সম্পাদিত একটি হাতের লেখা কাগজে বার করি।

এর একটা কারণ আছে। আমাদের পাড়ায় আমার প্রতিযোগী আর একটি হাতের লেখা কাগজ ছিল,—তাতে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল 'পদ্য বড় না গদ্য বড়।'

এই প্রবন্ধে লেখক মশাই গদ্যকে নানা ভাবে বড় করে' কবিতাকে হীন প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছিলেন।

তার উত্তরস্বরূপ আমার কাগজে আমি এই কবিতাটি প্রকাশ করি। কবিতাটি আমার বন্ধুমহলে খুব প্রচার লাভ করেছিল এবং একজন দরদীবন্ধু বলেছিল, এটিকে 'প্রবাসী'তে পাঠালে প্রথম পৃষ্ঠায় ছেপে দেবে।

বন্ধুর কথায় উৎসাহিত হয়ে আমি কবিতাটি প্রবাসীতে পাঠিয়ে দিলাম,—কিন্তু প্রথম পৃষ্ঠায় কেন, প্রবাসীর শেষ পৃষ্ঠাতেও কোনো দিন ছাপা হয় নাই।

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের লেখা 'রংচং' নামে একখানা কবিতার বই এই সময়ে আমাদের হাতে এলো।

বইখানা বড় সুন্দর, ছবিগুলিও চমৎকার। পড়্‌তে পড়্‌তে মুখস্থ হয়ে গেল। শারদীয়া পূজা সম্বন্ধে লেখা এই অপূর্ব বইখানা আমাদের বড়ই ভালো লাগত।

আমাদের বাড়ীর সামনে কতগুলি শিউলী গাছ ছিল। ঠিক পুজোর সময় সেগুলি ফুলে ফুলে ভরে' যেত। সকালে উঠে দেখতাম লাল্‌-বোঁটাওলা শাদা শাদা ফুলে শিউলীতলা ছেয়ে

গেছে। দিদি আর আমি ছুটতাম শিউলীতলায়—মুখে রংচংয়ের কবিতা আওড়াতে আওড়াতে—

"শিউলীতলা ছেয়ে পড়ে শিউলী ফুলের রাশ।" আর দুহাতে সেই সুগন্ধ ফুলগুলি জড় করতাম বড় আনন্দের সঙ্গে।

আমাদের নিজস্ব একটি ছোট বাগান ছিল। একদিন একটা ইংরাজী বইতে দেখি একটি ছেলে তার বাগানে ঘাসের চাপ্ড়া লাগিয়ে নিজের নাম লিখেছে—George Washington.

তাই দেখে আমি আর দিদি ঘাসের চাপড়া বসিয়ে বাগানে লিখলাম, A.B., S.B.

প্রতিটি কাজেই কী আনন্দ।

—আঠারো—

আরম্ভ হোলো প্রথম মহাযুদ্ধ। শুন্‌লাম জার্মানদের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ বেধেছে। যুদ্ধটা যে কী জিনিষ কিছু কিছু ধারণা হয়েছিল বাবার কেনা কয়েকখণ্ড ইংরাজী বইয়ের ছবি দেখে। রুশদের সঙ্গে জাপানীদের যে যুদ্ধ হয়েছিল, সেই বৃত্তান্ত লেখা মোটা মোটা খণ্ডের বই,—অজস্র ছবি দেওয়া, আমাদের বাড়ীতে ছিল।

তাতে সব যুদ্ধের ছবি দেখেছিলাম। কিরকম করে' কামান দেগে জনপদ উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, কিরকম করে' সৈন্যেরা মরিয়া হয়ে শত্রুদলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে ইত্যাদি।

যুদ্ধটা আমি মোটেই পছন্দ করতাম না। খুন, জখম, হত্যার কথা শুন্‌লে আমি শিউরে উঠ্‌তাম। যুদ্ধে যে যত প্রাণ হত্যা করতে পারবে, যে যত নিষ্ঠুর হতে পারে—সে নাকি ততবড় বীর। এ জিনিষটা আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না।

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হোলো,—খবরের কাগজে ফলাও করে' সে সংবাদ প্রচারিত হতে লাগ্‌ল ছবি দিয়ে।

বৃটিশভক্ত ভারতবাসীরা দলে দলে এই যুদ্ধে বৃটিশের পক্ষে যোগদান করতে লাগল। বাংলাদেশ থেকে 'বাঙালী পল্টন' গঠিত হোলো—বাঙালী ছেলেরা যুদ্ধে মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি জায়গায় যেতে লাগ্‌ল।

গিরিডি থেকে একদল বাঙালী যুবক এই দলে নাম লেখাল।

আমি এই যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি প্রকাণ্ড কবিতা লিখলাম। তার কয়েটি লাইন মাত্র মনে আছে—

হাহাকার রব আজি কোথা হতে
উঠিল হে মাতঃ তোমার বক্ষে—
কাটাকাটি আহা ভীষণ কাণ্ড—
দেখিতেছি মাতঃ আপন চক্ষে।

কেমনে সহ্য করিয়া রয়েছ
দেখিছ যদি মা এদের দ্বন্দ্ব,
এমন ভীষণ বৃটিশ যুদ্ধ
থামাও, থামাও কর মা বন্ধ।—

সকাল বেলা আমরা বাইরের ঘরে বসে লেখা-পড়া করতাম,—পণ্ডিতমশাই আমাদের পড়াতে আসতেন।

আমাদের বাড়ীতে ইংরাজী খবরের কাগজ আসত,—পণ্ডিত মশাই সেই কাগজখানা নিয়ে যুদ্ধের খবর দেখতেন। তিনি ভালো ইংরাজী জানতেন না,—কোনো শক্ত শব্দ পেলেই আমাদের জিজ্ঞাসা করতেন, আর আমাদের বিদ্যেয় না কুলালে—অভিধান দেখ্তেন। মোটকথা যুদ্ধের খবর জানবার জন্যে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। আর ইংরাজী খবরের কাগজ পড়্তে পড়্তে কিছু ইংরাজী ভাষাও তিনি শিখে ফেল্লেন।

পণ্ডিতমশাই আমাদের বাংলা পড়াতেন ও অঙ্ক কষাতেন।

শক্ত শক্ত বুদ্ধির অঙ্ক দিতেন ; আমার মাথায় কিছুই ঢুকত না। গোঁজামিল দিয়ে অঙ্ক কষতাম—এবং ধরা পড়লে বেদম বকুনি খেতাম।

তিনি বাংলা পড়াতেন—

"ভোঃ ভোঃ রাজন্, দূর কর গর্ব,—
স্মর স্মর পূর্ব ভূপগণ কাহিনী—"

কিম্বা পড়াতেন—

"ভোঃ নভমণ্ডল বল স্বরূপ
কে দিল তোমারে এরূপ রূপ—"

এই সব 'ভোঃ' প্রধান পংক্তিগুলি পড়্তে পড়্তে মাথা ভোঁ ভোঁ করত,—ভাব্তাম 'সন্দেশের' মিষ্টি কবিতাগুলির কথা। কী অপূর্বই না লাগত কবিতাগুলি—

"ইল্‌শে গুঁড়ি ইলশে গুঁড়ি
ইলিশ মাছের ডিম,
ইল্‌শে গুঁড়ি ফুলের কুঁড়ি,
দিনের বেলার হিম্‌।"

কিম্বা—

"বিজন বনে কুসুম কত বিফলে বাস ছড়ায়ে যায়—
নীরবে আহা ঝরিয়া পড়ে, কেহত ক্ষতি মানে না তায়।"

এই সব কবিতার অনুকরণে আমি লিখ্‌তে চেষ্টা করতাম। ধরা পড়্‌লে বকুনি ছাড়া আর ভাগ্যে কিছুই জুটতো না। শুন্‌তাম "এসব তরল কবিতা,—এর থেকে ভাষা শেখা যায় না।"

দাদামশাই আমাকে মেঘনাদ-বধ কাব্য পড়াতেন। ঐসব দাঁতভাঙা কট্‌মটে শব্দ পড়্‌তে আমার অসুবিধা হোত। দাদা মশাই পড়াতেন—

"সুধিলা মুরলা দূতী—"কহ দেবীশ্বরী,
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী—
ইন্দ্রজিতে রক্ষ-কুল-হর্যক্ষে বিগ্রহে।"

তার চেয়ে আমার অনেক ভালো লাগে—রবীন্দ্রনাথের এই সব কবিতা—

"ঐ দ্যাখো মা, বর্ষা এলো
ঘনঘটায় ঘিরে—
বিজুলী ধায় এঁকে বেঁকে
আকাশ চিরে চিরে।"

অথবা—

"আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা
কোথায় বা সীমানা—
দেশে দেশে খেলে বেড়ায়
কেউ করে না মানা।

কত নতুন ফুলের বনে
বিষ্টি দিয়ে যায়,
পলে পলে নতুন খেলা
কোথায় ভেবে পায়।"

কী ভালোই লাগে এসব কবিতা—

"দেখছে চেয়ে ফুলের বনে
গোলাপ ফোটে ফোটে,
পাতায় পাতায় রোদ পড়েছে,
চিক্‌চিকিয়ে ওঠে।
দোলা দিয়ে বাতাস পালায়
দুষ্টু ছেলের মত—
লতায় পাতায় হেলা-দোলা
কোলাকুলি কত।"

সে বয়সে বুঝতে পারতাম না বলে 'মেঘনাদ-বধ' আমার পছন্দ হোত না,—কিন্তু বড় হয়ে ঐ মেঘনাদ-বধ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। মাইকেলের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পেয়ে বুঝেছিলাম সত্যিই তিনি মহাকবি।

দিদির পত্রিকা 'শিশু' বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু 'সন্দেশ' প্রতি-মাসেই আস্‌ছে। কত পৌরাণিক গল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, আবিষ্কারের কাহিনী, জীবনচরিত আমরা পাচ্ছি 'সন্দেশের' মাধ্যমে। মনে পড়ে 'হিমের দেশে' নামে একটি মেরু আবিষ্কারের কাহিনী আমরা কত আগ্রহের সঙ্গে পড়্‌ছি। কাপ্তান স্কট, ন্যানসেন, ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতি দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের কথা পড়ে' অবাক্ হয়ে যাচ্ছি। দুর্গম দেশ আবিষ্কার করতে গিয়ে তাঁরা নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করেছেন, কত কষ্ট সহ্য করেছেন, আবার কেউ কেউ মৃত্যুও বরণ করেছেন। সেই কাহিনীর সঙ্গে উপেন্দ্রবাবুর হাতে আঁকা ছবি, তাই বা কত সুন্দর।

যুদ্ধের সময় সারা ভারতে কাগজের টান পড়ে যায়, তাতে সন্দেশের কিছু রূপের পরিবর্তন হয়, কিন্তু গুণের তার অভাব হয় নাই। মসৃণ চক্‌চকে কাগজের বদলে আমরা কিছু মোটা কাগজ পেতে লাগলাম, কিন্তু ভিতরের রসদ ঠিকই থাক্‌তে লাগ্‌ল।

একবার একটি রঙীন ছবি বার হোলো, একদল সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে ঊর্দ্ধশ্বাসে—তার নীচে কবিতা—

"না মানে কামান না চাহে পিছু—
কে বাঁচে, কে মরে দেখে না কিছু।"

আর একবার একটা একরঙা বড় ছবি বার হোলো, 'ক্ষত্রিয় যোদ্ধার বেশে সম্রাট পঞ্চম-জর্জ।' সুকুমার রায়ের আঁকা তখনকার যুদ্ধে ব্যবহৃত কয়েকটি অস্ত্রের ছবি দেখ্‌লাম সন্দেশের পাতায়। কত রকম বন্দুক, কামান প্রভৃতির ছবি তিনি এঁকেছেন।

অবশ্য আধুনিক-যুগে ওসব অস্ত্র অতি সেকেলে বলেই মনে হবে। কিন্তু তখন ওসব অস্ত্রের কথা পড়ে' আমাদের তাক্ লেগে যেত। মোট কথা আমার জীবনে 'সন্দেশ' যে কতখানি স্থান জুড়ে বসে আছে তা আর বলবার নয়।

এ ধরণের সর্বাঙ্গসুন্দর শিশু-পত্রিকা আজও আমার চোখে পড়্‌ল না।

—উনিশ—

দাদামশাইয়ের কাছে তখন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা আস্‌তে আরম্ভ করেছে। অতি উচ্চাঙ্গের কাগজ, প্রতিমাসে দুই তিনটি করে' রঙীন ছবি আর ভিতরেও অসংখ্য ছোট ছবি থাকে।

বড়দের এত ভালো কাগজ এর আগে আমার আর চোখে পড়ে নাই। ছবিগুলি আগ্রহের সঙ্গে দেখি, ভিতরে রঙ্গ কি ব্যঙ্গ চিত্র থাক্‌লে উপভোগ করতে চেষ্টা করি।

একদিন শিল্পী চারু রায়ের একটি ছবি দেখ্‌লাম—নদীর ধারে গাছপালার মধ্যে একটি কুটীর দেখা যাচ্ছে—তার নীচে লেখা—

'উজল করিয়া আছে দূরে ঐ আমার কুটীরখানি'—

এই ছবি দেখে আমারও ঐ ধরণের একটি ছবি আঁকতে ইচ্ছা হোলো।

কোনো রকমে রং ফলিয়ে একটি ছবি দাঁড় করালাম, আর তার নীচে লিখলাম—

"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ।"

ছবিটাকে চুপে চুপে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দিলাম, ফেরৎ ডাকে তা আবার আমার নামে ফিরে এলো—আমার নাম ও ঠিকানা ছবির পিছন দিকে দেওয়া ছিল।

মনের দুঃখে নিরাশ হয়ে ছবিটাকে চুপে চুপে ছিঁড়ে ফেলব ঠিক করছি—এমন সময় ছোটুয়া এসে দাবী জানালো—

"আরে ইয়ার, এই ছবিটা আমায় দাও। ঘরে টাঙিয়ে রাখব।"

ছোটুয়াকে ছবিটা দিয়ে দিলাম। 'ভারতবর্ষ' যে ছবির মর্যাদা বুঝ্‌ল না, ছোটুয়া তার পুরো সম্মান দিয়ে তাকে তার ঘরে বাঁধিয়ে রাখল আরও কতগুলি ছবির সঙ্গে।

ছোটুয়ার ঘরে আরো যে সব ছবি ছিল, তার মধ্যে একটি ছবি

ছিল গন্ধমাদন পাহাড় নিয়ে হনুমান লঙ্কায় ফিরছে। তার পাশেই অতি যত্নে আমার ছবিখানি ছোটুয়া টানিয়ে রাখল। হনুমানের ছবির পাশে হনুমানের আঁকা ছবি থাক্‌বে না তো কোথায় থাক্‌বে! এই ছবিটা অনেকদিন পর্যন্ত তার ঘরে আমি দেখেছি।

এই ছোটুয়া এখন C. L. Master নামে গিরিডিতে একটি ঘড়ি মেরামতের দোকান করেছে।

দিদির এক বন্ধু ছিল, তার নামও অমিয়া। আগেই বলেছি একদিন দিদির এই বন্ধুর পুতুলের সঙ্গে মহাধুমধামে দিদির পুতুলের বিয়ে হয়ে গেল। দিদির ছিল মেয়ে, তাই বিয়েটা হোলো আমাদের বাড়ীতে। এই পুতুলের বিয়ে উপলক্ষে আমাদের বাড়ীতে সেদিন রাত্রে অনেক লোক ভূরিভোজন করেছিল।

এরপর কয়েক মাসের মধ্যে দিদিরও সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেল। আর তাঁরও বিয়ে হয়ে গেল।

দিদির শ্বশুর চাটগাঁ অঞ্চলে পটিয়া নামে এক দ্বীপে সরকারী কাজ করতেন। বিয়ের পর দিদি সেই পটিয়া চলে গেলেন।

আমার এতদিনের সঙ্গী দূরে চলে গেলেন—আমি দুঃখে কবিতা লিখ্‌লাম—

দিদি চলে যায়—
দিদির পুতুলগুলি লুটিছে ধূলায়—
দিদিরে না যায় দেখা,
আমি পড়ে থাকি একা,
গিরিডিতে আমি রই, দিদি পটিয়ায়।

আমাদের রান্নাঘরের বারান্দায় উনানের পাশের দেওয়ালটার কিছুটা অংশ ধোঁয়া লেগে লেগে কালো হয়ে গেছিল। বিয়ের আগে দিদি চক্‌খড়ি দিয়ে সেই দেওয়ালে এই গানটি লিখেছিলেন—

"তুমি ধন্য ধন্য হে,
পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে,
জনম দিয়েছ জননী ক্রোড়ে,
বেঁধেছ সখারে প্রণয় ডোরে—
তুমি ধন্য ধন্য হে।"

দিদি পটিয়ায় চলে যাবার পর—তাঁর হাতের এই লেখাগুলি আমাদের বাড়ীর সবাইকে আকুল করে' তুল্‌ল। বাবা এই লেখাগুলি দেখেন, চোখের জল মোছেন আর বলেন—"এমন মেয়েটাকে অতদূরে পাঠাতে হোলো। কি করে' নতুন জায়গায় আমার এত সাধের, এত আদরের মেয়েটা থাকবে।"

মা মুখে কিছু বলেন না বটে তবে বোঝা যায় মেয়ের জন্যে তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে।

দিদির অভাবে বাড়ীটা যেন মুষ্‌ড়ে পড়ল। দিদির বিয়ের কিছুদিন পরে জামাইবাবু তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে এলেন।

সেই বন্ধুটি আমাদের গুণের পরিচয় পেয়ে আমাদের চার ভাইকে উপাধি দিলেন—কাব্য-বিদ্যাবিশারদ, ভোজ-বিদ্যাবিশারদ, গীত-বিদ্যাবিশারদ আর বাক্য-বিদ্যাবিশারদ।

আমি কবিতা-টবিতা লিখতাম, তাই হলাম কাব্য-বিদ্যা বিশারদ। মেজভাই বেশ ম্যাজিক দেখাতে পারত, তাই সে হোলো ভোজ-বিদ্যাবিশারদ। সেজভাই গান গাইতে পারত, তাই তাকে উপাধি দেওয়া হোলো, গীত-বিদ্যাবিশারদ আর ছোটভাই খুব কথা বল্‌তে পারত বলে, সে হোলো বাক্য-বিদ্যাবিশারদ।

বারগণ্ডার তরুণেরা 'শালবনী সঙ্ঘ' নামে একটি সমিতি গঠন করল। আমাদের বাড়ীর কাছে যে ফাঁকা মাঠটা ছিল, সেখানেই সুরু হোলো খেলাধুলা।

ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস প্রভৃতি সব খেলাই সেখানে হোত। বাবা ছিলেন এদের মহা উৎসাহদাতা। তিনি নিজেও ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতেন।

টেনিস খেলায় বাবা ছিলেন খুব ওস্তাদ। তিনি টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদান করে' অনেক জায়গায় অনেক পদক পুরস্কার পেয়েছিলেন। সেই সব পদক আমরা অনেক দিন পর্যন্ত দেখেছি।

আমাদের মাঠে ক্রিকেট খেলাটা খুব জমত। গল্প-লেখক কুলদাবাবু খুব ভালো ক্রিকেট খেলতেন, তিনিও আমাদের মাঠে খেলতে নামতেন, বাবাও যোগ দিতেন।

মাঝে মাঝে 'শালবনী সঙ্ঘ' মধুপুর, আসানসোল প্রভৃতি জায়গায় সাহেবদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে যেত।

শালবনী সঙ্ঘের সভ্যরা হকিও ভালো খেল্‌তে পারত।

পূজার ছুটিতে অনেক খেলোয়াড় যখন গিরিডিতে বেড়াতে আসত, তখন তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হোত জেলখানার সামনের P. W. D. মাঠে।

আমরা দল বেঁধে সব খেলা দেখতে যেতাম।

একবার আসানসোলের এক সাহেবদল এই মাঠে হকি খেল্‌তে এল স্থানীয় দলের সঙ্গে।

সাহেবদল যা খেলল তার বুঝি তুলনা হয় না। তারা নানা কায়দায় বল নিয়ে গিরিডির দলকে গোলের পর গোল দিয়ে বিপর্যস্ত করে তুল্‌ল। এমন খেলা আর দেখিনি।

বড়রা আমাদের দলে নিত না বলে আমরা ছোটরা আর একটি ছোট মাঠে খেলা সুরু করলাম—আমাদের বাড়ীর ঠিক গেটের সামনেই।

এই মাঠেই আমার আলাপ হোল কয়েকটি নতুন ছেলের সঙ্গে। যে পণ্ডিতমশাই আমাদের পড়াতেন, তাঁর দুই ছেলে

অজিত আর নোটন আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল। অজিত প্রায় আমার সমবয়সী, নোটন কিছু ছোট।

অজিত গিরিডি হাইস্কুলে পড়ত, আর আমি তখনো বামনদাস বাবুর স্কুলে পড়ি।

বামনদাসবাবুর স্কুলের তখন পড়ন্ত অবস্থা। ছাত্রছাত্রীরা অনেকে চলে যাওয়ায় ক্রমে তাঁর স্কুল উঠে গেল।

বামনদাসবাবুর স্কুলের ছাত্র আমি আর প্রভাত ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে গিরিডি হাইস্কুলের ফোর্থ ক্লাসে (বর্তমানের Class VII) এসে ভর্তি হলাম।

আগে কখনো বড় স্কুলে পড়ি নাই, তাই ইংরেজী ও অঙ্কের একটা প্রাথমিক পরীক্ষা নেওয়া হোলো—আর তাতে কৃতকার্য হওয়ায় আমাদের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি করে নেওয়া হোলো।

সে সময়ে আমাদের স্কুলে কোনো স্থায়ী হেডমাষ্টার ছিলেন না। একজন স্থানীয় উকীল অস্থায়ী ভাবে হেডমাষ্টারের কাজ চালাতেন।

গিরিডির স্কুলটা খুব বড় ছিল, আর তাতে বহু ছাত্র ছিল। গিরিডির নানা অঞ্চল থেকে ছেলেরা পড়তে আসত।

এই স্কুলে ভর্তি হয়ে একদিকে যেমন আনন্দ হোলো আর একদিকে তেমনি তার কড়াকড়ি নিয়মের জন্যে ভয়ও হোলো।

বামনদাস বাবুর স্কুলে স্বাধীন ভাবে পড়াশোনা করতাম, খেলাধূলা করতাম, ইচ্ছামতন যেতাম আসতাম—কিন্তু এখানে এসে দেখলাম, ইচ্ছামত কিছু করা চল্‌বে না।

রোজ ঠিক সময়ে স্কুলে আসতে হবে। না আসতে পারলে অভিভাবকের চিঠি আনতে হবে—না হলে এক আনা করে' জরিমানা। তিনদিন দেরী করে' এলে আবার এক আনা জরিমানা।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় নতুন নতুন মষ্টার। ঠিক মত পড়া না করে' আসলে, ধমক, বেঞ্চে দাঁড় করানো—প্রহার।

—কুড়ি—

আমাদের সময়ে স্কুলে এক বাংলা আর সংস্কৃত ছাড়া অন্য সব বিষয়গুলি ইংরাজীর মাধ্যমেই পড়ানো হোত। স্কুলে মাষ্টারদের সঙ্গে যথাসম্ভব ইংরাজীতেই কথা বল্‌তে হোত। যে ছেলে যত ভালো ইংরাজী জানত সেই ছিল তত বেশী ভালো ছাত্র, এবং মাষ্টারদের হোত ততই প্রিয়।

আমাদের বাংলার মাষ্টার ছিলেন হিমাংশুপ্রকাশ রায়। তিনি নিজে ছিলেন কবি আর রবীন্দ্রনাথের একান্ত ভক্ত।

তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা গল্প বল্‌তেন। তিনি বাড়ীতে যে সব কবিতা লিখতেন, ক্লাসে তাই পড়ে শোনাতেন। আমরা তারিফ করতাম।

একবার রাজা রামমোহন সম্বন্ধে একটি নতুন ধরণের কবিতা লিখে তিনি ক্লাশে নিয়ে এলেন—আর আমাদের বল্লেন "তোমরা সবাই খাতাগুলো আড় করে নাও,—তারপর তাতে এই কবিতাটি লেখ আমি যেমন যেমন বলে যাই।" আমরা খাতা আড় করে' লিখলাম সুদীর্ঘ কবিতার লাইন, একটি লাইন একসঙ্গে খাতায় আঁটে না—

"ঊনবিংশ-শতাব্দীর বিরাট বর-পুরুষ-সিংহ পাদপদ্মে, হে ভারত আজি নত কর, নত কর তব দরিদ্র শির।"

এই হোলো একটি লাইন। এই রকম সুদীর্ঘ লাইন দিয়ে কবিতাটি লেখা।

কবিতাটি লিখতে আমরা যেন হাঁপিয়ে উঠলাম।

তিনি বল্লেন "যে নির্ভুলভাবে এই কবিতাটি লিখতে পারবে তাকে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা চিঠি দেখাব।"

যা হোক, কবিতা টুকতে ভুল করলেও আমরা রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা চিঠি দেখেছিলাম। কী সুন্দর পরিষ্কার অক্ষর।

হিমাংশুবাবু স্কুল থেকে একটি হাতের লেখা পত্রিকা বার

করে' ক্লাশের ছেলেদের তাতে লিখতে বল্লেন। আমি তখন আমার পরে-বিখ্যাত এই কবিতাটি লিখে তাঁর কাছে দেই—

"ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং সবে সরে যাওনা,
চড়িতেছি সাইকেল দেখিতে কি পাওনা ?
ঘাড়ে যদি পড়ি তবে প্রাণ হবে অস্ত,
পথ মাঝে রবে পড়ে ছরকুটে দন্ত।

* * * * * *

বলিয়া গেছেন তাই মহাকবি মাইকেল—
যেওনা যেওনা সেথা যেথা চলে সাইকেল।"

কবিতাটি দেখে হিমাংশুবাবু গম্ভীর হয়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন—

"কোন্ বই থেকে টুকেছ ? সন্দেশ থেকে ?"

বিজয় মুখার্জি নামে আমার এক বন্ধু আমাকে সমর্থন করে' দাঁড়িয়ে উঠে নিজের মাথায় টোকা দিয়ে বল্লে—

"From his fertile brain sir"

এই বিজয় এখন একজন বড় ডাক্তার।

হিমাংশুবাবু যখন প্রমাণ পেলেন ওটি আমারই লেখা তখন তিনি সন্তুষ্ট হলেন—এবং সেই থেকে আমার দিকে একটু বিশেষ নজর দিলেন।

আমাদের ক্লাশে বসন্ত নামে একটি ভালো ছেলে বেশ সুন্দর ছবি আঁকত। আমিও কিছু কিছু আঁকতে পারতাম।

হিমাংশুবাবু স্কুলের পত্রিকার জন্যে একটি কবিতা লিখে আন্‌লেন—

"বৃদ্ধ বলে দিস্‌না গাল,
আর যা খুশী বল্‌বি বল ;
মিথ্যা গালে পিত্ত জ্বলে,
জ্বলে গভীর চিত্ত-তল।"

ইত্যাদি

এই কবিতার বিষয় নিয়ে তিনি বসন্ত আর আমাকে দু'খানা ছবি আঁকতে বল্লেন। তার পরদিনই আমরা দু'খানা রঙীন ছবি এঁকে নিয়ে গেলাম। বসন্তর ছবিটাই ভালো হোলো, তবু কেউ কেউ আমার ছবিটারই প্রশংসা করল।

'সন্দেশে' একটি মজার রঙীন ছবি বেরিয়েছিল, একজনের প্রকাণ্ড নাকে একটা মাছি এসে বস্‌ছে,—হাতে তার 'সন্দেশ' পত্রিকা—নীচে লেখা

"সন্দেশের গন্ধে বুঝি দৌড়ে এলে মাছি—
কেন ভন্‌ ভন্‌ হাড় জ্বালাতন! ছেড়ে দাও না বাঁচি।"

এই ছবিটির অনুকরণে আমি একটি ছবি এঁকেছিলাম—হিমাংশুবাবু এই ছবিটাকে স্কুল-পত্রিকার প্রচ্ছদপট হিসাবে ব্যবহার করলেন।

যে বসন্তের কথা উল্লেখ করলাম, তার সঙ্গে কোনো বিষয়েই আমি এঁটে উঠতাম না। ক্লাসে সে সব বিষয়েই প্রথম হোত, গান গাইত, বাঁশি বাজাত, ছবি আঁকত, কবিতা লিখত এমন কি বাড়ীতে সার্কাস পর্যন্ত করত। তার হাতের লেখাও ছিল চমৎকার।

আমি ভাবতাম অন্ততঃ বাংলায় তাকে হারাতে হবে, কিন্তু দেখি কার্যকালে বসন্তই আমাকে হারিয়ে দিয়েছে।

একবার হিমাংশুবাবু 'সরস্বতী পূজা' সম্বন্ধে আমাদের ক্লাসে একটি প্রবন্ধ লিখতে দেন।

এই প্রবন্ধ লেখায় বসন্ত হোলো প্রথম, আমি দ্বিতীয়। শুনেছি হিমাংশুবাবু আমাদের প্রবন্ধ দুটি অন্যান্য ক্লাশেও পড়ে' শুনিয়েছিলেন।

এই বসন্ত বা বসন্তকুমার দত্ত এখন ধানবাদে এক কলিয়ারীর ম্যানেজার।

এইবারে একটা অপ্রিয় ঘটনা ঘটল। আমার বাড়ী থেকে

আমার মোটা মোটা পড়ার বই চুরি যেতে লাগল। বইগুলি কে নিয়ে যায় আমি ধরতে পারি না।

বাবা বইগুলোর খোঁজ করেন কিন্তু পান না। আমাকে তিরস্কার করেন—"তুই বদ্ ছেলেদের সঙ্গে মিশে নিশ্চয় বইগুলি কোথাও বিক্রী করছিস।"

আমি কোনো কারণ বলতে পারি না, কাজেই চুপ করে থাকি।

এই ভাবে আমার পড়ার ঘর থেকে নতুন নতুন চৌদ্দখানা বই অদৃশ্য হোলো।

আমার পড়ার ঘরে আমার বন্ধু-বান্ধবেরা ঢুক্‌ত,—কিন্তু তাদের আমি সন্দেহ করতে পারি না—আর বইয়ের কোনো উদ্দেশও পাই না।

একদিন স্কুলে চোর ধরা পড়ল। আমার এক ক্লাশ উঁচুতে একটি ছেলে পড়ত,—দেখি তাকে হেড্‌মাষ্টারের ঘরে আট্‌কানো হয়েছে। অন্য এক বাড়ীতে বই সরাতে গিয়ে সে হাতে-নাতে ধরা পড়ে' গেছে। সে আমাদের মাঠে খেল্‌তে আস্‌ত আর অনেক সময় জল খেতে আমার পড়ার ঘরে ঢুকত আর সেই ফাঁকে সে আমার বই চুরি করত।

যে-বাড়ীতে বই চুরি করতে গিয়ে ছেলেটি ধরা পড়ল সে বাড়ীতে স্কুলের পণ্ডিতমশাই পড়াতে যেতেন। তিনি এসে হেড্‌মাষ্টারকে খবর দেন।

খোঁজ করে' তার বাড়ীতে আরো অনেকের নাম লেখা চোরাই বই পাওয়া গেল। আমার চৌদ্দখানা বইও সেখান থেকে বেরুল।

সে দিন ছেলেটির দারুণ শাস্তি হোলো। গাধার টুপী মাথায় দিয়ে, দুটি নীচু ক্লাসের ছেলেকে দিয়ে তার কান ধরিয়ে—প্রতি ক্লাসে ঘোরানো হোলো। গাধার টুপীতে লেখা হোলো 'চোর'।

আমাদের অস্থায়ী হেড-মাষ্টার তার সঙ্গে প্রতি ক্লাসে ঘুরতে

লাগলেন—আর ক্লাসের ছেলেদের বলতে বল্লেন—"বল চোর চোর।"

ছেলেরা উচ্চস্বরে বলতে লাগল "চোর চোর।"

সেদিন ছুটির পর হেড-মাষ্টার মশাই ছেলেদের স্কুলের মাঠে জড় হতে বল্লেন।

ছুটির পর আমরা সবাই স্কুলের মাঠে জড় হলাম। হেডমাষ্টার আমাদের সামনে সেই চোর ছেলেটিকে একটা লক্‌লকে বেত দিয়ে দারুণ প্রহার করতে লাগলেন। মারতে মারতে বেত ভেঙে গেল।

এই রকম প্রহার দেখে আমার ভয়ানক কষ্ট হোলো, আমি প্রায় কেঁদে ফেল্লাম।

সেদিন সেই অপহৃত চৌদ্দখানা বইয়ের বোঝা নিয়ে অতি কষ্টে বাড়ী ফিরলাম।

বাবা সব শুনে বল্লেন—"ওকে আর ঘরে ঢুক্‌তে দিস্ না, ও তোদের থেকে বয়সে অনেক বড়, ওকে সঙ্গে খেল্‌তেও নিবি না।"

আর একদিন এক ব্যপার হোলো। শুনলাম স্কুলে ম্যাজিক দেখানো হবে।

স্কুলে নিয়ে যাবার জন্যে বাবা আমাকে একটা দামী ছাতা কিনে দিয়েছিলেন। তার শিকগুলি ছিল পিতলের, আর কাপড়টা উচ্চশ্রেণীর রেশমের তৈরি।

ম্যাজিকের দিন আমি সর্বপ্রথম ঐ ছাতাখানা নিয়ে স্কুলে গেলাম।

সেদিন তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল, আমরা স্কুলের সব ছেলেরা মাঠে এসে গোল হয়ে বসলাম, মাঝখানে ম্যাজিক দেখানো চল্ল।

ম্যাজিক দেখে বাড়ী ফিরেছি, বাবা বল্লেন—"তোর ছাতা কৈ?"

সর্বনাশ! মনে পড়ল ঐ ছাতা পেতে ম্যাজিক দেখতে বসেছিলাম, উঠবার সময় আর ঐ ছাতার কথা মনে ছিল না। ওখানেই ফেলে এসেছি।

মুখ কাচুমাচু করে' ঐ কথাটি বাবাকে নিবেদন করলাম।

মাথায় একটা গাঁট্টা মেরে বাবা বল্লেন—"তুই একটা অপদার্থ, এই বই চুরি যায়, এই ছাতা হারায়,—তোকে নিয়ে আর পারা যায় না। তোকে আর কিছু কিনে দেব না। তোর হাত-পাগুলো শরীরের সঙ্গে আট্‌কানো না থাকলে, তাও কোথায় হারিয়ে আস্‌তিস্।"

ভেবেছিলাম পরের দিন স্কুলে গিয়ে ছাতাটা পাব, কিন্তু পরদিন স্কুলে গিয়ে কত খোঁজ করলাম, কোথায় সেই পিতলের শিক-ওলা ছাতা! স্কুলের দারোয়ানদের জিজ্ঞাসা করলাম—কেউ তার কোনো হদিস্ দিতে পারল না বা জানলেও অস্বীকার করলো।

একদিন বাবা তখনকার সাহেব-ম্যাজিষ্ট্রেটের মেমসাহেবকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে এলেন। বাবার সঙ্গে তাঁর খুব আলাপ ছিল। মা তাঁকে চা খেতে দিলেন, আর সঙ্গে দিলেন চিড়েভাজা আর নারকেল-কোরা।

মেমসাহেব তো খুব খুশি। মুখভঙ্গী করে চিড়েভাজা চিবোন, আর বলেন—"Very nice, very nice."

আমরা তো তাঁর খাওয়ার বহর দেখে মুখ টিপেটিপে হাসি।

—একুশ—

আমার স্কুলের সহপাঠী পণ্টুদের বাড়ীতে একজন ইয়া লম্বা-চওড়া কাবুলী আসত। পণ্টুর মা ছেলেবেলা থেকে তাকে মানুষ করেছেন বলে সে পণ্টুর মাকে মা বলেই ডাকত। পণ্টু তার থেকে বয়সে অনেক ছোট হলেও সে তাকে পণ্টুদা বালে ডাকত।

নাম ছিল তার বৈরাম খাঁ,—প্রায়ই সে পণ্টুদের বাড়ীতে এসে দাওয়ায় বসে চিড়া-দই খেত। পণ্টুর মা তার নিজের মায়ের মতই তাকে যত্ন করে' খাওয়াতেন।

এই বৈরাম খাঁ একটা সাইকেলে চেপে পণ্টুদের বাড়ীতে আসত।

পণ্টু তার সাইকেলেই সাইকেল চাপতে শেখে। আমারও ইচ্ছা হোলো সাইকেল চড়তে শিখি। পণ্টুকে মনের বাসনা জানালাম। পণ্টুও বৈরাম খাঁকে বলে তার অনুমতি নিল।

বৈরাম খাঁর সাইকেলেই অভ্যাস করতে লাগ্‌লাম। পুরানো ঝর্‌ঝরে সাইকেল, ব্রেক নেই, বেল নেই,—দরকার হলে চাকায় পা লাগিয়ে সাইকেল থামাতে হয়,—তাও অভ্যাস করলাম।

আনন্দের আর শেষ নাই। একদিন মাঠের মধ্যে ঝড়ের বেগে পাক্‌ খেতে খেতে ফাঁকা রাস্তায় সাইকেল ছোটালাম।

নিস্তব্ধ দুপুর বেলা—ঢালু পথে আমার সাইকেল ছুটছে বাধা-বন্ধহীন। একটু দূরে রাস্তার একটা বাঁক বাম দিকে ঘুরে গেছে,—আমি সেই বাঁকে যেই সাইকেল ঘুরিয়েছি, অমনি ছিট্‌কে পড়লাম শুক্‌নো পাথুরে নর্দমার ভিতর,—আমার সাইকেলটাও দূরে ছিট্‌কে পড়্‌ল।

উঠ্‌বার আর সাধ্য নাই, তাকিয়ে দেখি হাঁটু দুটো থেকে ঝর্‌ঝর্‌ করে' রক্ত পড়ছে,—তবুও কোনো রকমে উঠে দাঁড়ালাম।

কাছেই এক বন্ধুর বাড়ী ছিল, তাকিয়ে দেখি সেই বন্ধুর এক দিদি বাড়ীর বাইরের চাতালে দাঁড়িয়ে সব দেখতে পেয়েছেন।

লজ্জায় যেন আমার মাথা কাটা গেল। ব্যথার চেয়ে লজ্জাই হোলো বেশী,—এক্ষুনি আমার এই অধঃপতনের কথাটা বন্ধু-মহলে রটে যাবে।

বন্ধুর দিদি আমার অবস্থা বুঝে আমাকে ইসারা করে' ডাকলেন। আমি সাইকেলটা রাস্তার ধারে ফেলেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে বন্ধুর বাড়ী হাজির হলাম।

আমার বন্ধু পচুও (নিরুপম বন্দ্যোপাধ্যায়) সেখানে এসে উপস্থিত হোলো—আর আমার হাঁটুর দুরবস্থা দেখে,—তারা ভাই বোনে মিলে বরিক পাউডার দিয়ে আমার হাঁটু দুটো ব্যাণ্ডেজ করে' দিল।

এতক্ষণ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম,—সাইকেলটার যে কি অবস্থা হয়েছে সেদিকে কোনো খেয়ালই ছিল না। এইবার আস্তে আস্তে গিয়ে সাইকেল তুলে দেখি তার সামনের চাকাটা পরোটার মত তিনকোনা হয়ে গেছে।

এই সেরেছে, বৈরাম খাঁর সাইকেল! তাকে এই অপরূপ অবস্থায় দেখ্‌লে সে যে আমাকে কী বল্‌বে তা অনুমান করে' অতি ভয়ে ভয়ে গিয়ে পণ্টুর শরণ নিলাম।

সাইকেল দেখে পণ্টুও অপ্রস্তুত,—তার দায়িত্বে বৈরাম আমাকে সাইকেল চড়তে দিয়েছে।

সে ইট দিয়ে ঠুকে ঠুকে সাইকেলের চাকাটা ঠিক করতে চেষ্টা করল—কিন্তু সেই বনেদী তিনকোনা পরোটা আর গোল ঢাকাই পরোটা হয় না। কিছুক্ষণ বৃথা চেষ্টা করে' সে তাদের বাড়ীর বারান্দায় ঘুমন্ত বৈরাম খাঁর মাথার কাছে সাইকেলটা রেখে সোজা পিট্‌টান দিল।

পরে অবশ্য বৈরাম খাঁ তার সাইকেলটা দোকান থেকে মেরামত করে নিয়েছিল,—কিন্তু আমার হাঁটু দুটোকে অত সহজে মেরামত করা গেল না। তার জের চলেছিল অনেকদিন পর্যন্ত। অনেকদিন পর্যন্ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটেছিলাম।

বাবার একটা খুব দামী Biston Humber সাইকেল ছিল। তিনি আমাদের তা ধরতে দিতেন না।

একদিন তিনি বল্লেন "অমুক বাবু তোকে তাঁর বাড়ীতে পড়াবেন,—তুই আমার সাইকেল চেপে পড়তে যাবি, আর সোজা বাড়ি চলে আসবি। তোর বন্ধু-বান্ধব কেউ যেন এই সাইকেল না ধরে, এতে বন্ধুত্ব থাক্ আর যাক্।"

বাবা বেজায় কড়া লোক ছিলেন, তাঁকে ভীষণ ভয় করতাম। যা মানা করতেন কিছুতেই তা করতে সাহস পেতাম না।

কাজেই পড়তে যাবার সময়, বন্ধু-বান্ধবেরা কেউ এই সাইকেলটা চাইলে বিপদেই পড়তাম, এড়িয়ে যাবার জন্যে বল্‌তাম—"ঐ বাবা আসছেন" বলেই শোঁ করে বেরিয়ে যেতাম। আমার বন্ধু-মহলে সবাই বাবাকে ভয় করত। কাজেই তারাও সরে পড়ত।

বাবার ধারণা ছিল, বেশী মাষ্টার পড়ালেই বুঝি ছেলেদের বুদ্ধি খোলে। দুপুরে স্কুলে যেতাম, আর সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায় আমাদের মাষ্টারের পর মাষ্টার এসে আটক করতেন। এমন কি প্রচণ্ড শীতের শেষ-রাত্রেও বাবা আমাকে জাগিয়ে পড়াতেন। শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমার উঠতে হোত। উঃ সে কী কষ্ট।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শৈশবে ভৃত্য-শাসন-তন্ত্রে মানুষ হয়েছিলেন, আর আমি মাষ্টার-শাসন-তন্ত্রে মানুষ হচ্ছি।

ঘুম থেকে উঠেই মাষ্টার আসেন, তিনি পড়িয়ে চলে যান, আবার অন্য মাষ্টার আসেন, তারপর স্কুলে যাই। বাড়ী ফিরেই

দেখি অন্য মাষ্টার টেনিশ ব্যাট হাতে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। তিনি আমাদের পড়িয়ে টেনিশ খেলতে যাবেন। তিনি যাবার পর কিছুক্ষণ খেলার ছুটি, তারপর আবার সন্ধ্যায় মাষ্টার।

এই তো গেল স্কুলের সময়ের নিয়ম,—এ ছাড়া গ্রীষ্ম বা পূজার ছুটির সময় দুপুরেও মাষ্টারের ঝামেলা। এই মাষ্টারদের নিয়ে আমি তখন একটা মজার ছড়া লিখেছিলাম।

টাক্, টাক্, পাণ্ডে, ঘুম, রিকরঞ্জন ;
চিৎ চিৎ, গাঁইটো, সকরকন্দ, ক্যায়রণ,
ছ্যাঁকড়া গেল পরে ল্যালাখাবা জুট্‌ল,
ছুটিতে হাসিখেলা বেমালুম টুট্‌লো।

আমাদের সাঙ্কেতিক শব্দে ছড়াটি লিখেছিলাম---কাজেই সাধারণে কেন মাষ্টার মশাইরাও এ ছড়াটি শুনে কিছুই বুঝতেন না।

একজন মাষ্টার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের "দুই বিঘা জমি" অনুকরণে একটি কবিতা লিখেছিলাম—

শুধু দু আঙুল, ছিল মাথে চুল, আর সবি ভরা টাকে,
সেই চুল দিয়ে সদা আঁচড়িয়ে টাকখানি তার ঢাকে।

ইত্যাদি।

অবশ্য মাষ্টারদের সম্বন্ধে এরকম ছড়া কি কবিতা লেখা ছাত্রদের পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় তা আমি পরে বুঝেছি। তখন এটাকে নিছক খেলা বলেই মনে করতাম।

আমাদের বাইরের পড়ার ঘরের জানালা দিয়ে খেলার মাঠ দেখা যায়। শীতকালে ছুটির দুপুরে সেখানে মহাসমারোহে ক্রিকেট ম্যাচ্ খেলা হোত।

দুপুরে মাষ্টার আমাদের পড়াতে আসতেন,—আমরা পড়তাম আর জানালা দিয়ে খেলা দেখতাম। টের পেয়ে মাষ্টারমশাই মাঠের দিকের জানালাটা বন্ধ করে দিতেন।

আর একজন মাষ্টার আসেন যেমনি রোগা তেমনি লম্বা।

অত রোগা লোক সহজে চোখে পড়ে না। তার বুকের হাড় পাঁজরাগুলি পর্যন্ত গোনা যেত।

বাবা যখন বাড়ীতে থাকতেন না, তিনি আমাদের বাইরের ঘরের বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে কি ভাবে ব্যায়াম করতে হয় তা শেখাতেন। বাবা বাড়ী থাকলে তিনি চীৎকার করে' করে' আমাদের ইংরাজী পড়াতেন।

আর একজন মাষ্টার আসতেন, গ্রীষ্মের দুপুরে তিনি এসেই এক গ্লাস জল খেয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে ঝেড়ে একখানা লম্বা ঘুম দিতেন। তারপর আমাদের পড়াগুলো একটু দেখে বাড়ী চলে যেতেন।

আর একজনের কথা মনে পড়ে, তিনি এখন মৃত। তিনি খুব হালুয়া খেতে ভালোবাসতেন। আমার সেজভাই সুকোমল তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে হালুয়া খাইয়ে বশ করে' ফেলেছিল, তাকে পড়াতেন না।

হলুদে-ছোপানো হল্‌দে কাপড় পরে' একজন হিন্দুস্থানী মাষ্টার আস্‌তেন অংক শেখাতে। মাথায় ছিল তার প্রকাণ্ড টিকি। ঐ টিকির উপর আমার ভাইদের প্রবল লোভ ছিল। তিনি ভালোয় ভালোয় স-টিকি কাজ ছাড়লেন।

আর একজন মাষ্টার কথায় কথায় আমাদের প্রহার করতেন। তাকে আমরা একটুও পছন্দ করতাম না। একটু পাগ্‌লাটে ধরণের স্বভাব ছিল তাঁর। শ্লেট দিয়ে মাথায় আঘাত করতেন।

পণ্ডিতমশাইয়ের কথা আগেই বলেছি। ছুটির সময় তাঁর বাড়ীতে আমি সংস্কৃত আর অংক কষতে যেতাম। তাঁর ছেলে অজিত আর আমি একসঙ্গেই পড়তে বসতাম।

পণ্ডিতমশাই আমাদের পড়া দিয়ে আবার অন্য বাড়ীতে পড়াতে যেতেন, ফিরে এসে আমাদের পড়া নিতেন।

যেই পণ্ডিতমশাই বেরিয়ে যেতেন আমি আর অজিত কুস্তি লড়তে আরম্ভ করতাম।

একদিন পণ্ডিতমশাই বেরিয়েই আবার কি জন্যে জানি বাড়ী ফিরে এলেন। আমরা তখন কুস্তির কাঁচি প্যাঁচ্ দুরস্ত করছি,—হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেলাম।

পণ্ডিতমশাই অজিতকে খুব মন্দ বল্লেন, আর আমাকে বল্লেন "দাঁড়াও, তোমার বাবাকে বলে দিচ্ছি।"

আমি খুব অপ্রস্তুত হলাম। অজিত আমাকে অভয় দিয়ে বল্লে, "দাঁড়া না, বাবা চলে গেলে আবার কুস্তি লড়ব।"

আমাদের পড়াতে আর একজন মাষ্টার আসতেন, তিনি ছিলেন ভয়ঙ্কর রকমের তোত্‌লা। কথা বল্‌তে বল্‌তে তাঁর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠত। একদিন আমার সেজভাই স্থকোমল দুষ্টুমি করে' তাঁকে জলহস্তীর ইংরাজী জিজ্ঞাসা করল।

তিনি 'হিপোপটেমাস্' বল্‌তে "হি-হি-হি পট্‌-পট্‌-পট্‌-পট্‌" পর্যন্ত বলে আর বল্‌তে পারলেন না। বলার সময় তাঁর বিকৃত মুখভঙ্গি দেখে আমরা অতি কষ্টে হাসি চাপতাম। তিনি ছিলেন বেজায় রাগী। আমাদের হাসতে দেখলে বলতেন—"মে-মে-মে-মেরে ফে-ফে-ফে-ল্‌ব।"

একদিন অজিত এসে বল্‌ল "আয়, আমরা একটা হাতের লেখা কাগজ বের করি।"

"কি নাম দিবি?" আমি প্রশ্ন করলাম।

অজিত বল্ল "বাবা নাম ঠিক করে' দিয়েছেন— অবকাশরঞ্জন। ছুটির সময় এই কাগজ বের করব বলে এই নাম তিনি দিয়েছেন।

এসব বিষয়ে আমার প্রবল উৎসাহ। কাগজের প্রথম পাতার জন্যে একটি কবিতা লিখে অজিতকে দিয়ে এলাম—

অবকাশ রঞ্জন বিপদের ভঞ্জন,
রঞ্জিত করে চারিধার,
মাভৈঃ মাভৈঃ রব করে নর-নারী সব,
খঞ্জন গাহে অনিবার।

আর লাইনগুলি আমার মনে নাই। তবে মনেপড়ে তাতে অনুপ্রাসের শ্রাদ্ধ করে' ছেড়েছিলাম। প্রভঞ্জন, গঞ্জন, অঞ্জন, ব্যাঞ্জনা, ঝঞ্ঝনা প্রভৃতি যত 'ঞ্জ' যুক্ত শব্দ জান্‌তাম—তাদের প্রয়োগ করেছিলাম এই কবিতাতে।

এই কবিতাটি দেখে পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন "অর্থহীন কবিতা, ভাবহীন অভিব্যক্তি, ব্যাকরণহীন পংক্তি আর অতি অনুপ্রাসযুক্ত অসঙ্গতি।"

যাই হোক, কবিতাটি অজিতের পছন্দ হোলো। সে বল্লে "রবিবাবুর থেকে ভালো কবিতা হয়েছে রে,—রবিবাবুর অনেক কবিতার মানেই তো বোঝা যায় না,—মানে হয়ত হয়ই না। কাজেই তোর কবিতাটি খারাপ কিসের?"

'অবকাশ রঞ্জনে'র প্রথম পৃষ্ঠায় আমার কবিতাটি লেখা হোলো, তারপর অন্যান্য লেখার অভাবে অবকাশরঞ্জন চির অবকাশ লাভ করলো।

—বাইশ—

একদিন এক বিশিষ্ট গুণী লোক আমাদের বাড়ীতে এসে অতিথি হলেন। নাম তাঁর রাম বাবু, রাম-বেহালাদার নামেই তিনি সবিশেষ পরিচিত। তিনি এক গাদা বাজ্না নিয়ে আমাদের বাড়ীতে উঠ্লেন।

বাবা বাইরের ঘরে তাঁর থাকবার জায়গা করে' দিলেন। বেশ মনে পড়ে, ঘরখানি তাঁর বাদ্যযন্ত্রে ভরে' গেল। ইস্, কত রকম বাজনা! বড় বড় সেতার, এস্রাজ, বেহালা, বাঁশি, চটা প্রভৃতি দেখে আমাদের আর কৌতূহলের শেষ নাই।

শুনলাম এই সব বাজনাগুলিই তিনি ওস্তাদের মত বাজাতে পারেন।

আমার বন্ধু-মহলে এ কথাটা রটে গেল। দলে দলে তারা এলো রাম-বেহালাদারকে দেখতে। চারধারে বাদ্যযন্ত্রের সমারোহ, তার মধ্যে বসে আছেন ছোট্ট-খাট্ট মানুষটি! তাজ্জব ব্যাপার বটে; এই লোকটিই এতগুলি বাজনা বাজাতে পারেন!

আমি তাদের বলি—"সন্ধ্যার সময় আসিস্, বাজনা শুনবি, অবাক্ হয়ে যাবি।" আঙুল দিয়ে দেখাই—"ওই ছাখ্ তরফ্দারী সেতার, ওই ছাখ্ অদ্ভুত বাজনা চটা,—শুধু একটা বাঁশের কঞ্চির উপর একটা তার লাগানো, সমস্ত রাগ-রাগিনী বাজবে ওতে, দেখিস্ সন্ধ্যায়। তাড়াতাড়ি আসিস্।"

সন্ধ্যায় আসর বস্ল—আমার বন্ধুরা এলো, বাবার বন্ধুরা এলেন, পাড়ার অনেকে এলেন।

রাম-বেহালাদার এক এক করে' বাজনা বাজাতে লাগলেন। করুণ সুরে এস্রাজে কীর্তন বাজালেন, ঝঙ্কার দিয়ে সেতার বাজালেন, টানা সুরে বেহালা বাজালেন, সুরের ঢেউ খেলিয়ে বাঁশি বাজালেন, তারপর ধরলেন সেই অদ্ভুত বাজ্না চটা।

কঞ্চিটাকে এস্রাজের তারের সঙ্গে ঠেকিয়ে তিনি ছড় টানলেন, কঞ্চি গান গেয়ে উঠলো, আঙুলের পর্দায় পর্দায় রাগিনী বাজতে লাগল।

সবাই মুগ্ধ হয়ে "বাঃ-বাঃ, সাবাস্ ভাই"—বলে তারিফ করলেন। গুণী বটে।

গিরিডির নানা অঞ্চলে রাম-বেহালাদারের ডাক্ পড়তে লাগল। নানা বাড়ীতে আসর বস্‌তে লাগল। রামবাবুর প্রশংসায় সারা শহর মুখরিত।

বাদ্য যন্ত্রগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি ভাবি—এই যন্ত্রগুলি আমি বাজাতে পারি না কেন? আমারও তো হাত আছে, আঙুল আছে, বুদ্ধি আছে তবু আমি ছুঁলে ওগুলো যেন বিকৃত স্বরে চিৎকার করে' ওঠে। রামবাবু কেমন পোষ মানিয়েছেন ওগুলোকে। ধন্য রামবাবু। তোমার হাতগুলো কেটে রাখতে হয়। যেন রামবাবুর বাহাদুরি ওই হাতের জন্যেই।

কিছুদিন পর রামবাবু আমাদের বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন। আমি একটা বাঁশের বাঁশি জোগাড় করে' গান বাজাতে চেষ্টা করি—

"যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনে প্রবাহিনী"—কিম্বা দ্রুত তালে—

"ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল
আর এলোনা, আর এলো না।"

বাঁশি নীরবে বাজানো যায় না,—গোপনে সাধনা করা যায় না, তাই আমার বাঁশির গান সবাই শুনতে পায়।

মা বলেন—"বেশ বাঁশি বাজাচ্ছে তো।"

বাবা বলেন—"ও যেন বাঁশি না বাজায়, ওতে বুকের দোষ হয়।"

একদিন উৎসাহিত হয়ে ছোটুয়াকে জিজ্ঞাসা করি "বল্‌তো কি গান বাজাচ্ছি"—বলে গান বাজাতে চেষ্টা করি—

"শুধুই সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো—"

শুনে ছোটুয়া বলে, "ওতো গান বাজাচ্ছ না, ফুঁজাচ্ছ।"

'ফুঁজাচ্ছ' মানে ফুঁ দিয়ে গানটা গেয়ে যাচ্ছ।

বলেই ছোটুয়া আমার বাঁশিটা নিয়ে একটা গান ফুঁজালো—

"আরে রাম নাম লাড্ডু
গোপাল নাম ঘি,
আর হরিনাম মিশ্রী
ঘোরি ঘোরি পি।"

ছোটুয়ার ফুঁজানো টা মন্দ লাগল না, গানটা বেশ বুঝতে পারলাম।

ছোটুয়া বল্লে "বাঁশি বাজায় বুলা বাবু। আমরা ফুঁজাই।"

সত্যি বুলাদা (প্রশান্ত মহলানবিশের ছোট ভাই প্রফুল্ল মহলানবিশ) চমৎকার বাঁশি বাজাতেন।

জ্যোৎস্না-ঝরা রাতে তিনি পথ চল্‌তে চল্‌তে বাঁশি বাজান। সুরে সুরে গান বেজে উঠে—

"কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি
ধরায় আস।"

অন্ধকার রাতে তাঁর বাঁশিতে সুর বাজে—

"বিশ্ব যখন নিদ্রামগন গগন অন্ধকার।"

কখনো নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে শুনি ওপারে শালের বনে 'বনখঞ্জোর' দিক থেকে বুলাদার বাঁশি ভেসে আসছে—

"গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে—"

সন্ধ্যাবেলা পড়তে বসে বুলাদার বাঁশি শুনতে পাই, পড়াশুনা আর ভালো লাগেনা।

ভাবি, ওই রকম বাঁশি আমি বাজাতে পারিনা কেন।

বুলাদার সঙ্গে গিয়ে ভাব জমাই। তিনি কল্‌কাতায় থাকেন,

মধ্যে মধ্যে গিরিডিতে আসেন। তাঁর বাঁশি শুনেই বুঝি বুলাদা এসেছেন।

বুলাদার বাঁশি পরীক্ষা করি। সাধারণ বাঁশের বাঁশি, কিন্তু তিনি তার কয়েকটি ফুটোতে মোম জাতীয় কি যেন দিয়ে ফুটোগুলি কিছু ছোট করে' নিয়েছেন।—

আমি তাঁকে আমার বাঁশি দেখাই। তিনি ফুঁ দিয়ে বাজিয়ে বলেন—"একদম বেসুরো। আমি তোমাদের কল্‌কাতা থেকে বাঁশি এনে দেব।"

তাঁর কথায় পুলকিত হই। তিনি তখন কল্‌কাতার বিখ্যাত খেলার সরঞ্জাম ও বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা 'কার্‌ণবিশের' অংশীদার।—

ছোটুয়াকে এই সুসংবাদ দেই।—সে বল্লে—"আরে ইয়ার, কলকাতায় কি বাঁশ পাওয়া যায়। বাঁশ হয় আমাদের দেহাতে।—সেখান থেকে বাঁশ নিয়ে আমি তোমাকে বাঁশি করে' দেব,—বাঁশিভি হবে, লাঠিভি হবে।"

যাক্,—বুলাদার বা ছোটুয়ার কাছ থেকে বাঁশি আর পাওয়া যায় নি।

এই সময়ে আমরা বন্ধুর দল মিলে ছোট-খাটো অভিনয় করতাম। রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট', 'ডাকঘর'—এই সব আমরা অভিনয় করেছি। সে যে কী উত্তেজনা তা আর কি বলব।—দর্শকদের মধ্যে কোনো কোনো অভিভাবক আসতেন।—

একদিন অজিতদের উঠানে আমরা 'মুকুট' অভিনয় করছি,—আমার ছিল ইশাখাঁর ভূমিকা।—মুখে প্রকাণ্ড দাড়ী পরেছি, হঠাৎ অভিনয় করতে করতে দাড়ী গেল খুলে। দর্শকদল হেসে উঠল। আমি কি আর তাতে দমি! বাঁ হাতে দাড়ি ধরে' ডান হাতে আস্ফালন করতে করতে ভূমিকা শেষ করলাম। সবাই হাততালি দিল।—

যুবরাজ বেশে অজিতের মৃত্যু হোলো। যুবরাজ মরে' মাটিতে

শুয়ে পড়লেন।—ছেলের দল হাততালি দিয়ে বলে উঠল—"এন্‌কোর, এন্‌কোর।" দর্শকদের অনুরোধে মৃত-যুবরাজ আবার উঠ্‌লেন এবং আবার মরলেন।

একবার গিরিডি ব্রাহ্মসমাজের বৃদ্ধ আচার্য অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয় তাঁরই লেখা 'পুলিনের পরিণাম' নামে একটা নীতি-মূলক নাটক আমাদের দিয়ে অভিনয় করালেন। সেদিন বহু দর্শক জুটেছিল। একটা বিরাট অশত্থগাছের নীচে পর্দা টানিয়ে আমরা অভিনয় করেছিলাম।—এই নাটকে 'বোম্বেটে' বলে একটা শব্দ ছিল,—তাতে কোনো কোনো ব্রাহ্ম আপত্তি করেছিলেন।—

'ডাকঘর' অভিনয় করবার কিছু আগে পণ্টুর মা মারা গেছিলেন। পণ্টুই অমল সেজেছিল—। তার তখনকার মাতৃহারা বিষাদগ্রস্ত মূর্তি নিয়েই সে অমলের ভূমিকায় নেমেছিল। চমৎকার হয়েছিল তার অভিনয়। চেহারায় মানিয়েও ছিল ভালো।—

একদিন স্কুল থেকে ফিরবার সময় শুনলাম হাজারিবাগের কুখ্যাত ডাকাত 'গোপীয়া'কে মেরে কাছারিতে নিয়ে আসা হয়েছে। —ওরে বাস্‌রে, এই গোপীয়ার কথা আমরা অনেক শুনেছি। কত লোককে সে মেরেছে আর কত লোককে সর্বস্বান্ত করেছে। সেনাডুনির জঙ্গলে সে থাকত। তাই তার ভয়ে সন্ধ্যাবেলা কেউ ওপথে যেত না।—

তাকে ধরবার জন্যে গভর্ণমেণ্ট থেকে অনেক টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল।—

অবশেষে শুনলাম এই ভীষণ দুর্বৃত্তকে মেরে আনা হয়েছে।—

স্কুলের ছেলেরা বাড়ী ফিরবার পথে কাছারিতে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

দেখলাম সেখানে আগে থেকেই ভিড় জমে গেছে। কাছারির

প্রাঙ্গণে একটা খাটুলিতে বিরাট আকারের মৃত গোপীয়া পড়ে' আছে। তার রগে তলোয়ারের কোপের দাগ। রক্ত জমে আছে, আর মুখে গ্যাঁজলার চিহ্ন।

এই দৃশ্য দেখে বাড়ী এসে আর কিছু খেতে পারলাম না। বারেবারে ঐ বিভৎস চেহারাটার কথা মনে পড়তে লাগল। রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, গোপীয়ার সঙ্গে পুলিশের ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে,—কিছুতেই গোপীয়াকে ঘায়েল করা যাচ্ছেনা, বরং পুলিশই মরছে।

একদিন ক্লাসে হিমাংশুবাবু এসে বল্লেন "বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় গান গাইতে হবে। তোমরা কে কে গান গাইতে পার দাঁড়াও। আমি গান শেখাব।—"

কেউ আর দাঁড়াতে চায় না,—কারণ গাইয়ে বাজিয়ে সে রকম কেউ আমাদের ক্লাশে ছিল না।—

তবু হিমাংশুবাবু কয়েকজনকে বেছে নিলেন। নির্বাচিতের মধ্যে আমিও পড়লাম।

হিমাংশুবাবু আমাদের গান শেখান—

"তুমি কেমন করে' গান কর যে গুণী—"

আমরাও সাধ্যমত তাঁকে অনুসরণ করি।

শেষে সভায় আমাদের কয়েকজনকে গায়ক হিসাবে দাঁড়াতে হোলো।

আমি কোনো রকমে 'গণ্ডায় এণ্ডা' দিয়ে গেলাম। ভয়ে আর লজ্জায় গলা দিয়ে আর গান বেরুতে চাইল না।—

সেই সভায় বাবা এসেছিলেন। তিনি বল্লেন—"খুব গান গেয়েছিস্—এবার বাড়ী চল।"

এই সময়ে আমার ভীষণ রক্ত-আমাশয় হোলো। কত রকম ওষুধ খাই, কত টোট্‌কা পাঁচনের-ব্যবস্থা হোলো,—কিন্তু অসুখ সারবার নামই নাই।

জ্বর নাই, কিন্তু দিনের পর দিন রোগীর পথ্য খাচ্ছি,—আর

কিছুই ভালো লাগে না। বড়ই দুর্বল হয়ে পড়লাম। মাথা তুলতে পারি না।

একদিন এক বৃদ্ধ কবিরাজ এলেন দেবদূতের মতো—আর আমার পথ্যের ব্যবস্থা করলেন—খাঁটি গব্যঘৃতে ভাজা লুচি, আর রসগোল্লা।

আরে এও কি সম্ভব। আমার সঙ্গে বিদ্রূপ করছে নাকি! আমার মত মৃতকল্প রোগীকে দিচ্ছেন অমৃতের ভোগ।

বাঃ কবিরাজ মশাই—তুমি চিরকাল বেঁচে থাকো, আর আমার মত মুমূর্ষু রোগীকে পথ্য দাও—লুচি, মাংস, দই, সন্দেশ, রসগোল্লা। জিতা রও ব্যাটা।—

সত্যই সেদিন পথ্য পেলাম—গরম গরম লুচি আর রসগোল্লা।—

আমার অসুখ ক্রমেই ভালো হয়ে গেল।

—তেইশ—

একদিন সকালে মাষ্টারমশাইয়ের কাছে পড়ছি, এমন সময় দাদামশাই একখানি 'অমৃত বাজার পত্রিকা' হাতে নিয়ে আমার পড়ার ঘরে ঢুকলেন আর বল্লেন "ওরে, তোদের ইউ, রায় মারা গেছেন।"

এ কী কথা! এর থেকে মাথায় হঠাৎ একটা বাজ পড়লেও অতটা চম্‌কাতাম না। বুক্‌টা ছ্যাঁৎ করে' উঠল। অত গুণী লোক ইউ, রায় কি মরতে পারেন নাকি? এই ত সেদিন তিনি গিরিডি ঘুরে গেলেন। তাঁর বক্তৃতা, গান, গল্প সবই তো এখনো আমার কানে বাজছে। তাঁর সৌম্য গম্ভীর মূর্তি এখনো চোখে ভাসছে।

মাষ্টারমশাই জিজ্ঞাসা করলেন "কে ইউ, রায়, তোমাদের কোনো আত্মীয় নাকি?"

মনে মনে ভাবলাম, তুমি এই জ্ঞান নিয়ে আমাকে বিদ্যাদান করছ। ইউ, রায়ের নাম শোনো নি? আমার আত্মীয় কেন, তিনি যে সারা বাংলার, সারা বাঙালীর ছেলেমেয়েদের আত্মীয়।

মুখে বল্লাম "ইউ, রায় সন্দেশ পত্রিকার সম্পাদক।" মাষ্টার মশাই বল্লেন "সন্দেশ রসগোল্লা নামে আবার পত্রিকা আছে নাকি?"

মাষ্টারমশাইয়ের কথার কোনো উত্তর দিলাম না—তাঁর এত অল্প জ্ঞানের পরিধি দেখে স্তম্ভিত হলাম। তিনি গিরিডিতে ওকালতি করতেন—এবং একজন বিশেষ শিক্ষিত লোক।

ইউ, রায়ের মৃত্যুতে আমি বিশেষ বিচলিত হলাম। সন্দেশে তাঁর আর লেখাও পাব না, ছবিও দেখতে পাব না। সব যেন অন্ধকার হয়ে গেল।

যাকেই এই শোক সংবাদ দেই কেউই তেমন সাড়া দেয় না। বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ বলে "আহা, এমন লোকটা মারা গেল। 'সন্দেশ' বোধ হয় বন্ধ হয়ে যাবে।"

কিন্তু সন্দেশ বন্ধ হোলো না—তাঁর বড় ছেলে সুকুমার রায়ের সম্পাদনায় সন্দেশ রীতিমত আসতে লাগল।

পরের সংখ্যায় সন্দেশের প্রথম পৃষ্ঠায় দাদামশাইয়ের লেখা এই কবিতাটি প্রকাশিত হোলো—

"দিব্যকান্তি সুঠাম দেহ প্রাণ-ভরা প্রেম প্রীতি ও স্নেহ,
সঙ্গীত-কলা রসে ভোর,
বিদ্যা-বিনয় ভূষিত চিত্ত, গলাগলি করি শিল্প-সাহিত্য
মূর্তিমান উপেন্দ্রকিশোর।" ইত্যাদি

এই সংখ্যায় ইউ, রায়ের জীবনী প্রকাশিত হোলো। সেই সঙ্গে তাঁর নানা বয়সের ছবি দেখলাম, কখনো বেহালা বাজাচ্ছেন, কখনো ছবি আঁক্‌ছেন, ইত্যাদি।

এখন থেকে সন্দেশে U. R. এর ছবি কম দেখি, S. R. এর ছবি বেশী দেখা যায়।

S. R. হচ্ছেন সুকুমার রায়। তাঁর হাতে আঁকা সন্দেশের রঙীন মলাট দেখলাম,—একটা রঙীন পর্দা ছিঁড়ে একটি মেয়ের মুখ বার হয়েছে, মুখটি হাসি-হাসি।

আবার দেখলাম একটি বাঘের ছবির মলাট। ভিতরেও তাঁর রঙীন ছবি দেখতে পাই, একটা সেতুর নীচ দিয়ে জলের স্রোত বেগে ছুটে যাচ্ছে,—হনুমান সূর্যকে বগলে চাপতে যাচ্ছে,—বাঘের সঙ্গে বরাহের যুদ্ধ ইত্যাদি।

প্রতি সংখ্যাতেই ইউ, রায়ের অভাব অনুভব করি। তাঁর আঁকা বাল্মীকি, ত্রিপুর বিনাশ, বৃত্রাসুরের হাই, চামুণ্ডা, ইত্যাদি মন-মাতানো রঙীন ছবি আর কে আঁকবে?

এই সময়ে আমার চোখটা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। আগেই এখান থেকে চোখ পরীক্ষা করে' একটা চশমা নিয়েছিলাম। তাতেও আর ভালো দেখতে পাই না। কাজেই ভালো করে' চোখ পরীক্ষা করিয়ে চশমা নেবার জন্যে বাবা আমাকে কল্‌কাতায় পাঠালেন।

আমাদের মাষ্টারমশাই বামনদাসবাবু আমাকে নিয়ে কল্‌কাতায় এলেন।

আগেই বলেছি, কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার ছিলেন বামনদাস বাবুর দাদা। মাষ্টারমশাই আমাকে নিয়ে ভবানীপুরে তাঁর দাদার বাসায় উঠলেন।

বিজয়বাবুর লেখা কবিতা আমার খুব ভালো লাগত। তাঁকে দেখে প্রণাম করলাম। বামনদাসবাবু আমার পরিচয় দিলেন "মনোরঞ্জন বাবুর দৌহিত্র।" দেখলাম তিনি একেবারে অন্ধ। তাঁর এক আত্মীয়া তাঁকে সাহায্য করেন। তিনি মুখে মুখে কবিতা বলেন আর তিনি তাই লিখে যান্।

অদ্ভুত ক্ষমতা বলতে হবে।

চশমা নিয়ে গিরিডিতে ফিরে এলাম। স্কুলে এসে দেখি—নতুন হেড-মাষ্টার এসেছেন—নাম হরিদাস গোস্বামী।

হরিদাসবাবু কিছুদিন পরই আবার আসানসোল রেলওয়ে স্কুলে চলে গেলেন। এইবার আমাদের স্কুলে আবার নতুন হেড-মাষ্টার এলেন ইক্‌রা থেকে,—নাম তাঁর কেশব হাজারী। ইক্‌রায় তিনি অতি জনপ্রিয় হেডমাষ্টার ছিলেন। তাই তাঁর সঙ্গে ইক্‌রা স্কুলের অনেক ছেলেও এসে গিরিডি স্কুলে ভর্তি হোলো।

স্কুলে ছেলের সংখ্যা অসম্ভব রকম বেড়ে গেল, এবং ইক্‌রার ছেলেদের থাকবার জন্যে কয়েকটি বাড়ী ভাড়াও করতে হোলো।

নতুন নতুন বন্ধু পেয়ে আমাদেরও আনন্দের সীমা নাই,—আমাদের ক্লাশেই বেশী ছেলে ভর্তি হোলো—তখন আমি পড়ি তৃতীয় শ্রেণীতে (এখনকার Class—VIII)।

Six pious নামে আমরা একটা ফুটবল টিম্ করেছিলাম। আমি ছিলাম কাপ্তান। একদিন ইকরার ছেলেদের সঙ্গে আমরা একটা কাপ ম্যাচ্ খেল্‌লাম,—আর তাতে তিন গোলে জিতলাম।

সেই কাপ মাথায় করে' আমরা হল্লা করতে করতে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেছিলাম। সে কী উত্তেজনা।

এই নতুন হেডমাষ্টারটি ছিলেন বড়ই কড়া প্রকৃতির। তিনি চুপে চুপে সারাস্কুল ঘুরে বেড়াতেন আর মাষ্টারমশাইরা কে কেমন পড়াচ্ছেন তাই লক্ষ্য করতেন।

একদিন আমাদের ক্লাশে ঢুকে তিনি আমাদের সামনেই এক মাষ্টারের পড়াবার ভুল দেখিয়ে দিলেন। আমাদের সামনে এই ব্যাপারটা ঘটায়—মাষ্টারমশাই নিজেকে কিছুটা অপমানিত বোধ করলেন। আর হেডমাষ্টার চলে যাবার পর তিনিও ক্লাশ থেকে বেরিয়ে গেলেন মুখ গম্ভীর করে'। আমরাও বুঝলাম হেডমাষ্টারের এই কাজটা ভালো হয় নাই, তিনি তো আড়ালেই তাঁকে তাঁর পড়াবার ভুলটা ধরিয়ে দিতে পারতেন!

এই হেডমাষ্টার একটি গান রচনা করেছিলেন, আর তাঁর ইকরার ছেলেদের শিখিয়েছিলেন।

ছেলেরা গান গাইতে গাইতে রাস্তায় ঘুরত—

“সেইটি মোদের দেশ রে কাণা
সেইটি মোদের দেশ,
যেথা হাঁটুর উপর ময়লা কাপড়
লক্ষ লোকের বেশ—
কাণা সেইটি মোদের দেশ।” ইত্যাদি

তিনি একটু স্বদেশী ভাবাপন্ন ছিলেন আর নিজেও মোটা কাপড় জামা পরতেন।

কিছুদিন পর এই হেডমাষ্টারও অন্যত্র চলে গেলেন, আর তাঁর সঙ্গে অনেক ছেলেও আবার চলে গেল। গিরিডি স্কুল আবার কিছুটা ফাঁকা হয়ে গেল।

আমাদের ক্লাশে তুই সারিতে আমরা বস্‌তাম—এক সারিতে বাঙালী আর এক সারিতে অবাঙালী। যখন

হিমাংশুবাবু বাংলা পড়াতেন তখন অবাঙালী ছাত্ররা হিন্দী বা উর্দু ক্লাশে চলে যেত, আমরা বাঙালীরা ঐ ক্লাসেই থাকতাম।

একদিন হিমাংশুবাবু অসুস্থ হওয়ায় ক্লাসে এলেন না, তাঁর বদলে আমাদের বাংলা ক্লাসে এলেন একজন অবাঙালী। আমরা যাতে ক্লাসে হট্টগোল না করি এই জন্যেই তিনি আমাদের ক্লাসে শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্যে এলেন।

তিনি এসে শুধু চুপ্‌চাপ ক্লাসে বসে থাকবেন কেন, একটি ইংরাজী কবিতা থেকে খানিকটা অংশ আমাদের বাংলায় অনুবাদ করতে দিলেন।

"Under the green wood tree,
Who loves to lie with me,
And turn his merry note
Unto the sweet birds throat
Come hither, come hither, come hither."

আমরা আমাদের সাধ্যমত কবিতাটির বাংলা অনুবাদ করছি, এমন সময় আমার এক বন্ধু পাখী (অরুণচন্দ্র ঘোষ, দার্জিলিং পুলিশ ক্লাবের হেডক্লার্ক) উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে—"আমার হয়েছে স্যার।"

অবাঙালী মাষ্টারটি খুশি হয়ে বল্লেন—"পড়।"

পাখী গম্ভীর হয়ে যা পড়তে আরম্ভ করল—তার মধ্যে এই সব কথাগুলি ছিল "সতত সঞ্চারমান নব-জলধরপটল সংযোগ" ইত্যাদি।

শুনে আমরা তো অবাক্। এতো 'সীতার বনবাসে'র ভাষা।

অবাঙালী মাষ্টারের সঙ্গে একটু মজা করবার জন্যে সে এই ভাষা প্রয়োগ করেছিল।

আর একটি ছেলে কবিতায় এটি অনুবাদ করল—

সবুজ বুনো গাছের পাশে
মোর সঙ্গে শুতে কে ভালোবাসে,
পরন্তু তার প্রফুল্ল সুর
পাখীর কণ্ঠে ফিরে সুমধুর—
হেথায় এসো, হেথায় এসো, হেথায় এসো।

এটি শুনে মাষ্টারমশাই সোৎসাহে বল্লেন—"Excellent."

যাক্, আমাদের লেখাগুলিও তিনি শুনলেন, আর পরে হিন্দীতে যা মন্তব্য করলেন তা হচ্ছে,—পাখীর লেখাটাই সবচেয়ে ভালো হয়েছে, কারণ ওতে ভালো ভালো শব্দ আছে। ওর শব্দের উপর দখল আছে। তোমরা সবাই ভালো লিখেছ। পদ্যটিও চমৎকার হয়েছে।"

এই পাখী ছিল আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। স্কুলে যাবার পথে এইচ, বসুর বিরাট বাগান পড়ত। তাতে বড় বড় কামরাঙা গাছ ছিল।

একদিন পাখী কামরাঙা গাছে উঠে কামরাঙা পাড়ছে, আমরা নীচে দাঁড়িয়ে আছি—এমন সময় দেখি, কে একজন হন্তদন্ত হয়ে সেইদিকে তেড়ে আস্ছে। তাই দেখে আমরা তো গা ঢাকা দিলাম। সেই ভদ্রলোক গাছ-তলায় এসে প্রশ্ন করলেন, "গাছের উপর কে রে?" দূর থেকে তাকিয়ে দেখ্লাম তিনি স্বয়ং এইচ, বসু।

উপর থেকে উত্তর এলো, "আমি পাখী।"

বসু মশাই বল্লেন—"ইয়ারকির আর জায়গা পাওনা—শীগ্‌গির নামো গাছ থেকে।"

পাখী তর্‌তর্ করে' নীচে নেমে এসে বসু-মশাইকে বল্লে—"আজ্ঞে, আমার নাম পাখী, সত্যি কিনা সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।"

বিপদ কেটে গেছে জেনে আমরা তখন আবার কাছে এসেছি। ভদ্রলোক যখন জানলেন সত্যি তার নাম পাখী, তখন তার এই মজার নাম শুনে খুশি হয়ে তাকে কতকগুলো কামরাঙা দিলেন। আমরা সবাই তা ভাগ করে' খেলাম।

পচম্বা অঞ্চল থেকে ক্ষিতীশ নামে একটি ছেলে ঘোড়ায় চড়ে' স্কুলে আসত। মধ্যে মধ্যে বিকেলবেলা কিম্বা ছুটির দিন সে ঘোড়া নিয়ে আমাদের পাড়াতেও যেত।

ছোট্ট টাট্টু জাতীয় ঘোড়া, তার জিন্ লাগাম কিছুই ছিল না। কিন্তু ক্ষিতীশ ঐ ঘোড়া অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে ছোটাত।

পণ্টুর সঙ্গে পাখীর কি নিয়ে যেন অনেক দিন থেকে ঝগড়া চল্‌ছে। কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলে না। আমি অনেক চেষ্টা করেও তাদের মধ্যে মিলন ঘটাতে পারি নাই। পণ্টু প্রতিজ্ঞা করেছিল, "স্বয়ং মহাদেব এসে বল্লেও আমি ওর সঙ্গে কথা বলব না।" পাখীও দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেছিল, "স্বয়ং বিষ্ণু বল্লেও আমি ওর সঙ্গে কথা বলব না।"

একদিন বিকালের দিকে ক্ষিতীশ এলো তার টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে'। পণ্টুর বাড়ী ছিল আমাদের বাড়ীর খুব কাছেই। পাখী এসেছিল আমাদের বাড়ীতে। সে আমাদের বাড়ীর জানালা দিয়ে দেখল পণ্টু আমাদের মাঠে ক্ষিতীশের ঘোড়ায় চড়ে' খুব ঘুরপাক্ খাচ্ছে। ক্ষিতীশ কাছেই দাঁড়িয়ে আছে।

আমি আর পাখী এসে ক্ষিতীশকে বল্লাম—"আমরাও তোমার ঘোড়ায় চড়ব।" ক্ষিতীশ বল্লে—"বেশ তো চড়ো না।"

কিন্তু পণ্টু কিছুতেই আর ঘোড়া থেকে নামে না। তখন পাখী একটা লম্বা কাঠি নিয়ে ঘোড়াটার লেজের কাছে কি যেন কি করল, তারপরেই দেখা গেল ঘোড়াটা সোজা ছ'পায়ে খাড়া হয়ে গেছে—আর পণ্টু তার পিঠ থেকে হড়্‌কে নীচে পড়ে' যাচ্ছে।

নীচে পড়েই পণ্টু পাখীকে বল্লে—"রাস্কেল কোথাকার।"

পাখীও উত্তর দিল—"তুই রাস্কেল ইডিয়াট।"

অনেকদিন পর পাখী আর পণ্টুর মধ্যে কথা বিনিময় হোলো। মহাদেব আর বিষ্ণুর এসে অনুরোধ করতে হোলো না। এই সুযোগে আমি বল্লাম—"যখন দুজনের মধ্যে আবার কথাই সুরু হয়েছে তখন অবার ভাব জমে উঠুক।" ক্ষিতীশ বল্লে—"তার আগে কিছু মিষ্টি আনা হোক্। মিষ্টিমুখ করে' আবার নতুন জীবন সুরু হবে। আমি পয়সা দিচ্ছি।"

—চল্লিশ—

বার্ষিক পরীক্ষার আগে আমার ভীষণ পড়তে হোত। এদিকে বাবার ভয়ানক নজর ছিল। একটু ফাঁকি ধরতে পারলেই তিনি কড়া শাসন করতেন।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে আমাকে পরীক্ষার পড়া করতে হোত। ভিতরের একটি ঘরে আমি পড়াশোনা করতাম।

শীতকালের রাত্রে আমরা প্রায়ই ফ্যানাভাত খেতাম। মিষ্টি চালের ফ্যানাভাত তার সঙ্গে প্রচুর ঘি,—আর মিষ্টি-আলু ভাতে। এগুলি আমি খুব পছন্দ করতাম। পরে খেতাম বাটিভরা দুধ।

এই খেয়ে আমি রাত জেগে পড়তাম। শুন্‌তাম চামারপাড়া থেকে বাজ্‌না বাজ্‌ছে—

"লাকি তু লাকিদুম্
লাকি তু লাকিদুম্—"

মধ্যে মধ্যে মেয়েদের গান ভেসে আস্‌ছে—

"আমপাতা জাম্‌পাতা
চিহর লতা না—
আরে কেনে রে বোন্
কেনে বোনে ফুলা লিবি রে—"

কিম্বা শুন্‌তাম—

"একতো চিক্‌না পিপ্‌র্‌ কে পাতিয়া
দুস্‌রে চিক্‌না ঘি,—
ওহিসে চিক্‌না গরীয়ো যোবনয়া
ইয়ার কো লালচি জি।"

ঐ সব গান শুন্‌তে শুন্‌তে আমার চোখে ঢুল্ আসত,—কিন্তু বাবার ভয়ে ঘুমাতে পারতাম না।

পাশের খাটে ভাইরা নাক ডেকে অঘোরে ঘুমাচ্ছে, আমার ভারী লোভ হোত।

শেষে বাবা ডেকে বল্‌তেন—"এইবার ঘুমিয়ে পড়্। আবার খুব ভোরে উঠে পড়বি।"

আমি যেন বাঁচ্‌তাম। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তাম লেপমুড়ি দিয়ে। শুন্‌তাম চামারপাড়ায় বাজ্‌না বেজেই চলেছে—

"লাকি তু লাকিচুম্
লাকি তু লাকিচুম্।"

বাবা প্রায় শেষ রাত্রে ঘুম থেকে উঠতেন। উঠেই আমাকে জাগিয়ে দিতেন।

একদিন আমাকে জাগিয়ে বল্লেন, "ছাখ্‌তো কটা বেজেছে? ভোর হয়েছে বোধ হয়।"

আমি ঘড়ি দেখে বল্লাম—"ছুটো বেজে পাঁচ মিনিট।"

বাবা বল্লেন—"আবার শুয়ে পড়্, খুব ভোরে আবার উঠ্‌বি।"

এটা বাবার একটা বাতিক-বিশেষ ছিল। তিনি বল্‌তেন 'ছাত্রানাং অধ্যায়নঃ তপঃ।' ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা।

এই তপস্যা করতে করতে ভাবতাম কবে বড় হয়ে এই তপস্যামুক্ত হব। আর যে ভালো লাগে না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কতগুলি হাজেবাজে বই পড়ে' লাভ কি! যে অঙ্ক বোঝেনা তাকে অঙ্ক কষতেই হবে, যার সংস্কৃত ভালো লাগে না তাকে জোর করে' সংস্কৃত পড়তেই হবে। ইতিহাসে আমার রুচি নাই, তবু ইতিহাস আমাকে মুখস্থ কর্‌তেই হবে। কেন! কেন! কেন!

রাত জেগে বই কি আমি পড়ি নাই? অনেক পড়েছি, তা আমার মনের মত বই। অবনীন্দ্রনাথের 'ভূতপত্রীর দেশ' এক রাতে পড়ে' শেষ করেছি। তার ভাবের বন্যায় ভেসে চলেছি,—হুম্পাহুমার পাল্‌কী চড়ে' চলেছি সমুদ্রের দিকে। বেহারাগুলোর কালো কালো ছায়া পড়েছে সমুদ্রের সাদা সাদা বালুচরায়। বেহারাগুলিকে যেন বলছি—"এ আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তোমরা!" কত আনন্দ কত উন্মাদনা।

একরাতে শেষ করেছি কুলদারঞ্জনের রবিন্‌হুড্‌। রবিন্‌হুডের সঙ্গে চলে গেছি শেরউডের জঙ্গলে। দেখা হয়েছে লিট্‌ল্‌ জন, ফ্রায়ার-টাকের সঙ্গে।

রোমাঞ্চের পর রোমাঞ্চ। ঘুম কোথায় পিট্‌টান দিয়েছে।

রাত জেগে কত কবিতা লিখ্‌তে চেষ্টা করেছি, ছবি আঁক্‌তে চেষ্টা করেছি—কই ঘুমতো পায় নাই।

কিন্তু ইতিহাস পড়্‌তে ঘুম পায় কেন, হাই ওঠে কেন ভূগোল পড়্‌তে? জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে মাথা গরম হয়ে ওঠে কেন?

মনে ভাবি সব বাজে, কোনো রকমে স্কুলের গণ্ডী পার হতে পারলে' হয়। তারপর একবার দেখা যাবে কোথায় ইতিহাস, কোথায় ভূগোল, কোথায় জ্যামিতি আর কোথায় আমি।

কিন্তু এখনতো আর উপায় নাই। এদের সাধনা, এদের আরাধনা করতেই হবে।

তপস্যা করতেই হবে।

বার্ষিক পরীক্ষার আগে একদিন পচম্বার ক্ষিতীশ সাইকেল করে' হঠাৎ আমার কাছে এলো। আমাকে চুপে চুপে বল্লে, "আমাদের ইতিহাসের প্রশ্ন জান্‌তে পেরেছি। এই ত্যাখ্‌ প্রশ্ন।" এই বলে' সে পকেট থেকে বার করে' একটা কাগজ দেখালো। প্রশ্ন করলাম, "কি করে পেলিরে?"

ক্ষিতীশ উত্তর দিল—"আমাদের ইতিহাসের অবাঙালী মাষ্টার আজ আত্মহত্যা করবার জন্যে আফিং খেয়েছেন। তিনি অজ্ঞান হয়ে আছেন। বাড়ীতে ভীড় জমে গেছে। তাঁর বালিশের তলা থেকে এই প্রশ্ন-পত্রটা পাওয়া গেছে।"

আমি কৌতূহলের সঙ্গে কাগজটা দেখলাম—হাতের লেখায় কয়েকটি ইতিহাসের প্রশ্ন। আমাদের ক্লাশের জন্যেই মনে হোলো।

আফিং খেয়ে মাষ্টার মর্ছেন, তাতে আমাদের কোনো ক্ষোভ নাই। প্রশ্ন-পত্র পেয়ে আমরা উল্লসিত হয়ে উঠ্লাম।

ক্ষিতীশ আমাকে সাইকেলের পিছনে চড়িয়ে চল্ল বন্ধুদের বাড়ী প্রশ্ন-পত্রটা দেখাতে। সবাই খুশি প্রশ্ন-পত্র দেখে।

ইতিহাস পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে তেড়ে মুখস্থ করলাম উত্তরগুলো। প্রশ্নগুলো সবইতো আমাদের আগে থেকে জানা।

পরের দিন ইতিহাস পরীক্ষার সময় আমাদের তো চক্ষু চড়ক গাছ। একটা প্রশ্নও মিল্ছে না। সবই নতুন প্রশ্ন। হায় হায় এ কী হোলো!

কোনো রকমে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

মাষ্টারমশাইও আফিং খেয়ে মরলেন না, আমাদেরও মেরে গেলেন।

সত্যি, ইতিহাসের পরীক্ষাটা খারাপই দিলাম। ভেবেছিলাম জানা প্রশ্ন পেয়ে তর্‌তরিয়ে উত্তর লিখে যাব, তা না এ কী হোলো! সব থেকে বেশী মুষ্‌ড়ে পড়ল ক্ষিতীশ। সে সারারাত্রি জেগে কেবল ঐ প্রশ্নগুলির উত্তরই মুখস্থ করে' এসেছিল, আর বিশেষ কিছু পড়েনি।

সে বল্লে, "আচ্ছা ধাপ্পা দিল তো মাষ্টারমশাই।"

আমার জ্যাঠামশাই ললিতমোহন বসুঠাকুর ছিলেন ঢাকার জগন্নাথ কলেজিয়েট স্কুলের ড্রয়িং মাষ্টার। তিনি ছিলেন একজন উঁচুদরের শিল্পী।

তিনি সপরিবারে তীর্থ ভ্রমণ করে' ঢাকা যাবার পথে আমাদের বাড়ীতে এসে উঠ্লেন।

তিনি আমাদের সুন্দর বাড়ীখানাকে আরো সুন্দর করতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন।

আমাদের গেটের সাম্‌নের রাস্তার দুধারে তিনি নিজে হাতে অতি নিপুণভাবে—পরেশনাথ আর খাণ্ডুলী পাহাড়ের অনুকরণে

ছুটি ছোট পাহাড় তৈরি করলেন। খোয়া, সুরকী, চুন, সিমেণ্ট দিয়ে সেগুলি পাকাপোক্ত করে' দিলেন।

আমরা সেই পাহাড়ে উঠে খেলা করতাম। সেগুলি এত মজ্‌বুত ছিল, তা কিছুতেই ভাঙ্‌তো না। একেবারে পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছিল।

এই পাহাড়ের দুই দিকে ছিল গোলাপ বাগান। কত লোক আমাদের বাড়ী দেখ্‌তে আসত।

আমার বাইরের পড়ার ঘরের জানালায় একটি গোলাপ গাছ লতিয়ে উঠেছিল। আমি কায়দা করে' তার কয়েকটি ডাল জানালার ভিতর দিয়ে আমার পড়ার টেবিলের কাছে এনেছিলাম। তাতে তাজা গোলাপ ফুট্‌ত।

আমার কত বন্ধু টেবিলের কাছে গোলাপ ফুল ফুট্‌তে দেখে অবাক্ হয়েছে।

জ্যাঠামশাই আমাদের বাড়ীর এদিকে ওদিকে আরো অনেক উন্নতি করে' ঢাকা চলে গেলেন।

এরপরই আমরা জ্যাঠতুতো ভাইয়ের বিয়েতে ঢাকা গেলাম।

বিয়ে হোলো বরিশাল শহরে। ঢাকার থেকে ষ্টীমার করে' আমরা বরিশালে গেলাম বরযাত্রী হয়ে।

ষ্টীমার থেকে দেখলাম পদ্মা, মেঘ্‌না এবং ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম-স্থল। তিনটি নদী একসঙ্গে মিশেছে। চারিধারে থৈ থৈ করছে ক্ষুব্ধ জলরাশি। কোথাও কোনো কূলকিনারা নাই।

তখনো সমুদ্র দেখি নি—কিন্তু সমুদ্র সম্বন্ধে একটা ধারণা হোলো।

ঐ অনন্ত জলরাশির মধ্যে আমাদের জাহাজখানা মোচার খোলার মত অতি অসহায়ভাবে ভেসে চলেছে তার গন্তব্য পথে।

মনে হোলো টাইটেনিক জাহাজের কথা। যদি একবার টুপ্ করে' ডোবে—আর রক্ষা নাই।

আমাদের জাহাজের চাকার ঘূর্ণিতে বড় বড় ঢেউ উঠছে। আর সেই ঢেউয়ের ধাক্কায় আশে-পাশের জেলে ডিঙিগুলির অবস্থা হচ্ছে অতি শোচনীয়।

সাহস আছে বটে এই সব মাঝিদের। এরা যেন জলের মাছ। ঝড়জল কিছুই এরা পরোয়া করে না। দিব্বি ঢেউ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।

অমি সাঁতার জানি না। একবার জলে পড়লে, একটু যে বাঁচবার চেষ্টা করব—তারও উপায় নাই।

মনেমনে স্থির করলাম,—এবার গিরিডি গিয়ে পুকুরে সাঁতার শিখব।

পাখী, পণ্টু, প্রভাত, জ্যোতি সবাই সাঁতার জানে অথচ আমি জানি না।

তারা এজন্যে আমাকে ঠাট্টা করে। আমি গায়ে মাখি না। পূর্ববঙ্গে বাড়ী আমার—অথচ জল দেখ্‌লে আমার ভয় করে।

এসব দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত নির্ভয়ে পদ্মায় সাঁতার কাটছে।

জাহাজ থেকে দেখছি, খেলার ছলে তারা নদীতে ডিগবাজি খেয়ে পড়ছে, ডুব দিচ্ছে। জলের মধ্যে খেলা করছে, সাঁত্‌রে—আমাদের জাহাজ ধরতে আসছে। কেউতো ডুব্‌ছে না—কেউ তো ভয়ও পাচ্ছে না।

জ্যাঠতুতো দাদার বিয়েতে আমাদের সঙ্গে এক আত্মীয় গেছিলেন। তাঁর চেহারা ছিল বেজায় মোটা, অসম্ভব রকম মোটা। তাঁকে নিয়ে জাহাজেই এক ছড়া লিখ্‌লাম—

জাহাজেতে উঠে এলাম বরযাত্রী মোরা,
'মোটায়' দেখে হোলো সবার চক্ষু ছানাবড়া।

মোটা মানুষ দেখ্‌তে সবাই একধারেতে জোটে,
জাহাজ বুঝি কাৎ হয়ে যায় দারুণ ভীড়ের চোটে।

আমার এই আত্মীয়টি ছিলেন একজন ডেপুটি। তিনি পরে মারা যান।

কিছুদিন বরিশাল-ঢাকায় কাটিয়ে আবার গিরিডিতে ফিরে এলাম।

—পঁচিশ—

গিরিডিতে এসেই প্রথম স্থির করলাম সাঁতার শিখ্‌তে হবে।

একদিন দেখ্‌লাম পাখী আমাদের সঙ্গে বাজি ধরে' বারগণ্ডার একটা পুকুর লম্বালম্বি কুড়িবার পার হয়ে গেল।

সেইদিনই পাখীকে ধরলাম—"আমায় সাঁতার শিখিয়ে দে।"

পাখী বল্লে "সাঁতার শেখাতো খুব সোজা রে, কালই তোকে শিখিয়ে দেব। কাল ছুটি আছে, বেলা দশটায় অমুক পুকুরে আসিস্।"

পরদিন দল জুটিয়ে সাঁতার শিখ্‌তে গেলাম।—অনেকে এসেছিল। পাখী কোত্থেকে একটা কলাগাছ জোগাড় কর্‌ল—বল্লে "এটা ধরে' ভাসতে শেখ,—আর এইভাবে পা ছোঁড়্।"

আমি কলাগাছ ধরে' সাঁতার শিখছি, বন্ধুরা সাহায্য করছে। পাখী আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

চেষ্টা করতে করতে একবার পুকুরের অনেকখানি পর্যন্ত চলে গেলাম। পা ছোঁড়ার চোটে জলে তুমুল আলোড়ন হচ্ছে। আবার ফিরে ঘাটের দিকে আস্‌ছি—এমন সময় এক বন্ধু বল্লে, "ঐ তো ঘাটের সিঁড়ি, এবার কলাগাছ ছেড়ে দে। এখানে ডুব-জলও নাই।"

কলাগাছ ছেড়ে দিলাম। অমনি সঙ্গে সঙ্গে বুজ্‌ বুজ্‌ বুজ্‌। নাকে মুখে জল ঢুক্‌তে লাগ্‌ল। বাইরের দুনিয়াটা অদৃশ্য হয়ে গেল। কোথায় পাখী, পণ্টু, প্রভাত, অজিত। সব লোপ্, সব লোপাট্। আমার জ্ঞান লোপ পেয়ে যাচ্ছে,—কে যেন আমাকে জলের ভিতর থেকে টান্‌ছে। আমি তলিয়ে যাচ্ছি। আমার সব সত্তা হারিয়ে ফেলছি। আমার কোনো শক্তি নাই।

এমন সময় কে যেন আমাকে নীচের থেকে উপরের দিকে এক প্রচণ্ড ধাক্কা মারলো। আমি ঘাটের সিঁড়ির উপর আছ্‌ড়ে পড়্‌লাম।

বন্ধুদের ক্ষীণ কণ্ঠ কানে ভেসে উঠ্‌ল "উঃ, খুব বেঁচেছে।"

শান্তি রক্ষিত নামে আমার এক বন্ধু আমাকে এই ভাবে উদ্ধার করল।

কিছুক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলাম। বাড়ী ফিরবার সময় বল্লাম "তোরা বাড়ীতে কিছু বলিস্ না।"

এই হোলো আমার প্রথম সাঁতার শেখা। তখন থেকে পুকুর বা নদীকে দূর থেকে নমস্কার করে' চলি।

পাখী অভয় দেয় "ভয় করলে চল্‌বে কেন রে। আমরা অমন কত ডুবেছি। সাইকেল শিখ্‌তে গিয়ে কত হাত পা ভেঙেছে,—তা বলে' কি ঘাব্‌ড়ালে চলে।"

পাখীর কথায় ভরসা পাই। পুকুরের ঘাটে বসে ঘটি দিয়ে মাথায় জল ঢালি। শেষে ঘাটের কাছেই অল্প জলে একটু একটু সাঁতার শিখ্‌তে চেষ্টা করি। আজও আমার জলকে বড় ভয়।

এই সময় দাদামশাইরা কোডরমা, ঝুম্‌রিতিলাইয়াতে ছিলেন। আমার বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে গেছে,—তাই তিনি আমাকে ওখানে নেবার জন্যে লোক পাঠালেন।

যথাসময়ে আমি কোডরমায় এসে পৌঁছুলাম। বাস্‌রে, কী প্রচণ্ড শীত! গিরিডির শীতও কম নয়, কিন্তু এখানকার শীত আরো তীব্র, আরো রুক্ষ।

দাদামশাই আমাকে পেয়ে খুব খুশি হলেন। আমিও এই নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশের মধ্যে এসে খুব আনন্দ পেলাম।

ঝুম্‌রিতিলাইয়া তখন একেবারে ফাঁকা। আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে চলে গেছে হাজারীবাগ রোড। সাম্‌নে প্রকাণ্ড

মাঠ। এদিকে-ওদিকে তুই একখানা বাড়ী,—তারা সবাই বাঙালী। কেউ পোষ্টমাষ্টার, কেউ ষ্টেশন-মাষ্টার, কেউবা অন্য কিছু।

সকলের সঙ্গেই মামাদের আলাপ,—সবাই মিলে মিশে আছেন।

বাড়ীর সাম্‌নে প্রকাণ্ড মাঠটায় একদিন ফুটবল্ ম্যাচ্ হোলো,—দাড়ীওলা আর দাড়ীহীনদের সঙ্গে।

তখন ওখানে অনেক দাড়ীওলা লোক ছিলেন। আমার ছোট-মামারও বড় দাড়ী ছিল। আভরণবাবু নামে একজন ভদ্রলোক থাক্‌তেন আমাদের বাড়ীতে। তিনি দাড়ীহীনদের দলভারী দেখে উৎসাহের সঙ্গে নিজের দাড়ী কামিয়ে দাড়ীহীন হলেন।

ম্যাচে আমাকেও নেওয়া হয়েছিল দাড়ীহীনদের দলে। দাড়ীহীনরা দলেভারী—জিতলও তারা।

এই উপলক্ষে একদিন বিরাট ভোজের ব্যবস্থা হোলো।

মামাদের বাড়ীতে একটা ছোট-আকারের সাইকেল ছিল। আমার এক মামা ছিলেন খুব বেঁটে। এটি ছিল তাঁরই সাইকেল।

সেই সাইকেল নিয়ে প্রতিদিন সকালে-বিকালে আমি ঐ মাঠে চক্কোর দিতাম।

প্রকাণ্ড মাঠ, তার এক দিকটা ঢালু। একদিন সাইকেল ছুটিয়ে মাঠের এই ঢালু দিকটায় চলেছি মনের আনন্দে—গানও ধরেছি বোধ হয় একটা। হঠাৎ ছুটন্ত সাইকেল নিয়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়লাম একটা কাঁটা ঝোপের উপর।

হাত পা ছড়ে গেল, কাপড় ছিঁড়ে গেল। ঐ অবস্থায় বাড়ী এলাম।

আমার অবস্থা দেখে দাদামশাই আমাকে ধমক্ দিলেন, বল্লেন, "সাইকেল আর চড়বে না। বাপ-মা ছেড়ে এসে শেষে একটা কাণ্ড করে' বস আর কি, আর আমি তার জবাবদিহি দেই। তুরন্ত ছেলে কোথাকার।"

বড্ডই অভিমানী ছিলাম। ধমক্ খেয়ে কেঁদে দিলাম। মনে

মনে স্থির করলাম, কোডরমায় আর সাইকেল চড়ব না,—কক্ষনো না।

এখানে দিন আনন্দেই কাটে। বেজায় শীত। খাওয়া-দাওয়ার প্রচুর সুবিধা। দেহাতী লোকেরা বাড়ীতেই তরি-তরকারী বেচতে আসে। আচ্ছা করে' তেল মেখে ইঁদারায় স্নান করি। গেলাস গেলাস দুধ খাই, ক্ষীর খাই, পায়েস খাই।

মামীরা রাঁধতে ওস্তাদ। মেজমামীর হাতের রান্না পায়েস একবার খেলে আর ভোলা যায় না। মামীরা আমাকে খুব ভালোবাসেন। ভালো ভালো জিনিষ তৈরি করে খাওয়ান্। মামাতো ভাইরাও এখানে আছে। তাদের সঙ্গে খেলা করি, জঙ্গলে বেড়াতে যাই, কোডরমা ষ্টেশনে গিয়ে দেখি বোম্বাই মেল আস্‌ছে, গয়া প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে।

এখান থেকে দাদামশাই এক উৎসব উপলক্ষে কিছুদিনের জন্যে গয়া গেলেন। আমিও মামাদের সঙ্গে গয়ায় উপস্থিত হলাম। সেখানে নানান্ স্থানে বেড়ালাম। ব্রহ্মযোনি, আকাশগঙ্গা ইত্যাদি পাহাড়, বুদ্ধগয়ার মন্দির, বিষ্ণুর পাদপদ্ম প্রভৃতি বিখ্যাত স্থান, অক্ষয় বট, অন্তঃসলিলা ফল্গুনদী প্রভৃতি নানা দ্রষ্টব্য জায়গা দেখে আবার কোডরমায় ফিরে এলাম।

আনন্দের মধ্যেই ছুটিটা কেটে গেল। এবার স্কুল খুলবে, তাই একজন আমাকে আবার গিরিডি নিয়ে চল্ল। দুই মামা ষ্টেশনে এলেন আমাকে বিদায় দিতে।

চলন্ত ট্রেণের জানালা থেকে দেখলাম আমার দুই মামা সবুজ আলোয়ান গায়ে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন। ক্রমে তাঁদের আকার ছোট হয়ে আস্‌ছে—তারপর যেন শূন্যে মিলিয়ে গেলেন। আমার চোখ ফেটে জল এলো।

আবার স্কুল, নতুন ক্লাশ—এক ক্লাশ উঁচুতে উঠেছি।

স্কুলে এসে দেখলাম, আবার নতুন হেডমাষ্টার এসেছেন—নাম

মণিলাল সান্ন্যাল। রোগা চেহারা, মুখে চাপ দাড়ী, মাথায় বাব্ড়ী চুল, গায়ে উকীলের পোষাকের মত কালো আচ্কান আর পায়জামা। শুন্লাম ইনি ভারী বিদ্বান আর গুণী। সুন্দর সেতার বাজাতে পারেন।

আমাদের ক্লাশের সুশীল (সুশীলচন্দ্র মিত্র, ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানীর এজেন্ট) বল্লে, হেড্মাষ্টারমশাই তাদের দেশ কোন্নগরের লোক, তাঁর সঙ্গে তার আলাপ আছে।

সত্যিই তাই। তিনি আমাদের ক্লাশে ঢুকেই সুশীলকে চিন্তে পারলেন, আর তার সঙ্গে কথা বল্লেন।

এতদিন আমাদের স্কুলটা কল্কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। এইবার সেটা পাট্না-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এলো। এই বছরই পাট্না-বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হোলো।

আমাদের পাঠ্য-পুস্তকও ক্রমে ক্রমে বদ্লাতে লাগল—আর শেষ পর্যন্ত সবই বদ্লে গেল।

কল্কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আমাদের স্কুলে শেষ ম্যাট্রিক পরীক্ষা হোলো ১৯১৭ সালে। এই বছর কল্কাতায় কয়েকবার প্রশ্ন-পত্র ফাঁস হয়ে যায়।

নানান্ স্কুল থেকে যেমন মধুপুর, দেওঘর, জামতাড়া, ইকরা প্রভৃতি শহর থেকে ছেলেরা গিরিডি স্কুলে পরীক্ষা দিতে আসত।

আমরা দেখতাম নানান্ বয়সের, নানান্ আকারের ছেলেরা পরীক্ষার পর গিরিডির পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দলে দলে নদী, পাহাড়, ঝর্ণা এসব দেখতে চলেছে।

এদের মধ্যে বেশ বড় বড় ছেলেও থাকত। একটি মোটা মত ছেলেকে প্রায় প্রতি বছরই দেখতাম। সে আর কোনোমতেই যেন ম্যাট্রিক-পরীক্ষা সাগর পার হতে পারছে না।

ভাব্তাম কবে আমিও এদের মত ম্যাট্রিক-পরীক্ষা দিয়ে স্কুলের গণ্ডী ছাড়াব।

—ছাব্বিশ—

গিরিডি শহরটা দেখতে বড়ই সুন্দর। যে একবার দেখেছে সে আর কোনো দিনও ভুলতে পারে নাই। শুধু সুন্দরই নয় অত্যন্ত স্বাস্থ্যকরও বটে। তাই বহু রোগী হাওয়া বদলাতে এখানে আস্‌ত। এখানকার ইঁদারার জলকে বলা হোতো রসায়ণ (Tonic). অম্বলের রোগী শুধু ইঁদারায় জল খেয়ে ভালো হয়ে যেত। আমরা দেখেছি অনেক জীর্ণ-শীর্ণ লোক এই জল হাওয়ার গুণে স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে, রোগা লোক মোটা হয়ে ফিরে যাচ্ছে। কেউ বা স্বাস্থ্য ফেরাতে এসে এখানে স্থায়ী ভাবে থেকে গেছে।

শহরের একপ্রান্ত দিয়ে বয়ে চলেছে মাঝামাঝি আকারের পাহাড়ী উশ্রী নদী। তার দুই তীরে অসংখ্য শালের গাছ, মধ্যে মধ্যে অন্যান্য আরো গাছ, যেমন---অশোক, পলাশ প্রভৃতি।

এই উশ্রী নদী সম্বন্ধে হিমাংশু বাবু একটি গান লিখেছিলেন। তখনকার গিরিডির অনেকেই এই গানটি জানত—

"উশ্রী নদীর উঁচু ডাঙা, ঘন ঘন বাঁক্—
দুইটি তীরে কপাল ভাঙা, শিরে কাটা থাক্।" ইত্যাদি।

নদীর ওপারে এখানে সেখানে কয়েকটি নীল পাহাড় খৃষ্টান হিল, খাণ্ডলি প্রভৃতি। দূরে দেখা যায় ভাদুয়া পাহাড় আর পরেশনাথ।

নদীটি কিছু দূর গিয়ে একটা পাহাড় বেয়ে নীচে আছড়ে পড়ে' একটি চমৎকার ঝর্ণার সৃষ্টি করেছে। এখানে এলে 'উশ্রী প্রপাত' দেখতেই হবে।

এই উশ্রীকে আমরা কত বিভিন্ন রূপেই দেখেছি। গ্রীষ্মে দেখেছি তার জলহীন শুষ্করূপ। হয়ত একটি ক্ষীণ স্বচ্ছ ধারা নিয়ে শাদাধবধবে বালুরাশির মধ্যে দিয়ে সে কোনো রকমে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। অনেক সময় সেটা লাফিয়েও পার হওয়া

চলে, কিম্বা মাত্র গোড়ালি ভিজিয়ে জলের মধ্যে দিয়েও যাওয়া যায়।

কিন্তু বর্ষায় সে যেন হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে। তার শুষ্ক রুক্ষ বুকে নেমে আসে ঘোলা জলের ঢল্। আর সেই জল দুরন্ত বেগে ঘুরপাক্ খেতে খেতে ছুটে চলে দুর্বার গতিতে। ওঃ সে সময় কী তার গর্জন! অতিবড় সাঁতারুও তার জলে নাম্‌তে সাহস করে না।

এই সময়ে ওপারের সঙ্গে এপারের সম্পর্ক যায় ঘুচে। একটি মাত্র বন্ধন তারের ঝোলা পুল। তারও অন্তিম দশা আমরা দেখেছি। বন্যার সময় তাতে উঠলে মাথা ঘুরে যায়।

তবুও বর্ষার সময় কিছুটা সংস্কার করে' তাতে লোক চলাচলের ব্যবস্থা হয় পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। দেহাতী নিরুপায় নর নারী তাতেই এপার ওপার যাওয়া আসা করে।

তা ছাড়া, আর একটি সংযোগ হচ্ছে রেলের পুল, সেটা শহর থেকে অনেক দূরে।

বর্ষা ছাড়া অন্যসময় উশ্রীর চড়ায় শিশুরা বালু নিয়ে খেলা করে, বালকেরা উঁচু উঁচু বালিয়াড়ী থেকে লাফালাফি করে, যুবকেরা ঘুরে বেড়ায়, বৃদ্ধেরা বসে জট্‌লা করে। নানান্ বয়সী মেয়েরাও দল বেঁধে বেড়াতে আসে। বহু রাত্রি পর্যন্ত যেন এখানে চাঁদের হাট বসে।

উশ্রী নদী যেন সকলের একটা প্রকাণ্ড আকর্ষণ। একদিন উশ্রী নদীতে না গেলে যেন আমাদের ভাত হজম হয় না।

আর ওপারের ঐ 'খৃষ্টান হিল্' পাহাড়, তার কথাই বা আর কি বলব। তিনশত ফুট উঁচু পাহাড়টি যেন আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার প্রতিটি পাথর যেন আমাদের চেনা।

আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় পাহাড়টি নদীর ওপারে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে নদীর এপারেই তার অবস্থান।

উশ্রী নদীটি একটি প্রকাণ্ড বাঁক খেয়ে ঐ পাহাড়টির ধার দিয়ে পশ্চিম দিকে ঘুরে গেছে। কিন্তু নতুন লোক বুঝতেই পারে না যে ওটি এপারে। তারা নদী পার হয়ে পাহাড়ে যেতে চায়, শেষে কাছে এসে তাদের ভুল ভাঙে।

নদীর পারে ঐ ঝোলানো পুলটির কাছে একটি আমলকী বন আছে। সে জায়গাটা আমার খুব প্রিয়।

কতদিন একলা এসে চুপচাপ ঐ আমলকী বনে বসে থাক্‌তাম। এলোমেলো বাতাসে শুক্‌নো পাতা মাথায় ঝরে' পড়ত। কোনো কোনো দিন বন্ধু পাখীও আমার সঙ্গে আস্‌ত। আমাদের কাছে খাতা-পেন্‌সিল থাক্‌ত। কবিতা গল্প লিখতে বসতাম নিরিবিলি। বড় ভালো লাগত।

সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফিরতাম কারণ মাষ্টার আসবেন।

আমাদের বাড়ীতে প্রায় সব সময়েই কতগুলি বড় বড় দেশী কুকুর থাক্‌ত। তারা বাড়ী পাহাড়া দিত। নতুন কারুকে দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে' তেড়ে যেত, পুরাতন মুখ দেখলে কিছু বলত না।

আমাদের পাড়ায় একজন বৃদ্ধা ছিলেন,—তাঁকে সবাই নানিমা বলে ডাকতাম। একদিন তিনি কি যেন কাজে আমাদের বাড়ীতে এসেছেন, আর আমাদের বাঘের মত কুকুরগুলি তাঁর দিকে তেড়ে গেল।

তিনি আতঙ্কে চিৎকার করে' উঠলেন। কুকুরগুলো তাঁর গায়ের কাপড়-চোপড় আঁচ্‌ড়ে কাম্‌ড়ে ছিঁড়ে দিল,—তিনি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ছুটে পালালেন। আর তিনি কুকুরের ভয়ে আমাদের বাড়ী আস্‌তেন না। অথচ এর আগে কতদিন তিনি আমাদের বাড়ীতে এসেছেন,—কুকুরগুলি তাঁকে কিছুই বলে নি। এটা কেন যে হোলো বলতে পারি না।

এর কিছুদিন পর আমাদের একটা কুকুর পাগল হয়ে গেল।

শেষে আমাদের পাড়ার এক ভদ্রলোক বন্দুক দিয়ে তাকে মেরে ফেল্লেন।

বড়ই কষ্ট হোলো তার জন্যে। আমাদের জানাশোনা পোষা কুকুরটা এইভাবে শেষ হয়ে গেল। বন্দুকের দুটি গুলি খেয়ে রক্তে তার শরীরটা ভেসে গেল, আর মৃত্যুর আগে তার সে কী আকুল আর্তনাদ।

এই সময়ে বাবা একটা হরিণ নিয়ে এলেন পুষবার জন্যে। আমাদের পিছনের বাগানে হরিণটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হোত। ক্রমে তার মস্ত শিং গজালো, কিন্তু বিশেষ পোষ মান্‌লো না। আমরা কাছে যেতে সাহস করতাম না।

একদিন দড়ি ছিঁড়ে হরিণটা পালালো। রাস্তায় অনেককে সে জখম করল। ভি, রায় নামে একজন বিশিষ্ট বৃদ্ধ ব্রাহ্ম ভদ্রলোক ছিলেন,—তাঁর বাড়ীর নিজের রিক্‌সায় তিনি ঘুরে বেড়াতেন। পলাতক হরিণটার আক্রমণে তিনি রিক্‌সার থেকে পাশের নর্দমায় পড়ে' গেলেন।

শেষে অনেক কষ্টে হরিণটাকে ধরে' আবার বাড়ীতে নিয়ে আসা হোলো,—এরপর বাবা হরিণটা একজনকে দান করে' দিলেন।

জ্যাঠামশাই আমাদের বাড়ীতে দুটি বড় জাঙ্গিল পাখী পুষেছিলেন। জাঙ্গিল পাখী বক জাতীয় পাখী, আকারে আরো বড় আর গায়ে কাল্‌চে রং। পাখী দুটি বেশ পোষ মেনেছিল। তারা বাগানে ছাড়া অবস্থায় থাকত। কখনো শূন্যে উড়ে চলে যেত, আবার ঠিক সময়ে ফিরে আসত।

একদিন তারাও উড়ে চলে গেল আর ফিরে এলো না। আর তাদের দেখা পাই নি।

বড় বড় মুলতানী আর ভাগলপুরী গরু আমাদের ছিল। তারা প্রচুর দুধ দিত। তাদের খাওয়ানোও হোত যথেষ্ট ভালো

জিনিষ। যুবরাজ নামে আমাদের একজন চাকর ।,—সে গরুগুলির তদারক করত।

গরুগুলির জন্যে খড়্, ভুসি, মহুয়া, ডালের খোসা ছাড়াও তাদের পেট ভরে' গুড়ের জল আর খিচুরী খাওয়ানো হোত।

সেটা একটা দেখবার জিনিষ ছিল। সকালে আর বিকালে লেখোয়া নামে এক গোয়ালা তাদের দুধ দুইত।

আমাদের বাড়ীতে এত দুধ হোতো যে আমরা খেয়ে কুলাতে পারতাম না। অনেক বাড়ীতেই সেই দুধ বিলি করা হোত। আমাদের বাড়ীর দুধ বারগণ্ডা অঞ্চলের অনেকেই খেয়েছেন, আর সন্তুষ্ট হয়েছেন।

শীতকালে আমাদের বাগানে প্রচুর বাঁধাকপি হোত,—তাও নানান্ বাড়ীতে বিলি করা হোত। তাছাড়া সিম, লাউ, কুমড়ো যে কত বিলি করা হয়েছে তার আর ঠিক্ ঠিকানা নাই।

একবার আমাদের ইঁদারার কাছের বাগানটায় কাটোয়ার ডাঁটার বীজ পোঁতা হোলো।

তাতে এত ডাঁটা হোলো যে দেখলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। যেন ডাঁটার জঙ্গল। সে ডাঁটা যেমনি মোটা তেম্‌নি মিঠে।

আমাদের বাড়ীর ডাঁটা নিতে পাড়ার বহু লোক আসত। প্রত্যেককেই ডাঁটা দেওয়া হোত কিন্তু তবুও যেন ফুরোবার নাম নাই।

আমার মা অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা সদয়-হৃদয়া মহিলা ছিলেন। আমাদের বাগানের এই সব ফসল তিনি নিজে আগ্রহ করে' অনেক সময় আমাদের দিয়ে বাড়ী বাড়ী পাঠাতেন। দুধও আমরা বালতি ভর্তি করে' নিয়ে অনেক বাড়ীতে দিয়ে আসতাম।

শুধু তাই নয়, তিনি কত দুঃস্থ পরিবারকে টাকা পাঠিয়ে

সাহায্য করেছেন,—অর্থ দিয়ে কত দুঃখী-পরিবারে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন, অসুস্থদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন, স্বেচ্ছায় কত ছেলেমেয়েদের স্কুলের বেতনের পাকা বন্দোবস্ত করেছেন।

বেশ মনে পড়ে, একটি গরীব-ছেলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে যেত। তার টিফিনের সময়, মা আমাকে দিয়ে তার জন্যে লুচি হালুয়া, সন্দেশ, দুধ প্রভৃতি পাঠাতেন।

আমার মায়ের অন্তঃকরণের বুঝি আর তুলনা হয় না।

—সাতাশ—

এত ঐশ্বর্যের মধ্যে আমরা মানুষ হয়েছি কিন্তু আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল অতি সাদাসিধে ধরণের। বাবা বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতেন না। দাদামশাইয়ের লেখা—

"মোটা ভাত, মোটা কাপড়
স্বস্থ দেহ, শুদ্ধ মন,
সকল রকম সুখ শান্তির
এই চারিটি মূলধন।"

এই মূলধনই ছিল আমাদের সম্বল। মোটা জামা কাপড় পরতাম, জুতোর সঙ্গে কোনো সম্পর্কই ছিল না। কোথাও নিমন্ত্রণ হলে জুতোর খোঁজ পড়ত। তখন মাকড়সার জালে ভরা রং-চটা জুতো খুঁজে বার করতাম। অবশ্য তখনকার দিনে আমাদের বয়সী কারুকেই আমি জুতো পরতে দেখিনি। সেটাই ছিল তখনকার গিরিডির রেওয়াজ।

একদিন মেজমামা (নিত্যরঞ্জন গুহঠাকুরতা) আমাকে একজোড়া জুতো উপহার দিলেন। নতুন 'ডার্বি স্যু'। সেই জুতো আমাদের এক কর্মচারীর পায়ে ঠিক ঠিক খাপ্ খাওয়ায় আমি অম্লানবদনে জুতো জোড়া তাঁকেই দিয়ে দিলাম। একদিনও পায়ে দিলাম না।

আমাদের পোষাকের দিকে বাবার খেয়ালই ছিল না। মনে পড়ে যেদিন প্রথম স্কুলে যাই, গেছিলাম খালি পায়ে, আর একটা ছেঁড়া খাকী-সার্টের উপরে একটা লাল-নীল চৌখুপি চাদর গায়ে। মাথার চুলও বোধহয় ঠিক মত আঁচড়ানো ছিল না। আসল কথা এই সাজ-পোষাকের দিকে কারুরই নজর ছিল না— না আমাদের না অভিভাবকদের।

তবে খাওয়া-দাওয়াটা ভালো আর মনের মত না হলে বিরক্ত হতাম। পাত্‌লা দুধ, পাত্‌লা ডাল দেখলে চটে উঠ্‌তাম।

মা বল্‌তেন—"সব রকম খাওয়াই অভ্যাস করতে হয়।"

তবে আমাদের দেহের ও মনের স্বাস্থ্যের দিকে বাবার প্রখর দৃষ্টি ছিল। শরীর ভালো করবার জন্যে বাবা আমাদের Ring, Parallel Bar প্রভৃতি করে' দিয়েছিলেন। সর্বদাই দৃষ্টি রাখতেন কোনো খারাপ দলের সঙ্গে মিশ্‌ছি কি না। অবাধ্যতা বা গুরুজনদের অসম্মান কখনো করতে জানতাম না। মিথ্যা কথা বল্‌লে মা-বাবা ভীষণ চটে যেতেন, আর হঠাৎ কোনো অন্যায় কাজ করে' ফেল্লে আমাদের ক্ষমা চাইতে হোত। বেশী বয়স পর্যন্ত বাবা আমাকে চা খেতে দেন নি। ওতে নাকি শরীর নষ্ট হয়। আমিও চা খেতে সাহস করতাম না।

মোটকথা সবদিক দিয়ে যাতে আমাদের চরিত্রের উন্নতি হয় বাবা তার চেষ্টা করতেন। তবে বাবুগিরি করতে দিতেন না, আর আমরাও তা জান্‌তাম না।

কাজেই শৈশবে আমরা ঠিক প্রকৃতির মধ্যেই মানুষ হয়েছি। মাটির সঙ্গে আমাদের ছিল নিবিড় সম্পর্ক। বৃষ্টির দিনে খালি মাথায়, ভিজে জামা-কাপড়ে কত যে বেড়িয়েছি তার আর ঠিক ঠিকানা নাই। দেখলেও বাবা মানা করতেন না। গিরিডির প্রচণ্ড গ্রীষ্মে দুপুর বেলা যখন দুরন্ত 'লু' বাতাস বইছে তখনো বিনা ছাতায় বার হয়েছি এখানে ওখানে।

শরীরের নাম মহাশয়—
যা সহাবে তাই সয়।

এটাই আমরা বুঝতাম। তখন অসুখ-বিসুখের ধারও ধারতাম না।

দারুণ-শীতে লোকে যখন ওভার কোট, জুতো-মোজা, মাফলার পরে' হি হি করে' কাঁপছে—আমরা তখনও খালি পায়ে, গায়ে শুধু

একটা চাদর জড়িয়ে শিশির-ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে বেমালুম হাঁট্‌ছি। সরস্বতী পূজোর সময় মাঘ-মাসের শীতের মধ্যে ফুল আন্‌তে, শরকাঠি ভাঙ্‌তে শেষরাত্রে নদী পেরিয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে কোথায় কোথায় চলে যেতাম, আজকালকার ছেলেরা তা ধারণাও করতে পারবে না।

এর জন্যে কোনো অসুবিধা বোধ করতাম না। বরং আনন্দেই প্রাণ ভরপুর হোত।

দাদামশাইরা কোডরমা থেকে ফিরে কিছুদিন পর সবাই পুরীতে গেলেন। এই সময়ে আমার মেজভাই সুবিমল বারে বারে জ্বরে ভুগছিল, তাই মা আমার ভাইকে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে পুরীতে গেলেন; সঙ্গে আমার ছোটভাই আর বোনেরাও গেল। বাড়ীতে কেবল রইলাম আমি আমার সেজভাই সুকোমল, আর রইলেন বাবা।

আমার পুরী যাবার বেজায় ইচ্ছা ছিল। শুনেছিলাম পুরীর সমুদ্র ভারি চমৎকার, ক্রমাগত তার ঢেউগুলি ভীষণ গর্জন করতে করতে আছ্‌ড়ে পড়ছে বালু-তটে। সমুদ্র কখনো দেখি নি। কিন্তু পুরী যাবার কথা বাবাকে বল্‌তে আমার সাহস হয় না।

তখন আমি 2nd classএ (বর্তমান Class IX) পড়ি। পরের বছরই ম্যাট্রিক দেব। কাজেই আমার সেজভাইকে বল্লাম, "বাবাকে বল্, যদি আমাদের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সমুদ্র সম্বন্ধে essay আসে, তবে বড়ই মুশ্‌কিলে পড়ব। সমুদ্রটা নিজের চোখে একবার দেখা উচিত। এখন মা প্রভৃতি পুরীতে আছেন, এই একটা মহা সুযোগ।"

আমার কথামত সুকোমল বাবাকে আমার আবেদন জানালো। বাবা বল্লেন, "যাঃ যাঃ, যত সব বাজে আব্‌দার। সমুদ্র নিজের চোখে না দেখলেও তার সম্বন্ধে দিব্যি essay লেখা

যায়। হিমালয় পাহাড় না দেখেও তার সম্বন্ধে আমি ভালো essay লিখেছিলাম। তোর দাদাকে ওসব হুজুক ছেড়ে ভালো করে' পড়তে বল্।"

বাবার কথায় মন দমে গেল। নিরাশ হয়ে গেলাম। কিন্তু ভগবান আমার এই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে' দিলেন।

বাবারই হঠাৎ পুরী যাবার প্রয়োজন হোলো। তিনি আমাকে আর সুকোমলকে নিয়ে পুরী রওয়ানা হলেন। আমার মনের বাসনা এভাবে সার্থক হবে ধারণাও করতে পারি নি।

গিরিডির বাড়ীতে তখন আমাদের ঠাকুরের নাম ছিল রাজকুমার তেওয়ারী, আর চাকরের নাম ছিল যুবরাজ। সে সময় এক কবিরাজও আমাদের বাড়ীতে থাকৃতেন। কবিরাজমশাই আর দুই রাজকুমারের উপর আমাদের বাড়ীর ভার দিয়ে বাবা আমাদের নিয়ে সেই সমুদ্রের দেশ পুরী রওয়ানা হলেন।

কল্‌কাতায় একদিন থেকে আমরা পরদিন সকালে পুরী এসে পৌঁছালাম।

ভেবেছিলাম ষ্টেশনে নেমেই সমুদ্রের দর্শন পাব। তাই ট্রেণ থেকে নেমেই চারিধারে তাকাতে লাগলাম,—দূরের আকাশটাকে সমুদ্র কল্পনা করে' বিস্ময়ে অভিভূত হলাম। জানতাম সমুদ্র আর আকাশের মধ্যে কোনো ব্যবধান দেখা যায় না। কোথায় আকাশ শেষ হয়েছে আর সমুদ্র আরম্ভ হয়েছে কিছুই বোঝা যায় না। দুইয়ের বর্ণই নীল। কাজেই দিগন্তের আকাশকেই সমুদ্র কল্পনা করলাম। মনে হোলো সমুদ্র আজ বড় শান্ত, কোনো ঢেউ নেই, কোনো উচ্ছ্বাস নেই।

রামচণ্ডী সাই লেনে দাদামশাইরা উঠেছিলেন। সেখানে এসেই দেখি মা প্রকাণ্ড এক কড়াই দুধ জ্বাল দিচ্ছেন। মা আমাদের দেখেইতো অবাক্। আমরা যে পুরী আস্‌ছি, তা তিনি

জান্‌তেন না। আমাকে ও সুকোমলকে দেখে মা বেজায় খুশি হলেন।

এ বাড়ী থেকে সমুদ্র অনেক দূর। কাজেই ঠিক হোলো বিকালে আমরা হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে সমুদ্র-তীরে যাব।

বিকালের দিকে সমুদ্রতীরে এলাম। এই কি সমুদ্র নাকি? সকালে যা দেখেছি তা যে একদম ভুল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ ক্রমাগত তীরে আছ্‌ড়ে পড়্‌ছে গর্জন করতে করতে। তার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। এক একটা ঢেউ আছ্‌ড়ে পড়ে' বালুতটের অনেকখানি অংশ ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। যত দূর চোখ যায় খালি নীল জল, কিন্তু দূরের সমুদ্র শান্ত বলেই মনে হচ্ছে। যত আবেগ উচ্ছ্বাস তীরের দিকে।

এর মধ্যেই দেখলাম অনেকে স্নান করছে নুলিয়াদের সাহায্যে। তাদের মধ্যে পুরুষ মেয়ে সবই আছে। ঢেউয়ের তোড়ে কেউ আছাড়্‌ খাচ্ছে, কেউ ডিগবাজী খাচ্ছে—ভারী মজার দৃশ্য।

এক-দৃষ্টে সমুদ্র দেখছি। সুকোমল বল্লে, "এবার সমুদ্র সম্বন্ধে essay এলে একেবারে first। আর কে তোমাকে মারে।"

সত্যি, সমুদ্র অতি আশ্চর্য জিনিষ, এই দৃশ্য না দেখলে যেন জীবনই বৃথা।

আমাদের রামচণ্ডী সাই লেনের বাড়ী থেকে সমুদ্র ছিল অনেকটা পথ। তবুও প্রায় প্রতিদিনই সমুদ্রতীরে বেড়াতে আস্‌তাম, কখনো সকালে, কখনো সন্ধ্যায়। বড় ভালো লাগত। আকাশের রঙের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জলেরও পরিবর্তন ঘট্‌ত। সমুদ্রের নীলাভ জল কখনো লাল্‌চে আভা ধারণ করত, কখনো বেগুনে কখনো বা ঘোর কৃষ্ণ-বর্ণ। এক একদিন দেখতাম—সমুদ্র বড়ই উদ্বেল, বড়ই অশান্ত, চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বড় বড় উত্তাল ঢেউ সগর্জনে তীরে এসে ভেঙে পড়ছে। ভয় করত, তবু ভালো লাগত।

সমুদ্রের তীরে বেড়াতে বেড়াতে দেখতাম—এক এক জায়গায় —ছোট ছোট কাঁকড়ার ভীড়, কত শামুক, ঝিনুক, গেঁড়ি পড়ে' আছে,—একদিন দেখলাম—কয়েকটি লেজ-চেপ্‌টা ছোট জাতীয় সাপ সমুদ্র-তীরে পড়ে আছে। বুঝ্‌লাম, এরা সমুদ্রের সাপ। সাঁতার দিতে সুবিধা হয় বলে এদের লেজগুলি চেপ্‌টা।

একদিন বিকেলে সাগরতীরে বেড়াচ্ছি—সেদিন সমুদ্র খুব অশান্ত—বড় বড় ঢেউ সশব্দে এসে তীরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে—দেখলাম একটি বেশ নাতুস-নুতুস্ মোটা ছেলে জুতো মোজা পড়ে' তার বাবা মার সঙ্গে সমুদ্র-তীরে বেড়াতে এসেছে।

সমুদ্রের ভেঙে-পড়া ঢেউগুলি দেখে সে বেশ নিরাপদ স্থান থেকেই তাদের দিকে ঘুঁষি বাগিয়ে আস্ফালন করছে—অর্থাৎ দূর থেকে সমুদ্রের ঢেউগুলিকে যেন শাসাচ্ছে—খবরদার,—এদিকে এলেই এক-ঘুঁষিতে কাবু করে' ফেলব।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটি প্রকাণ্ড ঢেউ ভয়ঙ্কর বেগে এসে তীরে আছ্‌ড়ে পড়ল। আমরা যেখানে বেড়াচ্ছিলাম, ঢেউয়ের তোড়ে সে জায়গাটা জলে ভেসে গেল, আর সেই আস্ফালনকারী মোটা ছেলেটা ভীষণ ভয় পেয়ে সামনে আমাকে দেখে সবলে জড়িয়ে ধরলো। টাল্ সাম্‌লাতে না পেরে তাকে নিয়ে আমি একটা ডিগবাজি খেলাম। আমাদের নাকে মুখে খানিকটা নোনা জল ঢুক্‌লো—কাপড় জামা ভিজে গেল,—আর সেই মোটা ছেলেটার জুতো, মোজা, প্যাণ্ট্‌ সব ভিজে এক্‌সা। তারপর তার সে কী আকুল কান্না।

তার বাবা দৌড়ে এসে তাকে তুলে নিয়ে গেলেন। আমি তাকিয়ে দেখি সেই বীর-পুঙ্গব তখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছে—আর সমুদ্রের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তাকে গালাগাল করছে।

সমুদ্র দেখে একটা ছোট্ট কবিতা লিখেছিলাম,—কয়েকটি লাইন মনে আছে—

হে সমুদ্র
তুমি, বড়ই রুদ্র।
তোমার কাছেতে
মোরা যে ক্ষুদ্র। ইত্যাদি।

পুরীর অনেক পুণ্য-স্থান দেখলাম, জগন্নাথের মন্দির, জটিয়া বাবার সমাধি-মন্দির, আঠারো নালা, বিমলা দেবীর মন্দির, সাক্ষীগোপাল, মাসীবাড়ী, সিদ্ধ-বকুল, চন্দন-সরোবর, সোনার গৌরাঙ্গের মন্দির প্রভৃতি দর্শন হোলো। ইচ্ছা ছিল একবার ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখে আসি। কিন্তু যাওয়া হোলো না,—ছেলে মানুষ, এক্‌লা তো আর যেতে পারি না।

এখানে এসে আমার মেজভাইয়ের স্বাস্থ্য বেশ ভালো হোলো,—তার জ্বর ছেড়ে গেল।

পুরীতে পড়াশুনা কিছুই করিনা যদিও পড়ার বই সঙ্গে এনেছিলাম।

আমার ছোটমামা (দেবরঞ্জন গুহঠাকুরতা) আর এক মাসতুত ভাই (সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের বোটানির অধ্যাপক সুকুমার ঘোষ)—আমার থেকে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। তাঁদের সঙ্গেই এখানে-সেখানে ঘুরতাম। একদিন তুপুর বেলা এক উড়িয়া পল্লীতে গিয়ে ঢুক্‌লাম।—সেখানে গিয়ে গ্রাম্য-মেয়েদের গান শুনলাম।—গানের পদগুলি কিছু কিছু বুঝতে পারলাম, অনেকটা বাংলাগানের মতই। সঙ্গে একটি পুরুষ সারাঙ্গীর মত কি একটা যন্ত্র বাজাচ্ছিল, আর একজন ঢোলক্ বাজাচ্ছিল। শুনতে বেশ চমৎকার লাগছিল।

একদিন ছোটমামা আর আমার মাসতুতো ভাই ভুবনেশ্বর বেড়াতে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে যেতে আমার খুব ইচ্ছা

হয়েছিল—কিন্তু বাবা যেতে দিলেন না। পুরী থেকে খুব কাছেই, ট্রেণে করে' যেতে হয়। শুনেছিলাম ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখতে খুব সুন্দর,—'সন্দেশে'ও তার কথা পড়েছিলাম ও ছবি দেখেছিলাম। যাক্, এ যাত্রা আর তা দেখা হোলো না। মন্‌টা খারাপই হয়ে গেল।

প্রায় মাসখানেক পুরীতে কাটিয়ে আমরা আবার গিরিডিতে ফিরে এলাম।

—আটাশ—

একদিন বাবা এক যুবককে সঙ্গে করে' বাড়ীতে নিয়ে এলেন আর আমাদের বল্লেন "একে ভাইয়ের মত দেখবি, এখন থেকে আমাদের বাড়ীতেই থাকবে।" মাকে বল্লেন "এই ছেলেটি আজ সারাদিন কিছু খায় নি, পথে পথে ঘুরেছে। একে বাড়ীতে নিয়ে এলাম,—শীগ্‌গির কিছু খেতে দেও, আমাদের অভ্রের কারখানাতেই কাজ শিখবে আর বাড়ীতেই থাকবে।"

এই যুবকটির নাম মধুসূদন দাস,—আমরা মধুবাবু বলেই ডাক্‌তাম।

মধুবাবু আমাদের বাড়ীতে থেকেই অভ্রের কাজ শিখতে লাগলেন,—আমাদের এক পরিবারের লোকই হয়ে গেলেন।

আমরাও মধুবাবুকে সঙ্গীর মতই দেখতে লাগলাম এবং বেশ আড্ডাও মারতে লাগলাম।

শুনলাম মধুবাবু নতুন বিয়ে করেছেন এবং মধ্যে মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে বৌকে চিঠি লেখেন।

মধুবাবুর হাতের লেখা ছিল ভারী বিশ্রী। আঁকাবাঁকা অক্ষর, পড়া মুশ্‌কিল। কিন্তু তার বৌয়ের হাতের লেখা দেখেছি বেশ গোটা গোটা আর পরিষ্কার।

একদিন মধুবাবুকে বল্লাম "মধুবাবু, আপনার এত বিশ্রী হাতের লেখায় বৌকে চিঠি লিখ্‌লে সে আপনার উপর খারাপ ধারণা করবে,—তার চেয়ে আপনার হয়ে আমি আপনার বৌকে একটা কবিতায় চিঠি লিখি,—সে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাবে। নীচে আপনি সই করে দেবেন।"

শুনে মধুবাবু তো একগাল হেসে ফেল্ল,—বল্লে—"আজকেই লিখুন দাদাবাবু, ভারী মজা হবে।"

আমি তক্ষুনি কাগজ কলম নিয়ে একটা সুদীর্ঘ উচ্ছ্বাসপূর্ণ

কবিতা লিখে মধুবাবুকে পড়ে' শোনালাম। তিনিতো আনন্দে আত্মহারা,—"বেশ হবে, বেশ হবে—বউ ভারী খুশি হবে।"

বল্লাম—"আপনি নীচে সই করুন।"

মধুবাবু বল্লেন—"সইটা আপনিই করে দিন না, আমার হাতের লেখা বিট্‌কেল।"

আমি বল্লাম—"তা কি হয়, সই আপনার করতে হবে।"

মধুবাবু চিঠির নীচে লিখ্‌লেন—"কিছু মনে করিও না, আমার হইয়া তোমার এক ভাসুর তোমাকে এই চিঠি লিখিলেন। ইতি শ্রীমধুসূদন দাস।"

চিঠি সেই দিনই ডাকে দেওয়া হোলো। কয়েকদিন পরই বৌয়ের উত্তর এলো—

"ছিঃ ছিঃ—আমি লজ্জায় মরিতেছি,—তুমি এ কাহাকে দিয়া পত্র লিখাইয়াছ। আমার শত শত অনুরোধ এই ভাবে পত্র লিখাইও না, তা হইলে আমি আত্মহত্যা করিব।"

যাক্, মধুবাবুর বৌকে আর চিঠি লিখি নাই এবং শুন্‌লাম তিনি আর আত্মহত্যাও করেন নাই। ভদ্রমহিলা এ ভাবে বেঁচে যাওয়াতে আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

আমাদের শালবনী টিমের সঙ্গে একবার স্কুলের একটি টিমের হকি ম্যাচ্ হবে। অজিত নাগ আমাদের টিমের কাপ্তান, ভীষণ তেজী খেলোয়ার, এক-রোখা আর এক-গুঁয়ে। এই ম্যাচে তাকে জিততেই হবে তার প্রচণ্ড গোঁ।

এ বিষয়ে আমি একটি কবিতা বানালাম রবীন্দ্রনাথের পণরক্ষা কবিতার অনুকরণে—

"জলস্পর্শ করব না আর" অজিত নাগের পণ—
হকি খেলায় স্কুলের সাথে হারব যতক্ষণ।

"কি প্রতিজ্ঞা করিস্ যে ছাই,
আমাদের যা অসাধ্য তাই,
কেমন করে' সাধ্‌বি তা ভাই,—" কহেন সঙ্গীগণ ;
অজিত কহে "সাধ্য না হয়, সাধব আমার পণ।"
ইস্কুল ফিল্ড্ বাড়ী হতে মাইল দেড়েক দূর,
সেথায় যারা খেলে তারা মহা মহা শূর।
ঘেঁটো বাবু দিচ্ছে হানা—
ভয় কারে কয় নাইকো জানা,
তাহার সত্ত্ব প্রমাণ নানা, পেয়েছি প্রচুর,
ইস্কুল ফিল্ড্ বাড়ী হতে মাইল দেড়েক দূর। ইত্যাদি।

ঘেঁটো বাবু (যুগলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়) ছিলেন তখন আমাদের Game's Teacher, বর্তমানে গিরিডি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়েছেন।

এই সময়ে বিখ্যাত সাধু রামদাস বাবাজী তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে গিরিডিতে কীর্তন করতে এলেন।

একদিন আমরা তাঁর কীর্তন শুনতে গেলাম। আমাদের পরম বন্ধু দ্বিজপদ (অধুনা খ্যাতনামা ভক্ত-প্রবর দ্বিজপদ গোস্বামী ভাগবতরত্ন) এই কীর্তনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

দ্বিজপদের অনেক গুণ ছিল। তিনি কবিতা লিখতেন, গান রচনা করতেন, খোল ও ডুগি-তবলা বাজাতে পারতেন এবং ভালো অভিনয় করতেন। তাঁর এই সব গুণের জন্যে সবাই তাঁকে ভালোবাসত। সব আসরেই তাঁর ডাক পড়ত।

রামদাস বাবাজীর কীর্তন শুনতে গেলাম একজন বিশিষ্ট উকীলের বাড়ীতে। দেখলাম বেশ ভীড় হয়েছে, চিকের আড়ালে মেয়েরা বসেছেন, চিকের বাইরে পুরুষের দল।

আমরা বাবাজীর কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি চোখ বুজে গৌরাঙ্গ-লীলা কীর্তন করতে লাগলেন।

"ধবল পাটের জোড় পরেছে—
রাঙা রাঙা পাড় দিয়েছে—"

সঙ্গে সঙ্গে খোল আর করতাল বাজছে,—বাবাজী বোধহয় নিজেই এক জোড়া করতাল বাজাচ্ছিলেন।

তাঁর ভাব-গদগদ মধুর কণ্ঠ আমাদের মত কিশোরদেরও মুগ্ধ করল।

কীর্তনের মাঝে মাঝে বাবাজীর অদ্ভুত ভাব হতে লাগলো। তাঁর সমস্ত শরীরে যেন রোমাঞ্চ হতে লাগল,—তিনি কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগলেন, আর চোখ দিয়ে দর্‌দর্‌-ধারে জল পড়তে লাগল।

ভালো কীর্তন আগেও শুনেছি—বিখ্যাত কীর্তনীয়া ভক্ত রেবতীমোহন সেনের সুরেলা কণ্ঠে। রেবতীবাবুর মধুর কণ্ঠ শুনে শুনেছি রবীন্দ্রনাথ এই গানটি লিখেছিলেন—

"তুমি কেমন করে' গান কর যে গুণী,
আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি, কেবল শুনি"—
ইত্যাদি।

রেবতীবাবু ছিলেন আমাদের একান্ত আপন জন, আমরা তাঁকে ডাকতাম 'নতুন দাদামশাই' বলে।

তিনি মধ্যে মধ্যে কল্‌কাতা থেকে এসে আমাদের বাড়ীতে উঠতেন, আর বেহালা বাজিয়ে আমাদের ভাই-বোনদের গান শেখাতেন—

"মোরা মুখে বলব হরি, হেরব যুগল রাধাশ্যাম,
হরি বলব মুখে, যাব সুখে, সুখে ব্রজধাম।
শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরি-গোবর্ধন,
মধুর, মধুর বংশী বাজে, এইতো বৃন্দাবন।" ইত্যাদি।

আরো কত কি গান।

রামদাস বাবাজীর কীর্তন গিরিডিতে একটা প্রবল সাড়া জাগালো। লোকের মুখে মুখে তাঁর কীর্তনের প্রশংসা।

একদিন খুব সকালে মাষ্টারের জন্যে অপেক্ষা করছি এমন সময় শুনলাম রাস্তায় খোল করতাল বাজছে আর সঙ্গে সেই মধুর কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে—

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম,
এই তো কলিযুগের মহামন্ত্র,
এই নাম বিনে আর সাধন নাইরে,
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

বই-টই ফেলে দৌড়ে গেলাম বড় রাস্তার উপর। দেখি রামদাস বাবাজী সদলবলে নগর-সংকীর্তন করতে বেরিয়েছেন। সঙ্গে দ্বিজপদ মাথা নেড়ে খুব খোল্ বাজাচ্ছেন। আমিও তাঁর দলে জুটে গেলাম, কোথায় রইল পড়া-শোনা আর মাষ্টার মশাই!

গিরিডিকে কীর্তনে মাৎ করে' বাবাজী চলে গেলেন, কিন্তু লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো—

"ধবল পাটের জোড় পরেছে—
রাঙা রাঙা পাড় দিয়েছে।" কিম্বা—
"জপ—হরে কৃষ্ণ হরে রাম,
এই নাম বিনে আর সাধন নাইরে।"

বাবা ছিলেন মহাপুরুষ গম্ভীরানাথ স্বামিজীর শিষ্য, আর মা ছিলেন মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যা, কাজেই আমাদের বাড়ীতে অনেক ভক্ত-মণ্ডলী জুটতেন। সন্ধ্যাবেলা বাবার গুরু ভাইরা আস্‌তেন। ঠাকুর ঘরে আরতির পর ভক্তদের আসর জমৃত। ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা হোত,—আর ভজন-কীর্তন প্রভৃতি অনেক রাত পর্যন্ত চলত। সেই যে আমাদের ক্লাশের শ্রেষ্ঠ ছেলে বসন্ত, তার দাদা প্রমোদবাবু ছিলেন বাবার গুরুভাই। তিনি

প্রায়ই সাইকেল করে' আমাদের বাড়ীতে আসতেন আর গান গাইতেন। রামদাস বাবাজী চলে যাবার পর তাঁর গলার কীর্তন-গুলি আমরা প্রমোদ কাকার মুখে শুনতাম।

ছেলেবেলায় সব জিনিষই শিখবার একটা অদম্য উৎসাহ আমার ছিল। এই উৎসাহের জন্যে ছেলেবেলায় ম্যাজিক, সার্কাস, বাঁশি, ছবি আঁকা ইত্যাদি শিখতে চেষ্টা করেছি। এইবার ঠিক করলাম খোল বাজাতে শিখতে হবে।

দ্বিজপদর কাছে গিয়ে খোলের চর্চা করতে লাগলাম, তিনি উৎসাহ দিলেন,—কীর্তন বাজাতে যে সব প্রধান প্রধান তাল লাগে তা শেখাতে লাগলেন। দশকুশীতে আমার হাত বেশ চলতে লাগল।

আমাদের বাড়ীতে খোল ছিল, বাড়ী এসে তাই বাজাতাম। শেষে ছেলেরা মিলে একটা ছোট-খাটো কীর্তনের দল খুললাম। আমার সেজভাই সুকোমল বেশ ভালো গান গাইতে পারত—সেই আমাদের মূল গায়ক হোলো।

প্রথম মহাযুদ্ধ যেদিন শেষ হোলো—খবরের কাগজে কাগজে যেদিন সকাল বেলা যুদ্ধ-বিরতির সংবাদ ছাপা হোলো, সেদিন গিরিডির ছেলেরা ও যুবকেরা মিলে একটা মিছিল বের করলো। তাতে সমবেত-স্বরে এই গানটি গাওয়া হোলো—

"রণে জার্মাণের পরাজয়
ওরে বৃটিশের হোলো জয়।" ইত্যাদি—

এই গানটি লিখেছিলেন আমাদের দ্বিজপদ। তিনি মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে খোল বাজাচ্ছিলেন। দলের মধ্যে আমরাও ছিলাম।

আমাদের মিছিলটি সোজা হাজির হোলে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোয়। ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন একজন স্কচম্যান—ম্যাক্ গেভিন্। তিনি বাংলো থেকে বেরিয়ে এলেন—আর খুশি হয়ে জানতে

চাইলেন গানটি কার লেখা। আমরা দ্বিজপদকে এগিয়ে দিলাম। তিনি সোৎসাহে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলেন। স্কচ সাহেব এমন ভাব দেখালেন যেন গানটি বেশ বুঝতে পেরেছেন যদিও বাংলা-ভাষার কিছুই তিনি বুঝতেন না। মিছিলের কেউ কেউ গদগদ ভাষায় চীৎকার করছিল—

"Three cheers for Britain" (বৃটেনের নামে তিনবার জয়ধ্বনি দাও।) আমরা নেচে নেচে গান করছিলাম—

"রণে জার্মাণের পরাজয়
ওরে বৃটিশের হোলো জয়।"

-ঊনত্রিশ—

পুরী থেকে ফিরে এসে দাদামশাই অসুখে পড়লেন। অসুখ ক্রমেই বাড়তে লাগল। বহু বিখ্যাত ডাক্তার, কবিরাজ তাঁর চিকিৎসা করতে লাগলেন,—কিন্তু রোগ বেড়েই চল্ল। তিনি বেহুঁশ হয়ে রইলেন।

একদিন বিকালে আমাদের মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছিল, আমরাও খেল্‌ছিলাম,—হঠাৎ শুনি মামাবাড়ী থেকে ভীষণ কান্নাকাটি হচ্ছে। বিপদ আশঙ্কা করে' দৌড়ে গেলাম, বুঝ্‌লাম নিশ্চয় দাদামশাইয়ের কিছু হয়েছে।

মামাবাড়ী গিয়ে শুনলাম, দাদামশাইয়ের খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল, তিনি এ যাত্রা সাম্‌লে উঠেছেন।

দাদামশাইয়ের এই অবস্থার কথা টেলিগ্রাম করে' নতুন দাদামশাইকে (রেবতীমোহন সেন) জানানো হয়েছিল। দাদামশাই মৃত্যুকালে তাঁকে দেখতে চেয়েছিলেন।

সন্ধ্যার সময় রেবতী বাবু এসে পৌঁছালেন—এবং দাদামশাইকে অচেতন অবস্থায় দেখ্‌তে পেলেন।

রাত্রে আমরা বাড়ীতে খেতে বসেছি, এমন সময় মামাদের একজন কর্মচারী ছুটে এসে আমাদের বল্লেন—"আপনারা শীগ্‌গির মামাবাড়ীতে যান।"

খেতে খেতেই প্রশ্ন করলাম—"কেন?"

তিনি উত্তর দিলেন, "শীগ্‌গির যান,—গিয়েই জানবেন।" বলেই তিনি দ্রুত চলে গেলেন।

আর কি! যা হবার তা হয়ে গেছে। খাওয়া ফেলেই ছুটে গেলাম মামাবাড়ীতে। গিয়ে দেখলাম দাদামশাইয়ের ঘরে ভীষণ ভীড়,—মামারা কাঁদছেন, মা-মাসী আর মামীরা আকুল হয়ে চিৎকার করছেন।

উঁকি মেরে দেখলাম,—খাটের উপর দাদামশাই নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে আছেন; অতি প্রশান্ত মূর্তি, মুখে হাসির আভাস। তাঁর সোনার কান্তিতে কোনো বিকার হয় নাই, যেন তিনি সুখ-নিদ্রায় মগ্ন হয়ে আছেন।

সত্যিই আমার অতি প্রিয়জন, আমার অনন্ত হিতকামী, আমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী পরমারাধ্য দাদামশাই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। শোকে, দুঃখে আমার যেন বুক ফেটে যাচ্ছিল।

কেউ কেউ আমাকে মামাদের সঙ্গে শ্মশানে যেতে বল্লেন, কিন্তু কিছুতেই তা সম্ভব হোলো না। অমন দিব্যকান্তি কাঁচা সোনার রং আমার চোখের সামনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে—তা আমি দেখতে পারব না।

শেষরাত্রে দাদামশাইকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হোলো। মেয়েরা তাঁর সেই কম-কান্তি চূয়া-চন্দনে সাজিয়ে দিলেন। অগুরু ধূপের গন্ধে তাঁর মহাযাত্রার পথ সুরভিত হয়ে উঠল।

রেবতী বাবু নিজে খোল ধরলেন—আর শোক-মিছিলের আগে আগে কীর্তন করতে করতে চল্লেন—

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ,
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ,
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন,
গিরিধারী গোপীনাথ মদন-মোহন।"

মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি উঠতে লাগলো নৈশ গগন ভেদ করে'। আমি বারান্দায় বসে শুনতে লাগলাম,—দূরে—অতি দূরে মিছিল চলে যাচ্ছে দাদামশাইকে নিয়ে,—রেবতী বাবুর কণ্ঠে সুমধুর কীর্তন হচ্ছে, খোল্ বাজছে, করতাল বাজছে। শ্মশানের উঁচু-নীচু অন্ধকার পথে কয়েকটি লণ্ঠনের আলো মাঝে মাঝে আমার

দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। ভাবলাম মিছিলের সবাই আবার ফিরবেন, কিন্তু আমার দাদামশাই আর ফিরবেন না।

দাদামশাইয়ের মৃত্যু-সংবাদ কলকাতার নানা কাগজে ফলাও করে' বের হোলো, তাঁর সচিত্র জীবনকাহিনী প্রকাশিত হোলো। সে সময়ের 'ভারতবর্ষে' জলধর সেন লিখলেন—

"মানুষের মত মানুষ চলিয়া গেলেন আমাদের এই মনোরঞ্জন—" ইত্যাদি।

মা আমাকে বল্লেন, "তুই বাবার এই মৃত্যু-উপলক্ষে আমার হয়ে একটা কবিতা লেখ,—আমি খাতায় টুকে রাখব।"

আমি কবিতা লিখলাম—

বলিতে বিদরে ছাতি, বাবার জীবন বাতি
নিভে গেল, নিভে গেল কালের ফুৎকারে,
স্বপনের ন্যায় আজি অন্তরে উঠিছে বাজি,
পরিপূর্ণ ধরাতল আকুল চিৎকারে।
পৃথিবীর মায়াজাল বেঁধেছিল এতকাল
বাবারে কঠিন করে' কিন্তু আজি হায়,
কি জানি কি মন্ত্র বলে বাবা গিয়াছেন চলে
কাটিয়া বাঁধন আজি, না জানি কোথায়?
শূন্য আজি চারিধার, যেথা ফিরি অন্ধকার,
ঝর ঝর ঝরিতেছে চক্ষু বাহি জল,
কে আজি সান্ত্বনা দিবে, মনোজ্বালা জুড়াইবে,
কে আজি মধুর কণ্ঠে বুঝাবে সকল।
মাঝে মাঝে দীর্ঘ শ্বাসে নেত্র দুটি জলে ভাসে,
নিদারুণ শোক রাশি হৃদি পরে লাগে,
বাবা আছে, ভাবি মনে কিন্তু হায় পরক্ষণে
নিরাশার ছায়া এক অন্তরেতে জাগে।

ত্যজিয়া মরত ভূমি, কোথা বাবা গেলে তুমি,
কোন সুদূরেতে আজি লভিয়াছ স্থান,
শূন্য পানে চেয়ে থাকি "বাবা বাবা" বলে ডাকি,
অতীতের স্মৃতিগুলি দহে মন প্রাণ।
যাও বাবা যাও যাও যেখানেতে সুখ পাও,
পবিত্র আনন্দ-ধামে যাও মহাপ্রাণ,
দ্বেষ-হিংসা বিজড়িত পাপতাপে কলুষিত
নশ্বর পৃথিবীখানি নহে তব স্থান।

এই কবিতাটি আমি পরে আমার মায়ের খাতায় পেয়েছি, তাই পুরোপুরি লিখে দিলাম। তখন আমি ১৪।১৫ বছরের ছেলে। মায়ের খাতায় তারিখ দেওয়া আছে—১৩২৫ সাল, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ।

দাদামশাইয়ের মৃত্যুর পর মামাবাড়ীতে আনন্দের হাট ভেঙে গেল, নিত্য উৎসব বন্ধ হয়ে গেল। সমস্ত আলো যেন নিভে গেল।

আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম, দাদামশাইয়ের কাছে যেসব বই আর মাসিক পত্রিকা আসত তাও ক্রমে ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল।

কত বড় বড় লোক আস্‌তেন, তাঁরাও আর কেউ আসেন না, শুধু তাঁরা মামাদের কাছে শোকসূচক চিঠিপত্র লেখেন আর সমবেদনা জানান্।

দাদামশাই প্রতিদিন সকাল বেলা আস্‌তেন আমাদের বাড়ী। খিড়্‌কী দরজা দিয়ে ঢুকেই আমাদের উদ্দেশ করে' হাঁক্ দিতেন, "ওরে রাক্ষস রাক্ষসীরা কেমন আছিস্!"

সে ডাক আর শুনি না,—কোনো দিনও আর শুনব না।

দাদামশাইয়ের জন্যে মন্‌টা ডুক্‌রে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে, ছুটে যেতে চায় তাঁর কাছে—সেই অজানা রাজ্যে—দূরে—দূরে—অনেক দূরে।

—ত্রিশ—

একবার সন্দেশের মুখপত্রে কয়েকটি রঙীন টিয়াপাখীর ছবি বেরিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল—টিয়াপাখীকে শেখালে অনেকটা মানুষের মত কথা বল্‌তে পারে। এক ভদ্রলোকের পোষা টিয়াপাখী নাকি পরিষ্কার কথা বল্‌ত—

"কৃষ্ণ কহ, কৃষ্ণ কহ, কৃষ্ণ কহ প্রাণ
কৃষ্ণ ভজিলে পরিত্রাণ।"

আমাদের রান্নাঘরের বারান্দায় ঝোলানো-খাঁচায় একটি টিয়াপাখী ছিল। আমাদের দাই প্রতিদিন তাকে বুলি শেখাত—

"গঙ্গাজীসে জল্ ভর্ লাও
বাবা বৈজ্‌নাথ পড়্ চড়াও—
বোলো ভাই কৃষ্ণু, শিরি ভগবান্।"

কিন্তু টিয়াপাখীটি তার উত্তরে শুধু ট্যাঁ ট্যাঁ করে' হল্লা করত,—আর কিছু বল্‌ত না।

আমি 'সন্দেশে' পড়া ছড়াটি তাকে মধ্যে মধ্যে শোনাতাম কারণ সন্দেশেই পড়েছিলাম, তারই এক জ্ঞাতি-ভাই এটি নাকি পরিষ্কার উচ্চারণ করতে পারত—। খাঁচার কাছে গিয়ে বল্‌তাম—

"কৃষ্ণ কহ, কৃষ্ণ কহ, কৃষ্ণ কহ প্রাণ
কৃষ্ণ ভজিলে পরিত্রাণ—।"

পাখী ঠোঁট বেঁকিয়ে উত্তর দিত, ট্যাঁ—ট্যাঁ—চিক্—চুক্ চুর্‌র্।

টিয়াপাখীটা কথা শিখ্‌বে কি করে'? নানান্ জনে তাকে নানান্ ভাষায় কথা শেখাতে চায়। তার এমন কিছু অসাধারণ স্মরণ-শক্তি ছিল না—যে নানা ভাষায় কথা সে শিখ্‌তে পারে।

আমাদের ঠাকুর তাকে শেখাতে চায় চণ্ডীর সংস্কৃত শ্লোক, যুবরাজ চাকর শেখাবে দেহাতী গান, আমাদের নেপালী ছোকরা

চাকর হাস্তাবীর তাকে শেখাবে নেপালী ছড়া, দাই শেখাবে—"বোলো ভাই রুক্ষু, শিরি ভগবান।" ছোটুয়া যখনই তাকে দেখ্বে—তখনই গাইবে—

"রাম নাম লাড্ডু, গোপাল নাম ঘি,
হরিনাম মিশ্রী, ঘোরি ঘোরি পি।"

আমরা এক একটি ভাই সময় পেলেই—তার কানের কাছে ইংরাজী, বাংলা প্রভৃতি নানা কবিতা আওড়াব। কাজেই টিয়াপাখীটা শেষ পর্যন্ত টিয়াপাখীই রয়ে গেল; তার নিজের জাতীয় ভাষাই বল্‌তে লাগ্‌ল, ট্যাঁ- চ্যাঁ-চুর্‌র্—।

শেষে একদিন খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে সে নীল-আকাশে উড়ে গিয়ে মুক্তির নিশ্বাস ফেল্ল।

সারাবছর ধরেই আমাকে পড়াশোনা করতে হয়। বাবার এদিকে সজাগ দৃষ্টি। গ্রীষ্মের লম্বা ছুটি, পূজার সুদীর্ঘ অবকাশ বা বড়দিনের সময়ও আমার অবসর নাই। পূজা-পার্বনের সময় যখন হৈ-হল্লা করতে ইচ্ছা করে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমোদ করতে ইচ্ছা করে—তখনও পড়ার চিন্তা করতে হয়,—মাষ্টার আসেন নির্দিষ্ট সময়ে,—আমার বই নিয়ে বস্‌তে হয়। বাবা এদিকে-ওদিকে গেলে—আমি যেন একটু রেহাই পাই,—তিনি কয়েকদিনের জন্যে অন্যত্র গেলে আমার তো কথাই নাই।

শুধু বছরে মাত্র একদিন বই ছুঁতাম না, আর কেউ পড়তেও বল্‌তেন না,—সেই একটা দিনই ছিল আমার বে-পরোয়া অনধ্যায়ের দিন। সমস্ত দিন টো-টো করে ঘুরে বেড়াতাম,—আড্ডা মারতাম আর স্ফূর্তি করতাম,—বাবার সামনে দিয়ে ইচ্ছে করেই বুক ফুলিয়ে যাওয়া আসা করতাম। সেটা হচ্ছে সরস্বতী পূজোর দিন।

সে দিন রাত থাকতে বন্ধুরা আসত আমাকে ডাক্‌তে,—ফুল

তুল্‌তে যেতে হবে এ বাড়ী ও বাড়ী, শর আন্‌তে যেতে হবে উশ্রী পারের শর বনে,—ঘুরতে হবে নানা জায়গায়।

আশ্চর্যের কথা বাবাই আমাকে জাগিয়ে দিতেন—"ওরে ওঠ্, ওরা তোকে ডাকৃতে এসেছে।"

ওঃ আমার কী আনন্দ! বাবাই আমাকে জাগিয়ে দিয়েছেন,—বাবার সাম্‌নে দিয়েই হৈ-হৈ করতে করতে বেরিয়ে যেতাম।

প্রচণ্ড শীত তার উপর আবার ঘন কুয়াসা,—কুছ্ পরোয়া নাই—কৈশোরের আনন্দের খর-কিরণে—ওসব শূন্যে মিলিয়ে যেত। কোথায় শীত, কোথায় কি। খালি পায়ে গিরিডির উপল-বহু রাস্তা দিয়ে অনায়াসে হেঁটে চলেছি মাইলের পর মাইল।

ক্ষিধেয় মুখ শুকিয়ে গেছে,—কিন্তু খাওয়ার উপায় নাই—আজ যে সরস্বতী পূজো,—দেবীকে অঞ্জলি না দিয়ে খাওয়া যে একান্ত অপরাধ,—পরীক্ষায় নির্ঘাৎ কুপোকাৎ।

এই একটি দিনই ছিল আমার একদম না পড়ার দিন। এই সরস্বতী পূজো সম্বন্ধে পরে আমি একটি কবিতা লিখেছিলাম। তার কয়েকটি লাইন হচ্ছে—

মনে পড়ে যায়, রাতে ঘুম নাই, উস্‌খুস্ করে মন্,
প্রথম কাকের ডাকের শব্দে তাড়াতাড়ি জাগরণ।
দলাদলি ভুলি গলাগলি করি ছুটেছি ছেলের দল,
খালি পায়ে চলি, গায়েতে জড়ানো আলোয়ান, কম্বল।
কার বাগানেতে অতসী ফুটেছে, দোপাটি, গন্ধরাজ,
চুপে চুপে ভোরে পাঁচিল ডিঙিয়ে চুরি করে' আনি আজ।
তখনো আকাশে আঁধার জড়ানো, ছড়ানো কুহেলী জাল,
মালী ও মালিক ঘুমে অচেতন, কে করিবে গালাগাল্?

* * * *

আজ পড়া নাই, কোনো তাড়া নাই, পাড়া জুড়ে হৈ চৈ,
পড়ুয়ারা আজ বে-পরোয়া হোলো, ছুঁতে নাই আজ বই।
গুরুজন আজ দেয় নাকো বাধা, পড়াশোনা নাই আর,
বই যদি ছুঁই বকুনি লাগায়, বিপরীত ব্যবহার।
সারাটি বছর পড়ার জন্যে যারা শুধু ধরে খুঁৎ—
আজ বই ছুঁলে তারা তাড়া দেয়—অদ্ভুত, অদ্ভুত। ইত্যাদি।

এই কবিতাটি পুরোপুরি ভাবে ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'মাস-পয়লায়' পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছিল।

স্কুলের পড়ার ফাঁকেফাঁকে গোপনে সাহিত্য চর্চা করি, আর শিল্প চর্চা করি,—ভাইরা ছাড়া আর কেউ সে খোঁজ রাখে না। কারণ, রাখলেই বিপদ। একবার এক মাষ্টারমশাই আমার খাতায় আমার কবিতা দেখে মুখ বিকৃত করে' বলেছিলেন, "পরকাল আর ঝর্ঝরে কোরো না।"

তবু আমি গোপনে পরকাল ঝর্ঝরে করি। কিন্তু কোনো কাগজে পাঠাতে আর উৎসাহ বোধ করি না, কেউ আমার লেখা ছাপ্তে চায় না। লেখা ফেরৎ আসে, কিংবা পত্র পাই, "মনোনীত হইল না।"

না হোক্ মনোনীত, আমার নিজস্ব হাতের লেখা কাগজ আছে, তাতেই মনের খুশিমত লিখে হাত পাকাই।

একবার আমার কাগজে একটা দার্শনিক প্রবন্ধ লিখলাম— "আমি কে?"

বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে অনেকেই তার প্রশংসা করল, একজন শুধু বল্লে, "ভারতবর্ষ কাগজে ঠিক এই লেখাটাই পড়েছি, হুম্ বাবা, টুক্‌নিফাই ধরে' ফেলেছি।"

আমি কিন্তু কোথা থেকেও টুকি নাই,—আমার উর্বর মস্তিষ্কেরই দান সেটা।

টুনু নামে আমাদের স্কুলে একটি ছেলে পড়ত। তার আঁকার

হাত ছিল চমৎকার। সে বইয়ের ছবি দেখে দেখে তার সুন্দর নকল করতে পারত। একবার 'চিত্রে চন্দ্রশেখর' বইখানা দেখে সে অনেকগুলি রঙীন ছবি এঁকে আমাকে দেখালো। নরেন সরকারের আঁকা রঙীন ছবি তখন আমার বড় ভালো লাগত। দেখলাম টুনু নরেন বাবুর অনেকগুলি ছবি রঙীন পেন্‌সিল দিয়ে এঁকে এনেছে।

আমি তার আঁকা ছবিগুলি চেয়ে নিলাম, আর গভীর রাত্রে বসে সেগুলি আবার আঁক্‌তে চেষ্টা করলাম—কিন্তু ঠিকমত পারলাম না। টুনু অনেকদিন হয় তার কিশোর বয়সেই মারা গেছে, বেঁচে থাক্‌লে সে যে একজন বিখ্যাত শিল্পী হোত তার আর ভুল নাই। ছেলেটির কথা আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে।

একদিন শুন্‌লাম আমাদের ক্লাশের বসন্ত মহাত্মা গম্ভীরানাথ স্বামীর একখানি ছবি এঁকেছে। স্বামিজী বসন্তর দাদা প্রমোদবাবুর ও আমার বাবার গুরু ছিলেন।

এই কথা শুনে আমারও খুব উৎসাহ হোলো,—আমাদের বাড়ীতে স্বামিজীর প্রকাণ্ড একখানা ছবি ছিল, আমি তাই দেখে দেখে ছবি আঁক্‌লাম।

ছবিখানি খুব মন্দ হোলো না। বাবা দেখে খুশিই হলেন এবং সন্ধ্যাবেলা তাঁর গুরুভাইদের দেখালেন। বসন্তর ছবিও তাঁরা দেখেছিলেন। সকলেই একবাক্যে বল্লেন, "বসন্তেরটাই ভালো হয়েছে। এটিও মন্দ নয়। তবে বাবাজীর মুখখানা ঠিকমত চেনা যাচ্ছে না।"

একদিন খুব সকালে তখনকার ব্রাহ্ম যুবকেরা উষা কীর্তন করতে করতে আমাদের বাড়ীতে এলো। তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে, কিন্তু সূর্য উঠবার দেরী আছে। আব্‌ছা আলো-আঁধারের মধ্যে দেখলাম আমাদের শেফালী-গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তারা গান গাইছে—

"ব্রহ্মনাম, বদনেতে বল অবিরাম,
চেয়ে দেখ, বিশ্ববাসী ব্রহ্মানন্দে মাতিল,
পশুপক্ষী তরুলতা ব্রহ্মগুণ গাহিল,
নর-নারী আদি সবে, কোন প্রাণে ঘুমে রবে,
প্রভাতে জাগিয়া সবে, কর ব্রহ্মনাম।"

ভালো করে' তাকিয়ে দেখলাম, এই দলে আমার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু রয়েছে, কেউ কেউ মাথা নেড়ে করতাল বাজাচ্ছে।

তারা আমাকে ডাক্‌তে এসেছে। কিন্তু বাবার অনুমতি ছাড়া যাই কি করে'। বাবা অনুমতি দিলেন; তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ ঘুরে বাড়ী ফিরলাম।

যদিও আমি নিজে হিন্দু ছিলাম, কিন্তু আমার বারগণ্ডার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই ছিল ব্রাহ্ম। তাদের সঙ্গে ব্রাহ্ম-সমাজে যেতাম, তাদের বিয়ে-চূড়োতে যোগ দিতাম,—তাদের বাড়ীতে কোনো পারিবারিক উৎসব-অনুষ্ঠানে আমি বাদ পড়তাম না। মোট্‌কথা তারাই ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।—অনেক ব্রাহ্ম পরিবারে আমার অবাধ মেলামেশা ছিল।

একবার প্রবাসীতে সুকুমার রায়ের লেখা 'ভাবুক সভা' নামে একটি ছোট্ট সরস নাটিকা বের হয়েছিল। তাতে মাত্র তিনটি চরিত্র।

আমার তুজন ব্রাহ্ম বন্ধু পচু আর সতু (নিরুপমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিরাময়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) তাদের এক পারিবারিক উৎসবে এই ছোট্ট নাটিকাটি করবে স্থির করল। তারা আমাকে যোগ দিতে বল্ল—এবং 'ভাবুক-দাদার' চরিত্রটি অভিনয় করতে অনুরোধ করল।

আমি সোৎসাহে রাজি হয়ে গেলাম, কারণ বাবা কয়েকদিনের জন্যে অন্যত্র গেছিলেন। নাটিকাটি কবিতায় লেখা,—আমাকে তারা আমার ভূমিকাটি লিখে দিল। আমি ভাবুকদাদার ভূমিকাটি মুখস্থ করতে লাগ্‌লাম।

অভিনয় জমে গেল। পচু ও সতু চমৎকার অভিনয় করল, আমারটাও মন্দ হোলো না।

প্রথম দৃশ্যে ভাবুকদাদা র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে নাক ডাকাচ্ছে—এমন সময় লম্বকেশ আর তার সঙ্গীর প্রবেশ—

"একি ভাই লম্বকেশ দেখ্‌ছ নাকি ব্যাপারটা—
ভাবুকদাদা মূর্ছাগত মাথায় দিয়ে র‍্যাপারটা।—"

পচু সতুর প্রথম প্রবেশটাই ছিল কৌতুকপ্রদ। তাদের চেঁচামেচিতে ভাবুকদাদার ঘুম ভেঙে যাবে,—সে তেড়িয়া হয়ে "জুতিয়ে সব করব সিধে, বলে রাখ্‌ছি পষ্ট, চেঁচামেচি করে' ব্যাটা ঘুমটি করলি নষ্ট?" বলেই হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে উঠ্‌বে। তারপরে তিনজনের মজার মজার সব বাক্যালাপ।

এই নাটকটির খুব প্রশংসা হোলো,—অনেক যায়গায় আমাদের অভিনয় করবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হোলো,—এমন কি তখনকার দিনে মেয়েদের স্কুলের এক উৎসবেও আমাদের ডাক্ পড়ল। সেখানে মঞ্চের একধারে একটা টেবিল-হারমোনিয়াম ছিল। ভাবুকদাদা ঘুমের থেকে তেড়ে লাফিয়ে উঠ্‌তে গিয়ে একেবারে সেই হারমোনিয়ামের উপর গিয়ে পড়ল।

সেদিন আমার হাঁটুতে বেশ চোট্ লেগেছিল। আমরা আর একদিন আর একটি থিয়েটার করলাম অমৃতলাল বসুর 'কলসী উৎসর্গ'।

একটা দৃশ্যে একটা কলসীকে লাঠি মেরে ভাঙা হবে। যেই পণ্টুর লাঠির এক ঘায়ে কলসীটা ভেঙে চুরমার্ হোলো অমনি দর্শকদের মধ্যে থেকে এক মহিলা চিৎকার করে' উঠ্‌লেন—

"আহা রে, এমন নূতন কলসীটা ভাইঙ্গা দিলরে—হায় হায়।"

ভদ্রমহিলা পূর্ববঙ্গীয়া। তাঁর আর্তনাদ শুনে সবাই হেসে কুটোপাটি।

—একত্রিশ—

পড়াশোনায় বিশেষ ভালোছেলে কোনোদিনই ছিলাম না—কিন্তু পরীক্ষায় কোনো বিষয়েই কোনোদিন ফেল করিনি। অঙ্কে আমার মাথা কিছুতেই খুল্‌ত না,—বিশেষতঃ বুদ্ধির অঙ্কগুলি আমার মগজ ঘুলিয়ে দিত। অঙ্কের পরীক্ষার দিন আমার দারুণ আতঙ্ক উপস্থিত হোত।

সমস্ত পাঠ্য-বিষয়গুলিই আমাদের ইংরাজীর মাধ্যমে পড়তে হোত। ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি, অঙ্ক প্রভৃতি সবই ইংরাজীতেই উত্তর দিতে হোত। এ জন্যে ইংরাজী ভাষা আমাদের প্রথম থেকেই ভালোভাবে শিখ্‌তে হোত। বাংলা ও সংস্কৃতেও আমাদের অনেকাংশে ইংরাজী ভাষার সাহায্য নিতে হোত। ক্লাশে আমরা মাষ্টারমশাইদের সঙ্গে ইংরাজীতে কথা-বার্তা বলতাম, না বল্লে ধমক খেতাম।

ম্যাট্রিক ক্লাশে আমরা ইংরাজী গদ্য ও পদ্যের বই পড়তাম বটে—কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাদের কোনো নির্দিষ্ট বই ঠিক করা ছিল না। ম্যাট্রিকে প্রশ্ন আসত সম্পূর্ণ বাইরে থেকে,—সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে তার উত্তর দিতে হোত।

বাংলারও কোনো নির্দিষ্ট বই ছিল না। স্কুলে হিমাংশুবাবু আমাদের নানা ধরণের বাংলা বই পড়াতেন। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতির বহু কবিতা তিনি আমাদের ক্লাশে পড়িয়েছেন।

একবার হিমাংশুবাবু আমাদের ক্লাশে একটি প্রবন্ধ লিখ্‌তে দিয়েছিলেন—'কবির কান' কি রকম হয়?

আমরা সবাই সাধ্যমত এ বিষয়ে কিছু কিছু লিখেছিলাম। তিনি এই প্রশ্নে জান্‌তে চেয়েছিলেম—কবিদের কানে কি ভাবে ছন্দের ধ্বনি বাজে, কি ভাবে তাঁরা সাধারণ লোকের চেয়ে একটু বিশেষ ভাবে সুর-তরঙ্গ কান দিয়ে অনুভব করেন ইত্যাদি।

একটি ছেলে লিখল "কবির কান আমাদের চেয়ে আকারে কিছু বড়। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির চিত্রে দেখা যায় তাঁহাদের কান অনেকটা ঝুলিয়া রহিয়াছে। এই কানের দৌলতেই তাঁহারা কবি। কান বড় না হইলে কবি হওয়া যায় না। বিলাতের বড় বড় কবিরাও বড় বড় কানের অধিকারী।" ইত্যাদি।

হিমাংশুবাবু এই প্রবন্ধ দেখে খুব একচোট হাস্‌লেন,—তারপর লেখককে বল্লেন—"ওহে, তোমার কি ধারণা কবিরা সবাই গাধা,—তাই তাদের গাধার মত কান হবে?"

আমরা সবাই হেসে উঠ্‌লাম।

বাংলা-ভাষার উপর বেশ দখল ছিল আমার। একবার বার্ষিক-পরীক্ষায় আমার লেখা একটি বাংলা প্রবন্ধ তিনি নানা ক্লাশে পড়ে' শুনিয়েছিলেন। প্রবন্ধটি নাকি একটি আদর্শ প্রবন্ধ হয়েছিল।

বাংলার ক্লাশে যেমন আমি হিমাংশুবাবুর স্নেহ-দৃষ্টিতে পড়েছিলাম,—আবার অঙ্কের মাষ্টারমশাই তেমনি আমার উপর কৃপাদৃষ্টি করতেন।

ম্যাট্রিক ক্লাশে উঠেছি, আর একবছর পরই আমার স্কুলের বিদ্যা শেষ হবে,—তাই বাবা বিশেষ চিন্তিত হয়ে উঠ্‌লেন।

একদিন কুলীর মাথায় ট্রাঙ্ক আর বিছানা চাপিয়ে এক ভদ্রলোক এসে আমাদের বাড়ীতে উঠলেন।

বাবা বল্লেন "তোর জন্যে নতুন মাষ্টার ঠিক হোলো,—ইনি তোকে পড়াবেন, আমি এঁকে দেশ থেকে আনিয়েছি।—নতুন বি, এ, পাশ করেছেন। প্রণাম কর্।"

আমি নতুন মাষ্টারমশাইকে প্রণাম করলাম,—এবং আমার বাইরের ঘরে তাঁকে নিয়ে গেলাম।

বাবা বল্লেন "ইনি তোর ঘরেই থাকবেন, তোর পড়াশোনার সুবিধা হবে,—যখন-তখন পড়াতে পারবেন।"

একে তো পুরাণো মাষ্টারদের ঠেলাতেই অস্থির তার উপর আবার নতুন মাষ্টারের আমদানী। ইনি আবার যখন-তখন পড়াবেন। কাজেই আমি যে খুব খুশি হলাম তা নয়।—তবে এঁর বয়স অল্প, যদি বন্ধু করে' নিতে পারি তবে আড্ডা জমতে পারে।

নতুন মাষ্টারমশাই আমার আরো তিনটি ভাইয়েরও ভার নিলেন,—কিন্তু বেশী চাপ্‌টা পড়লো আমার উপর।

মাষ্টারমশাই রুগ্ন,—রোগা, জীর্ণ শরীর—বোধ হয় ম্যালেরিয়ায় ভোগেন। এই স্বাস্থ্যকর জায়গায় এসে তিনি যেন বেশ আনন্দিতই হলেন। শুনেছিলেন, এখানকার কূয়ার জল নাকি রসায়নের মত উপকারী। তাই তিনি বারেবারে জল খেতেন।

আমার পড়ার সময় বেড়ে গেল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কেবল পড়া, পড়া আর পড়া। ছুপুরে নিয়মিত স্কুলে যাই,—তার পরেই নতুন মাষ্টারমশাই আমার ভার নেন। আমি যেন হাজতের আসামী, এক দারোগার কাছ থেকে আর এক দারোগা আমার ভার গ্রহণ করেন,—স্বাধীনতা বলে আমার যেন কিছু নাই।

নতুন মাষ্টার আমাকে ডাক্‌তেন নির্মল বলে। গভীর রাত্রে হয়তো পড়াশোনা করে' ঘুমিয়েছি এমন সময় শুন্‌লাম তাঁর কণ্ঠস্বর—"নির্মল, ঘুমালে নাকি? এত তাড়াতাড়ি ঘুমালে চলবে না।"

তাঁর স্বরটা কানে যেত কিন্তু প্রাণে আর যেতে চাইত না।

আবার শুনতাম তিনি বলছেন—"আজ ঘুমাচ্ছ ঘুমাও, কাল থেকে কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ঘুমালে চলবে না। খুব সকালে উঠে ইতিহাসটা ঝালাই করবে।" ইত্যাদি।

মাষ্টারমশাইয়ের বোধহয় রাত্রে ঘুম হোত না। রাত থাকতেই তিনি আবার আমাকে জাগিয়ে দিতেন।

আমি মাষ্টারমশাইদের যতটা ভয় ও শ্রদ্ধা করতাম আমার অন্যান্য ভাইরা কিন্তু ততটা ভয়-ভক্তি করত না। তারা অবাধে তাঁদের সঙ্গে রসিকতা করত। আমি সাহস পেতাম না।

একবার নতুন মাষ্টারের সারা গায়ে চুলকানি হয়,—তিনি ক্রমাগত তাই চুলকাতেন, আর চিরুণি দিয়ে সমস্ত শরীর আঁচড়াতেন।

আমাদের বাগানে টোপাকুল গাছ ছিল,—তাতে রাশি রাশি টোপাকুল হোত।

মাষ্টারমশাই ঐ কুল খেতে খুব ভালো বাসতেন, আর গাছ তলায় গিয়ে কুল পেড়ে পেড়ে খেতেন। এই উপলক্ষে আমি একটি ছড়া তৈরি করলাম—

সারাগায়ে চুলকানি, খালি খালি চুলকায়,
তবুও তো কালিনাথ টোপা টোপা কুলখায়। ইত্যাদি।

আমার বন্ধুবান্ধবেরা কিন্তু এই মাষ্টারটিকে ভালো চোখে দেখত না। একদিন কোথায় এক নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে আমরা সবাই খেতে বসেছি, নতুন মাষ্টারমশাইও আমাদের সঙ্গে বসেছেন এক সারিতে, হঠাৎ মাষ্টারমশাই অনুযোগের সুরে বল্লেন "ছাখতো নির্মল, আমার মাথায় আলুর দম্ ছুঁড়ে মারছে কে ?"

তাইতো মাষ্টারমশাইয়ের মাথায় আলুরদম ছুঁড়ে মারে কে ?

আমার অনেক বন্ধুই খেতে বসেছিল,—তাদের মধ্যে কে ছুঁড়ছে আলুরদম ?

মাষ্টারমশাই আবার বলে উঠলেন—"এই ছাখো, ছাখো, গালের উপর ঝপাৎ করে' ঝোলশুদ্ধ একটা মাছের দাগা পড়লো,—ঐ যাঃ—আমার ফর্সা পাঞ্জাবীটাও নষ্ট হয়ে গেল,—আমি আর খাব না।"

মাষ্টারমশাইয়ের হয়ে আমি বন্ধুদের উদ্দেশে মন্দ বলতে

লাগ্‌লাম—"ছিঃ ছিঃ,—এ ভারী অন্যায়, ভদ্রলোকের সঙ্গে এ রকম অন্যায় ব্যবহার করতে হয় ?"

বন্ধুরা বল্লে—"কে ফেলছে আমরা কি জানি ?"

একজন বল্লে—"শ্রীপতি বাবুর বাড়ীতে ভূত আছে।"

ভূতের যত আক্রোশ কি মাষ্টারমশাইয়ের উপর ?

মাষ্টারমশাই আর ভালো করে' খেতে পারলেন না, কোনো রকমে খাওয়া শেষ করলেন।

যখন উঠলেন,—তখন আমরা দেখলাম তাঁর ফর্সা শাদা পাঞ্জাবীর পিছন দিকে ডাল-ঝোল-অম্বল ইত্যাদির নানা চিত্তির বিচিত্তির।

মাষ্টারমশাই ক্ষুণ্ণ হয়ে বল্লেন "দাঁড়াও, বাড়ী গিয়ে তোমার বাবাকে সব বলে দিচ্ছি।"

আমি মুখ কাচু-মাচু করে' বল্লাম—"বাবাকে বল্লে কোনো লাভ হবে না,—আমি বা আমার ভাইরাতো কোনো দোষ করি নি।"

মাষ্টারমশাই বল্লেন "আমাকে চিনিয়ে দিও তো—কে এই কাণ্ড করেছে ?"

এই দলে পাখীও ছিল,—সে অম্লান মুখে বল্লে "বিরূপাক্ষ"—

বিরূপাক্ষ ? সে তো খেতেই আসে নি,—সে এই সব কাণ্ড করলো কি করে' ?

পাখীকে গোপনে জিজ্ঞাসা করলাম "তুই বিরূপাক্ষের নাম করলি কেন ?"

পাখী বল্লে "বেশ রগড় হবে।—ছেলেটা বেজায় রগচটা আর ভীষণ রাগী। ওকে চেপে ধরলে ও ক্ষেপে উঠবে,—চাইকি মাষ্টারমশাইকে ধরে' ছাতা-পেটাও করতে পারে।"

এই বিরূপাক্ষকে আমরা ভালো করেই চিনতাম—অনেকের সঙ্গেই তার হাতাহাতি হতে দেখেছি। কথায় কথায় সে ক্ষেপে উঠত।

মাষ্টারমশাইয়ের দৃঢ় বিশ্বাস ঐ বিরূপাক্ষই তাঁকে এ রকম অপদস্থ করেছে। তাই প্রায়ই বলতেন—"বিরূপাক্ষকে একবার দেখিয়ে দিও তো।"

অথচ বিরূপাক্ষ এ বিষয়ে কিছুই জানে না।

একদিন দেখলাম, আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে ছাতা হাতে হন্ হন্ করে' বিরূপাক্ষ যাচ্ছে,—আমি মাষ্টারমশাইকে বল্লাম—"ঐ যে বিরূপাক্ষ যাচ্ছে।"

মাষ্টারমশাই শুয়ে ছিলেন, তড়াক্ করে' লাফিয়ে উঠলেন,—জানলার ধারে এসে বল্লেন—"পাক্‌ড়াও, পাক্‌ড়াও,—ওকে পাক্‌ড়ে নিয়ে এসো।"

আমি বল্লাম—"ওকে ঘাঁটিয়ে দরকার নাই। এক সাহেবের আপিসে কাজ করত। মতের অমিল হওয়ায় সাহেবের মুখে একটা ভারী হাতুড়ি ছুঁড়ে চাকরি ছেড়ে এসেছে।"

মাষ্টারমশাই আর কিছু বল্লেন না, আবার এসে শুয়ে পড়লেন।

—বত্রিশ—

আধ-পাগলাটে এক ব্রাহ্ম-যুবক আমাদের পাড়ায় থাকত,—তাকে আমরা 'সাধনদা' বলে ডাকতাম। শীত গ্রীষ্ম সব ঋতুতে সে খালি গায়ে একটা মোটা লাঠি বগলে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। খালি গা, খালি পা আর কোমরে কাপড় জড়ানো—এই ছিল তার সব সময়ের পোষাক। কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানেও সে এই বেশেই যেত। তার ভাইরা আমাদের স্কুলে পড়ত।

এই সাধনদার সকালের জলযোগ ছিল বেশ মজার। সে রোজ ভোরে অজিতদের বাড়ীতে আসত। অজিতদের উঠানে একটা প্রকাণ্ড নিম গাছ ছিল। সাধনদা সেই গাছ থেকে তার মোটা লাঠির সাহায্যে রাশি রাশি কাঁচা নিমপাতা পাড়ত আর "ওঁ ব্রহ্ম, ওঁ ব্রহ্ম" বলতে বলতে মুঠো মুঠো সেই কাঁচা নিমপাতা চিবিয়ে খেত। তার ঐ কাঁচা নিমপাতা চিবানো দেখে আমরা শিউরে উঠতাম।

সে বলত—"ওঁ ব্রহ্ম, ওঁ ব্রহ্ম করতে করতে এই নিমপাতা খাবি, তাতে শরীর ভালো হবে। আমার কখনো কোনো অসুখ করে না।"

আমাদের নতুন মাষ্টারমশাই প্রায়ই কোনো না কোনো অসুখে ভোগেন, তাঁর স্বাস্থ্য আর ভালো হয় না। একদিন তাঁকে সাধনদার ওষুধের কথা বল্লাম।

মাষ্টারমশাই বল্লেন—"আমি ছাগল না গরু যে কাঁচা পাতা চিবিয়ে খাব।" তারপর কি ভেবে বল্লেন—"আচ্ছা ২।৪টা পাতা জোগাড় করে' দিও তো,—একবার পরীক্ষা করে' দেখি। শরীরটা বড়ই খারাপ লাগে।"

সাধনদার সঙ্গে দেখা হতেই এ খবরটা দিলাম—"মাষ্টারমশাই নিমপাতা খাবেন।"

পরের দিন সকালে দেখলাম একটা প্রকাণ্ড নিমগাছের ডাল হাতে নিয়ে সাধনদা আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির।—"ওরে, কে নিমপাতা খাবি ?"—বলেই আমাদের রোয়াকে বসে "ওঁ ব্রহ্ম, ওঁ ব্রহ্ম" বলে নিজেই নিমপাতা চিবুতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে মাষ্টারমশাইতো "থ" খেয়ে গেলেন।

"না, আমি নিমপাতা খাব না, খেতে পারব না, মরে যাই সে-ও ভালো।"

সাধনদা "ওঁ ব্রহ্ম, ওঁ ব্রহ্ম" করতে করতে বগলে লাঠি নিয়ে চলে গেল।

মাষ্টারমশাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বল্লেন—"যত সব পাগলের কাণ্ড। সাধন, বিরূপাক্ষ, সব পাগল, সব পাগল।"

বল্‌তে বল্‌তে মাষ্টারমশাই বারেবারে থুতু ফেলবার জন্যে বাইরে যেতে লাগলেন। মনে হোলো তিনি যেন সত্যিই কাঁচা নিমপাতা চিবিয়েছেন।

তাঁকে বারেবারে বাইরে যেতে দেখে বল্লাম—"আপনি বারে বারে থুতু ফেলতে বাইরে যাচ্ছেন কেন। আমাদের নগেন মাষ্টারের মত কায়দা করুন না কেন।"

নতুনমাষ্টার বল্লেন—"সে কি রকম কায়দা ?"

আমি বল্লাম—"আমি আর বসন্ত এক মাষ্টারের কাছে তাঁর বাড়ীতে পড়তে যেতাম। সেই মাষ্টারমশাইও প্রায়ই অসুখে ভুগতেন। একদিন পড়তে গিয়ে দেখি তিনি শুয়ে আছেন, জ্বর হয়েছে। তিনি বল্লেন—"আমি আজ শুয়ে শুয়েই তোমাদের পড়াব,—উঠতে পারছি না।"

আমরা তাঁর বিছানার পাশে বসে পড়ছি—এমন সময় তিনি থুতু ফেলবার জন্যে ঘাড়টা তুললেন। প্রশ্ন করলাম—"থুতু ফেলতে বাইরে যেতে হবে তো,—ঘরে তো কোনো পিকদানী নাই।"

মাষ্টারমশাই বল্লেন—"তা বুঝি জানো না, একটা নতুন

কায়দা আবিষ্কার করেছি, এই গ্যাখো”—বলে বালিশের পাশ থেকে একটা পুরাণো পোষ্টকার্ড হাতে নিয়ে তাতে থক্ করে এক ধ্যাবড়া কফ্ শুদ্ধ থুতু ফেলে আবার সেটা বালিশের পাশে সযত্নে রেখে দিলেন।”

আমাদের গা ঘিন্ ঘিন্ করে উঠ্‌ল। ভালো করে' তাকিয়ে দেখ্‌লাম তাঁর বালিশের পাশে আরো অনেক ঐ ধরণের মাল-ভর্তি পোষ্টকার্ড জমে আছে। আজ সমস্ত দিনই তিনি তাঁর নতুন আবিষ্কারটি এইভাবে সার্থক করছেন।

বসন্ত ঠিক পাশেই বসেছিল, আমি তাকে ইঙ্গিত করে' সরে' বস্‌তে বল্লাম,—না হলে তার জামায় ঐ অমূল্য গবেষণার সার বস্তুটির ছাপ লাগতে পারে।

আমার কথা শুনে নতুন মাষ্টারমশাই হো-হো করে' হেসে বল্লেন—“এ-ও আর এক ধরণের পাগল। ইস্ কি নোংড়া।”

আরো পাগলের কথা আমার মনে আস্‌ছিল কিন্তু হঠাৎ বাবার গলা শোনা গেল—“ওরে, তোর Historyটা ভালো করে' পড়্।”

পাগলের কথাই যখন উঠলো, তখন আরো দুই একজনের কথা বলতে ইচ্ছা করছে।

পেরু নামে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের ছেলের মাথা খারাপ হয়ে যায়। তাকে আমরা ছেলেবেলা থেকেই দেখছি,—আমাদের থেকে বয়স অনেক বেশী। সে প্রায়-দিনই দুপুর বেলা আমাদের মামাবাড়ীতে আসত এবং খেতে চাইত। বেশ মনে পড়ে, তাকে পরিপাটি করে' খাওয়ানো হোত। সে আমাদের বাড়ীতেও খেত। তাকে দেখলেই বুঝতাম সে খেতে এসেছে। এই রকম বাড়ী বাড়ী সে খেয়ে বেড়াত। তার অন্য কোনো দাবী ছিল না। একদিন শীতকালে শুধু একবার আমার মেজমামার কাছে একজোড়া জুতো চেয়েছিল। মেজমামা তাকে দুই আনা পয়সা

দিলেন। তাতে সে দুঃখ করে' বলেছিল "নিতু নিতু, দু আনা কি পায়ে দেব ?"

পেরুদের অবস্থা ভালোই ছিল। এক জোড়া কেন অনেক জোড়া জুতো সে পরতে পারতো। কিন্তু তার ঐ পাগলাটে স্বভাব দেখে বাড়ীর কেউ তাকে কিছু দিতে চাইত না। একবার তার আঙুলের একটা সোনার আংটি সে কাকে যেন দিয়ে দিয়েছিল।

সে ছোট বড় সবাইকে তুই বলে সম্বোধন করত। তাতে কেউ কিন্তু অসন্তুষ্ট হোত না।

আমার এক সহপাঠির মামাও ছিলেন একটু ক্ষ্যাপাটে ধরণের। তাঁর কথাগুলি ছিল আড়ষ্ট। আমরা তাঁকে "গিট্‌লে মামা" বলে ডাকতাম। কোনো কথাই তিনি পরিষ্কার উচ্চারণ করতে পারতেন না। কথাগুলো গিট্‌ পাকানো ছিল বলে আমরা নাম দিয়েছিলাম "গিট্‌লে মামা"। তিনি রোজ বিকালে আমাদের খেলার মাঠে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতেন।

আমরা বলতাম, "গিট্‌লে-মামা, খেলতে নামো।"

তিনি বল্‌তেন—"আমি ওর ঢার ডিয়েও যাই না।"

একদিন তিনি মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় আমার আর এক বন্ধু পিছন থেকে ল্যাং মেরে তাকে উল্‌টে ফেলে দিল।

মামাও তাকে সবলে চেপে ধরলেন—"ডাঁড়া ডেকাচ্ছি।"

মামার গায়ে বেজায় জোর ছিল। তিনি বন্ধুটিকে মাটিতে চেপে ধরে' কাবু করে' ফেল্লেন। মামা বেজায় রেগে গেছিলেন। আমরা দৌড়ে এসে তাদের ছাড়ালাম।

আমাদের আর একজন বলিষ্ঠ বন্ধু মামার গায়ের জোর দেখে বল্লে—"এসো মামা, আমার সঙ্গে কুস্তি লড়ো"।

মামা কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বল্লেন—"আমি ওর ঢার ডিয়েও যাই না।"

এই গিট্‌লে-মামাকে নিয়ে আমরা বেশ মজা কন্নতাম।—

যা করতে বলতাম তাতেই বল্‌তেন—"আমি ওর ঢার ডিয়েও যাই না।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব কাজেই যোগ দিতে চেষ্টা করতেন।

একদিন আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে মামাকে ধরলাম—"মামা, যামিনীর দোকানে ভালো পান্তোয়া তৈরি হয়েছে। হয় তুমি আমাদের খাওয়াও, কিম্বা আমরা তোমাকে খাওয়াই।"

মামা তাঁর মামুলি উত্তর দিলেন—"আমি ওর ঢার ডিয়েও যাই না।"

আমরা বল্লাম "এসো, আমরা তোমাকে খাওয়াই।"

একজন বল্লে—"মামা খেয়ে-দেয়ে দাম দেবো তো!"

মামা বল্লেন—"আমি ওর ঢার ডিয়েও যাই না।"

মামা পান্তোয়া খেয়ে সন্তুষ্ট হলেন।

পাখী বল্লে—"মামা পান্তোয়া খেয়েছ, পয়সা দাও। আমরা সবাই নিজের নিজের পয়সা দিচ্ছি।"

মামা উঠে পড়লেন, বল্লেন—"আমি ওর ঢার ডিয়েও যাই না।"

বলেই তিনি সটান্ বড় রাস্তায় পা বাড়ালেন। পয়সাটা আমাদেরই দিতে হোলো।

আর একজন গিরিডির বড় ডাক্তারের কথা আজ মনে পড়ছে। তাঁর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছিল। তাঁর হাতে আমরা লোহার বালা পরা দেখেছি। তিনি যখন রোগী দেখতেন কি ব্যবস্থাপত্র লিখতেন—কোনো ভুলচুক হোত না,—কিন্তু অন্য সময় তাঁর পাগলামি দেখা যেত।

একবার আমার সেজমামার (চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা) অসুখ তিনি দেখতে আসেন।

আগের দিন রাত্রে আমাদের কোনো আত্মীয় এসেছিলেন। তিনি হাঁড়ি করে' কিছু খেজুর-গুড় এনেছিলেন। দুটো হাঁড়িতে সেই গুড়গুলি বারান্দার উপর রাখা ছিল।

ডাক্তারবাবু রোগী দেখে যাবার সময় বারান্দা থেকে দুহাতে

ছুটো হাঁড়ি তুলে বেশ গট্ গট্ করে' বেরিয়ে গেলেন। যেন নিজের জিনিষই তিনি নিয়ে যাচ্ছেন।

তাঁর এক ছেলে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌ত। সে বল্লে—"বাবা, এঁদের গুড় নিয়ে যাচ্ছ কেন ?"

ডাক্তারবাবু বল্লেন—"তোকে তালগাছের ডগায় বেঁধে রাখব।"

ডাক্তারবাবুর ছেলে অবশ্য সেই গুড়ের হাঁড়ি পরে ফিরিয়ে দিয়ে গেছিল। ডাক্তারবাবুর জন্যে কিছুটা গুড় পরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আমাদের পাড়ায় আর একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত ছিল। তাকে আমরা 'পাগ্‌লা-পণ্ডিত' বলে ডাক্‌তাম।

সে যখন পথ দিয়ে চল্‌ত, ক্রমাগত হল্লা করে' শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে যেত। আমরা বুঝতাম 'পাগ্‌লা-পণ্ডিত' যাচ্ছে।

সে প্রায়ই থাক্‌ত বারগণ্ডার কালীমণ্ডায় অর্থাৎ কালীর মণ্ডপে। এখানে কালীপূজা, দুর্গাপূজা ইত্যাদি হোত।

কালীমণ্ডার পাশেই অজিতদের বাড়ী। আমরা প্রায় রোজই অজিতদের বাড়ীতে যেতাম—আর পাগ্‌লা পণ্ডিতের পাগ্‌লামি দেখতাম।

সে অনর্গল চিৎকার করে', গীতা, চণ্ডী, আর ভাগবতের শ্লোক আওড়াতো। নতুন লোক শুন্‌লে মনে করত সে বুঝি কারুর সঙ্গে ঝগড়া করছে।

আমরা তখন সংস্কৃত বই 'প্রবেশিকা' পড়ি। তার সংস্কৃত শ্লোকগুলি আমাদের মুখস্থ। আমরা মধ্যে মধ্যে পণ্ডিতের সাম্‌নে ঐ সব শ্লোকগুলি চিৎকার করে' বলে যেতাম আর পণ্ডিতও তার উত্তরে গীতা-চণ্ডীর শ্লোক ঝাড়্‌ত। লোকে ভাবত আমরা বুঝি পণ্ডিতের সঙ্গে সংস্কৃত-শাস্ত্রের কোনো পাণ্ডিত্যপূর্ণ তর্ক করছি।

পণ্ডিত যখন সত্যি কারুর উপর রেগে যেত, অম্‌নি পাড়া কাঁপিয়ে তার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করত। আমরা তাকে সহজে ঘাঁটাতাম না।

—তেত্রিশ—

আমাদের ক্লাশে মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য নামে একটি ছেলে ছিল। সে স্কুলে আসত অনেকদূর থেকে, অর্থাৎ তিন চার মাইল পথ হেঁটে আসত। তাকে আমরা 'মেতা' বলে ডাকতাম।

তার একটা মজার অভ্যাস ছিল, ক্লাশে যখন কোনো মাষ্টার আস্‌তেন না,—তখন সে একমনে 'ডেস্কে' চাঁটি দিয়ে তবলার বোল্ তুল্‌ত।

আমরা হয়তো গল্পগুজোব করতাম, হুড়োহুড়ি করতাম—কিন্তু মেতা একমনে 'ডেস্ক' বাজিয়ে যেত ; মধ্যে মধ্যে মুখ দিয়ে বোল্ আওড়াত "তেরে কেটে তাক্—গদি ঘি-না-ধা।"

একদিন মেতাকে বল্লাম, "খোল বাজাতে পারিস্ মেতা !"

মেতা বল্লে—"ডুগী-তবলা বাজাতে পারি, খোল ঠিক পারি না।"

বল্লাম—"আমি খোল বাজাতে শিখেছি, চল্ আজ আমাদের বাড়ী, তোকে খোলের বাজ্‌না শোনাব, তুইও ওতে তবলার বোল্ তুলিস্।

স্কুল ছুটির পর, মেতাকে বাড়ীতে নিয়ে এলাম। খিড়কীর দরজা দিয়ে তাকে আমার ভিতরের ঘরে নিয়ে এলাম।

বাবার ভয়ে সদর দরজা দিয়ে ঢুক্‌লাম না। বাড়ী এসে শুন্‌লাম বাবা বাড়ীতে নাই।

আমাদের বাড়ীতে দু'খানা খোল ছিল। একটা বড় আর একটা ছোট আকারের।

ছোট খোলখানা নিয়ে মেতার সাম্‌নে ধরলাম।

মেতা খোলে তবলার বোল্ তুল্‌তে লাগলো, "তেটে ধিন্, তা তা ধিন্, ধাগে তেটে কেটে ধিন্।"

আমি বল্লাম—"খোলে কি তবলার বোল্ ওঠে রে, তার চেয়ে

আমি বাজাই শোন্", এই বলে বাজাতে লাগলাম দশকুশী তাল—

"তাক্ তা-তা ধিনা, নাক্ তা-তা ধিনা।" মেতা শুনে খুশি হোলো।

মেতা আমাকে বল্লে—"তুই আমাকে খোল শেখা আমি তোকে তব্লা শিখিয়ে দেই। তুই তাড়াতাড়ি শিখতে পারবি।"

আমি খোলে ধুম্বল্ তুলছি—এমন সময় দরজার পাশে ভুনেশ্বর দোবের মুখ দেখা গেল।

ভুনেশ্বর দোবে এক ছোকরা বামুন আমাদের বাড়ীতে নতুন বহাল হয়েছে,—রান্না-বান্না করে।

সে খোল দেখে বল্লে—"দাও, আমি বাজাই।"

বল্লাম—"পারো খোল বাজাতে?"

সে উত্তর দিল—"জাগর্ণাতে আমি ঢোল বাজাই।"

হিন্দুস্থানীদের মধ্যে জাগর্ণা একটা বিশেষ ধর্ম-অনুষ্ঠান। সমস্ত রাত ধরে' একটানা ঢোল আর বড় বড় করতালের সঙ্গে অবিরাম গান চলে। বাদক কি গায়কদল একটুও থামে না কি একটু বিশ্রামও করে না।

বাড়ীর কাছাকাছি জাগর্ণা হলে কানে তালা লাগবার জোগাড় হয়। এই উৎসবের উৎপাতে আমাদেরও ভুগতে হয়েছে।

ভুনেশ্বর ততক্ষণে আমার কাছে এসে খোলটা তুলে নিয়েছে আর তাতে নানা কায়দায় চাঁটি মারছে আর মুখে গৎ আওড়াচ্ছে—

"দু-দু মুঠি চিড়া দেহ, তানি এক দহি দেহ—"

মেতা আর আমিতো তার বাজনা শুনে একেবারে হাঁ হয়ে গেছি।

তাকে যত থামাতে যাই, সে ততই ঢোলের অন্য বোল্ ধরে—

"খুপ্‌রী আন্, চুব্‌ড়ী আন্,
চুব্‌ড়ী আন্, খুপ্‌রী আন্।

শেষে অনেক কষ্টে তাকে শান্ত করি। সে মুখ বিকৃত করে' বলে—"ইতে কি ঢোলের বোল্ উঠে, হামার ঢোল লিয়ে শুনাব—

ঝাঁপর ঝাই, খাঁপর খাই,
কাড়া-ভঁইস্, বয়েল-গাই,
ঝাচা-মাচা, ঝাচা-মাচা।

জাগর্ণার বোল্।"

বাজ্না পর্ব শেষ হতেই মেতা বল্লে—"চল্ একটু এগিয়ে দিবি। অনেকটা পথ যেতে হবে।"

তখন বেলা পড়ে এসেছে। মেতা যাবে সেই সুদূরের বেনিয়াডি অঞ্চলে—অনেকটা পথ।

মেতাকে এগিয়ে দিতে অনেকখানি পথ চলে গেলাম। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি সন্ধ্যার আকাশে চাঁদ উঠেছে। সর্বনাশ, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সন্ধ্যার আগেই আমাদের বাড়ী ফিরবার নিয়ম,—দেরী হলে বাবা ভীষণ রাগারাগি করেন।

মেতাকে বিদায় দিয়ে প্রাণপণে ছুট্ দিলাম বাড়ীর দিকে। হেঁটে যেতেও আর সাহস হচ্ছে না। বাবার ভয়ে পিছন দিকের এক পাঁচীল টপ্কে বাড়ীতে ঢুক্লাম।

ঢুকেই ভিতরের ঘরে চুপে চুপে পড়তে বস্লাম। ভাগ্যিস্, বাবা তখনো বাড়ী ফেরেন নাই।

মা বল্লেন—"এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

বল্লাম—"এক বন্ধুকে এগিয়ে দিতে গেছিলাম।"

মা বল্লেন—"উনি জান্লে ভীষণ রাগারাগি করবেন। সন্ধ্যার অনেক পরে বাড়ী এসেছ।"

বাইরে থেকে নতুনমাষ্টার ডাক্লেন—"নির্মল, বাড়ী এসেছ?"

বল্লাম—"হাঁ, পড়ছি।"

তিনি বল্লেন—"এদিকে এসে পড়। Historyটা ভালো করে' পড়তে হবে।"

নতুন মাষ্টারমশাইয়ের কাছে গিয়ে খুব চিৎকার করে' A. C. Mukherjeeর ইতিহাসখানা পড়তে লাগলাম।

"Altamas was succeeded by his son Ruknuddin, who was soon diposed to make room for Razia."

এমন সময় বাবা বাড়ী ফিরলেন। তিনি আমাকে জোরে জোরে পড়তে দেখে খুব খুশি হলেন। বল্লেন—"England's works in India বইটাও ভালো করে' পড়্। ওর থেকেও ৩০ নম্বর পরীক্ষায় আস্‌বে।"

N. N. Ghoseএর লেখা "England's works in India" বইখানা ইংরাজের গুণকীর্তনে ভর্তি। সদাশয় মহিমময় ইংরাজ প্রভুরা আমাদের দেশে এসে আমাদের উপকারের জন্যে কি কি মহাকীর্তি করেছেন তারই ফিরিস্তি। আমাদের 'কুইনাইন' গেলার মত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তা কণ্ঠস্থ করতে হোত।

আমার কিন্তু একটুও ভালো লাগত না।

—চৌত্রিশ—

আমাদের ক্লাসে প্রতুল নামে একটি ক্ষুদে ছেলে ছিল। বয়সও অল্প, আর দেখতেও খুব ছোট ছিল।

ফুলবাবু সেজে সে ক্লাশে আসত। ফিন্‌ফিনে ধুতী আর রং-বাহারী জামা পরত।

সব সময়ে সে সুপারী চিবাতো আর কথায় কথায় 'মাইরি' বলত।

'মাইরি' শুনলে আমাদের বাংলার মাষ্টার হিমাংশুবাবু খুব চটে যেতেন।

—"খবরদার, কখনো যেন তোমার মুখে মাইরি কথা আর না শুনি। ওটা বিশ্রী কথা।"

হিমাংশুবাবুর ধমক খেয়ে প্রতুল সুপারীর ঢোঁক গিলে বল্লে—"না স্যার—আর বলব না।"

পরের দিনই হিংমাংশুবাবুর ক্লাসে সে একটু দেরী করে' ঢুকেছিল।

হিমাংশুবাবু প্রশ্ন করলেন—"কোথায় ছিলে এতক্ষণ? আড্ডা দিচ্ছিলে বুঝি?"

প্রতুল সুপারী চিবাতে চিবাতে বল্লে—"মাইরি, না স্যার।"

হিমাংশুবাবু উঠে গিয়ে তার পিঠে দুই চার ঘা রদ্দা লাগালেন, —"বখাটে ছেলে, আবার ঐ কথা বলছ।"

সে এইবার মুখ কাচু-মাচু করে' বল্লে—"মাইরি স্যার, আর মাইরি বলব না।"

হিমাংশুবাবু রেগে-মেগে তাকে হিড়্‌হিড়্‌ করে' টানতে টানতে নিয়ে জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন।

প্রতুল যে হিমাংশুবাবুকে অশ্রদ্ধা করে' মাইরি বল্‌ত তা নয়।

ও শব্দটা তার একেবারে অস্থি-মজ্জাগত হয়ে গেছিল। এ রোগ সারতে তার অনেক সময় লেগেছিল।

আমাদের ক্লাশে আর একটি ছেলে ছিল, তার নাম নবা। বয়সে সে আমাদের চেয়ে অনেক বড় ছিল—সিগারেট, বিঁড়ি খেত, আর একেবারে পিছনের বেঞ্চে বস্‌ত।

একদিন এক মাষ্টার তার কাছে গিয়ে তার বাহারী চুলে হাত দিয়ে বল্লেন—"এ চুল কাটতে কত লেগেছে হে? বাটি বসিয়ে না গাম্‌লা বসিয়ে এ চুল ছাঁটা হয়েছে। কাল থেকে নেড়া হয়ে ক্লাসে আসবে।"

তারপর দিন থেকে নবা আর স্কুলে আসে নি। স্কুলের মায়া থেকে তার চুলের মায়া অনেক বেশী।

একবার হিমাংশুবাবু আমাদের ক্লাসে ড্রইং শেখাতে এলেন। সেদিন ড্রইং-মাষ্টার আসেন নি,—তাই তাঁর বদলে হিমাংশুবাবু একটা বড় রঙীন সিংহের ছবি এনে বোর্ডের পাশে টানিয়ে দিয়ে আমাদের বল্লেন—"এই সিংহের ছবি দেখে তোমরা যে-যা পারো, যে কোনো অংশ আঁকতে চেষ্টা কর। আধ ঘণ্টা সময় দিলাম।"

প্রকাণ্ড সিংহের ছবিটি দেখে আমরা সবাই—কেউ তার কান, কেউ তার নাক, কেউ পা—কেউ বা তার লেজ আঁক্‌তে সুরু করে' দিলাম।

এমন সময় হেবো নামে একটি ছাত্র দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—"আমার হয়েছে স্যার।"

হিমাংশুবাবু অবাক হয়ে বল্লেন—"সে কী, এর মধ্যেই হয়ে গেল, দেখি কি এঁকেছ।"

হেবো তার খাতাখানা নিয়ে হিমাংশুবাবুকে দেখাতেই তিনি বল্লেন—"কই, ছবি কই, ইয়ার্কি মারছ নাকি?"

হেবো ঘাড় চুলকে বল্লে—"এই যে দাগটা।"

হিমাংশুবাবু বল্লেন—"কিসের দাগ?"

হেবো তেমনি ঘাড় চুলকে বল্লে—"আপনি স্যার সিংহের যে কোনো অংশ আঁকতে বলেছেন—।"

হিমাংশুবাবু বল্লেন—"তবে এটা কি এঁকেছ ?"

হেবো উত্তর দিল—"আজ্ঞে, সিংহের লেজের একটা চুল।"

হেবোর কথা শুনে ক্লাস শুদ্ধ সবাইতো হেসেই অস্থির। হিমাংশু বাবুও হেসে উঠলেন।

আমাদের ক্লাশে প্রায় আধা-আধি হিন্দুস্থানী ছেলে ছিল—তাদের মধ্যে আবার সংখ্যায় কিছু মুসলমান। এদের ভিতর খুবলাল মিস্ত্রি, মদনলাল মাড়োয়ারী, আবদুল্ রেজাক,—এরা পড়াশুনায় বেশ ভালো ছিল। একটি খৃষ্টান ছেলে পড়ত—জেরালড্ ডেভিড গেড্। খুব ভালো ছেলে, সাদা প্যান্ট-কোট পরে' সাইকেল করে' স্কুলে আসত।

কিন্তু সবার উপরে ছিল আমাদের বসন্ত। বসন্তের সঙ্গে কোনো বিষয়ে কেউ পারত না। তাই বসন্তকে ক্লাসের সবাই ভালোবাসত।

একদিন আমাদের ক্লাসে এক মাষ্টার এসে বিহারী ছেলেদের ইংরাজীতে প্রশ্ন করলেন—"তোমাদের মধ্যে কে-কে বিবাহিত ?" এই বলে তিনি তাদের এক এক করে' প্রশ্ন করতে লাগলেন—"তুমি বিয়ে করেছ—তুমি তুমি তুমি ?"

প্রশ্ন শুনে আমরা বাঙালী ছেলেরাতো একেবারে হতভম্ব,—স্কুলের ছেলে আবার বিয়ে করবে কি ?

কিন্তু উত্তর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম—। প্রায় সব বিহারী ছেলেই "Yes Sir, Yes Sir" বলে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিল।

আবার আমাদের বিস্ময়ের মাত্রা বাড়্ল।—মাষ্টারমশাই প্রশ্ন করলেন—"Any children ? কারুর কোনো ছেলে-মেয়ে আছে ?"

"আবার তাদের দিক থেকে মৃদু উত্তর পাওয়া গেল—"Yes Sir. Yes Sir."

বলে কি ?

পরে জানলাম,—কারুর চারটি ছেলে, কারুর তিনটি মেয়ে—বড়টির আবার বিয়ে হয়ে গেছে।

এতগুলি বাবা যে আমাদের সঙ্গে পড়ছে তাত জানতাম না,—বেশ গর্ব বোধ করলাম।

আমাদের তাক লাগাবার জন্যে রঘুনন্দন দেও নামে আমাদের ক্লাশের একজন হিন্দুস্থানী ছেলে একদিন ঘোড়ার পিঠে একটি খোকাকে নিয়ে এলো। সে ঘোড়ায় চড়েই আসত।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—"খোকাটি কে রঘুনন্দন—ভাই বুঝি ?"

রঘুনন্দন হেসে বল্লে—"লেড়্‌কা।"

আর একটি হিন্দুস্থানী ছেলে ছিল আকারে খুব লম্বা। নাম তার ভিখু ত্রসাদ।

তার মগজে বিশেষ কিছু ঢুকত না—তবু তার পড়ার উৎসাহ ছিল প্রবল।

একদিন তাকে কি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হোলো, সে তার উত্তর দিতে পারল না।

মাষ্টারমশাই প্রশ্ন করলেন—"Do you eat grass ?"

সে বল্লে—"Yes sir."

তার উত্তর শুনে ক্লাশ শুদ্ধ আমরা হেসে উঠ্‌লাম। সে বেচারা অপ্রস্তুত হোলো।

একদিন স্কুলে টিফিনের সময় আমরা ক্লাসের ছেলেরা একটু দূরে একটা গাছের তলায় বসে গালগল্প করছি, কোন্ সময়ে ক্লাশের ঘন্টা পড়ে গেছে আমাদের খেয়াল নাই।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি স্কুলের অন্যান্য ছেলেরা সবাই নিজের নিজের ক্লাশে চলে গেছে,—ঘন্টা পড়ে গেছে।

সবাই ছুট্‌লাম ক্লাশের দিকে। তখন আমাদের অঙ্কের ক্লাশ। অঙ্কের মাষ্টার গাঙ্গুলীমশাই বেজায় কড়া লোক, একটু নাকী সুরে কথা বলেন।

আমরা একে একে যেই ক্লাশে ঢুক্‌তে গেছি—মাষ্টারমশাই দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন—তিনি এক একজনকে গলাধাক্কা দিয়ে ক্লাশ থেকে বার করে' দিলেন।

তিনি এক একটি ছেলেকে গলাধাক্কা দেন আর নাকী সুরে বলেন—গেঁট্‌ আঁউট, গেঁট্‌ আঁউট।"

সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ও অপদস্থ হয়ে আমরা আবার গাছতলায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। এ বড় অন্যায়, এখন আমরা বড় হয়েছি, একটু দেরী হয়ে গেছে বলে আমাদের গলাধাক্কা দেওয়া!

একজন বল্লে,—"আচ্ছা দাঁড়া, এর প্রতিশোধ নেব। গাঙ্গুলী-মশাই রোজ বিকালে সাইকেল শেখেন, তাঁকে সাইকেল থেকে ফেল্‌তে হবে।"

এমন সময় দেখলাম দূর থেকে বসন্ত হন্ত-দন্ত হয়ে আস্‌ছে। টিফিনে সে বাড়ী গেছিল কি একটা কাজে।"

আমাদের দেখে বল্লে—"কি রে ক্লাশে গেলি না!"

আমরা গলাধাক্কার কথাটা বে-মালুম চেপে গিয়ে বল্লাম—গাঙ্গুলীমশাই আমাদের বাড়ীর অঙ্ক দেখে খুশি হয়ে—আমাদের ছুটি দিয়েছেন। তুই শীগ্‌গির যা—তোর জন্যে ক্লাশে অপেক্ষা করছেন।"

বসন্ত অতি দ্রুতপায়ে ক্লাশের দিকে ছুটে গেল, এবং তারপরই দেখি সে ঘাড় নীচু করে' আমাদের দিকে ফিরে আস্‌ছে।

আমরা বল্লাম "কী রে, কি হোলো!"

বসন্ত ঘাড়ে হাত দিয়ে বল্ল—"যা—তোরা আগে বল্লি না কেন? যা অর্ধচন্দ্র দিয়েছে, ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেছে।"

একজন বল্লে—"আমরা সবাই গুড়পিঠে খাব আর তুমি ছাড়া পাবে, এ কি আর হতে পারে চাঁদু।"

'গুড়পিঠে' কথাটা আমাদের অন্য একজন মাষ্টার পদ্মলোচন বাবুর কথা।

তিনি চোখে ভালো দেখ্তে পেতেন না তবু তাঁর নাম ছিল পদ্মলোচন।

তাঁর ধারণা ছিল, ছেলেরা মার-ধোর না খেলে তাদের মাথা খোলেনা।

তিনি ক্লাশে এসে এক একজনকে এক একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। না পারলে, তার পিঠের উপর বিরাশি সিকার এক এক ঘুঁসি ঝেড়ে বল্তেন—"খাও এই গুড়পিঠে।" এক একদিন আমরা ক্লাস শুদ্ধ সবাই গুড়পিঠে খেতাম।

আর একজন বিহারী মাষ্টার আমাদের পড়াতেন। নাম ছিল তাঁর রত্নেশ্বর। বাস্তবিকই তিনি একটি রত্নবিশেষ ছিলেন। আড়ে-বহরে তিনি ছিলেন সবার সেরা,—অত স্থূলকায় লোক সহজে নজরে পড়ে না।

মার তো মার,—তিনি একবার ধমক দিলেই আমাদের অবস্থা হোত কাহিল।

একবার ঘুঁসি মেরে তিনি একটি ছোট ছেলের নাক ফাটিয়ে দিয়েছিলেন।

তার দাদা আমাদের সঙ্গে পড়ত। ভাইয়ের দুর্দশা দেখে সে ক্ষেপে গেল। ছেলেটির নাক দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে' রক্ত ঝরছে—বন্ধুটি রত্নেশ্বরবাবুকে বল্লে—"আপনার নামে মাম্‌লা করব।—" রত্নেশ্বরবাবু হেসে বল্লেন—"Nothing Serious, nothing Serious, হাতের হাওয়া লেগে রক্ত পড়ছে।"

—পঁয়ত্রিশ—

একদিন নতুন মাষ্টারমশাই আমাকে বল্লেন, "নির্মল, আমাকে সাইকেল চড়া শেখাও।"

—"আপনি জানেন না?"

—"দেশে অল্প অল্প শিখেছিলাম—একটু ভালো ভাবে শিখতে চাই।

—"আচ্ছা, আমাদের বাড়ীতে এখন ছুটো সাইকেল আছে, আপনাকে সাইকেলে একেবারে পাকা করে দেব।"

বাড়ীর কাছের মাঠে মাষ্টারমশাইকে সাইকেল শেখাতে লাগ্‌লাম। এ বিষয়ে আমি হলাম নতুন মাষ্টারের মাষ্টার।

মাষ্টারমশাই মাঠের মধ্যে ল্যাগ্‌ব্যাগ্‌ করে' সাইকেলে ঘুরপাক্‌ খান। একদিন বল্লাম—"আপনি তো এখন বেশ শিখেছেন, এইবার আসুন আমার পিছনে পিছনে, রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা যাক্‌।"

নতুনমাষ্টার রাজি হয়ে গেলেন। আমি একটি সাইকেলে বড় রাস্তায় গিয়ে উঠলাম,—তিনি আর একটি সাইকেলে আমাকে অনুসরণ করলেন।

প্রশস্ত ঢালু রাস্তা নদীর দিকে চলে গেছে। সাইকেল সোঁ সোঁ করে' ছুটে চলেছে। মাষ্টারমশাইয়ের বড় আনন্দ,—তিনি কারণে-অকারণে বেল্‌ বাজাচ্ছেন—ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং।

সেই বাঁক—যেখানে একদিন আমি বৈরাম খাঁর সাইকেল নিয়ে পড়ে গেছিলাম,—সেখানে এসে উপস্থিত হলাম।

বোঁ করে' সাইকেল নিয়ে ডান দিকে ঘুরে গেলাম, কারণ এখন আমি ওস্তাদ হয়ে গেছি।

মাষ্টারমশাই বাঁক ঘুরতে না পেরে সোজা ঢালু পথে চল্লেন।

সত্যি কথা, সাইকেলই মাষ্টারমশাইকে নিয়ে গড়ানো পথে গড়িয়ে চল্ল।

আমি ফিরলাম,—মাষ্টারমশাইকে অনুসরণ করে' সাইকেল চালালাম।

আমি আবার আগে চল্লাম। কিছুদূর গিয়ে দেখি রাস্তার এক জায়গায় অনেক মাটি ফেলা হয়েছে,—রাস্তা মেরামত হচ্ছে।

মাষ্টারমশাইকে বল্লাম—"জোরে চলে আসুন এই ঝুরো মাটির উপর দিয়ে"—এই বলে আমি সবেগে ঐ জায়গাটা পার হয়ে গেলাম।

একটু পরেই শুনলাম ঝন্-ঝন্ ঠন্-ঠিন্। তাকিয়ে দেখলাম মাষ্টারমশাই সাইকেল নিয়ে পড়ে গেছেন।

মাষ্টারমশাইয়ের কাছে এসে তাঁকে হাত ধরে' তুললাম, সারা গায়ে ঝুরো লাল মাটি লেগেছে,—জায়গায় জায়গায় ছড়ে গেছে।

যাক্, মাষ্টারমশাইয়ের সাইকেল চড়ায় ভীষণ উৎসাহ,—তিনি আবার সাইকেল চড়লেন।

আমি বল্লাম,—"প্রথম প্রথম সাইকেল থেকে আমরা অনেক পড়েছি,—কাজেই দমা উচিত নয়।"

মাষ্টারমশাই বল্লেন—"আমি অত সহজে দমি না। চালাও সাইকেল।"

সেদিন ঘণ্টাখানেক সাইকেলে ঘুরতে মাষ্টারমশাই সাতবার উল্‌টে পড়লেন। যত বিশ্রী বাঁক আর জঘন্য রাস্তায় মাষ্টারকে নিয়ে গেছিলাম তাঁকে ওস্তাদ তৈরি করতে।

বাড়ী এসে মাষ্টারমশাই সোজা বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

—"টিংচার আয়োডিন আছে।"

—"কেন কেটেছে নাকি?"

—"পা থেকে মাথা পর্যন্ত কোথাও বাদ নাই।" মাষ্টারমশাই ভাইদের কাছে বল্লেন—"নির্মল ভারী শয়তান ছেলে, আমা'ক

আঘাড়ে-ভাগাড়ে নিয়ে জব্দ করেছে। ওর সঙ্গে আর সাইকেল চড়ব না।"

সুকোমল বল্লে—"সাইকেল ভাঙেনি তো? তা হলে বাবা আর আপনাকে আস্ত রাখবেন না।"

মাষ্টারমশাই বল্লেন—"আমার জন্যে তোমার দুঃখ হচ্ছে না, যত দুঃখ সাইকেলটার জন্যে?"

ততক্ষণে মেজভাই সুবিমল গিয়ে সাইকেলটা পরীক্ষা করতে লাগ্‌লো—"চাকায় টাল খেয়েছে, পিছনের ব্রেকটা ঢিলে হয়েছে, সিট্‌টা বেঁকে গেছে"—ইত্যাদি।

রাত্রে মাষ্টারমশাই বল্লেন—"আমি আজ ঘরেই খাব, সমস্ত শরীরে ব্যথা হয়েছে,—হাঁটু নাড়তে পারছি না।"

আমরা সব কয়টি ভাই-ই খুব ভালো সাইকেল চালাতে পারতাম।

শুধু সাইকেল চালাতেই নয়, সাইকেলে উঠে কত রকম কায়দা করতাম।

চলন্ত সাইকেলে পদ্মাসনে বসতাম, দুহাত ছেড়ে সাইকেলে বাঁক ঘুরতাম, একপায়ে 'প্যাড্‌ল' করতাম—আরো কত কি।

সার্কাসে সাইকেলের খেলা দেখেছিলাম,—একটা চাকা উপরে তুলে শুধু এক চাকায় সাইকেল চালানো হচ্ছে, চলন্ত সাইকেলে পা উপরে তুলে হাত দিয়ে 'প্যাড্‌ল' ঘুরানো হচ্ছে, চলন্ত সাইকেল থেকে নেমে আবার কায়দা করে' সেই চলন্ত সাইকেলেই উঠে যাচ্ছে—ইত্যাদি কত কৌশলই না আমরা দেখেছি।

আমরা চেষ্টা করেও পারতাম না। কত আছাড় খেয়েছি,—কত চোট লেগেছে।

একদিন বাবা দেখতে পেয়ে আমাকে ধমকে দিলেন—"পরীক্ষার আগে আর সাইকেল চেপে কাজ নাই। হাত-পা ভাঙলেই পরীক্ষার দফা রফা।"

ছোটুয়ার একটা সাইকেল ছিল। তাতে না ছিল ব্রেক, না ছিল বেল, না ছিল চাকার উপরে কোনো 'মাড্ গার্ড।' সাইকেলটা ছিল যেমনি ভারী তেমনি উঁচু।

এই সাইকেলে ছোটুয়া মির্জাগঞ্জ নামে এক শহরে 'গুরু ট্রেনিং' পড়তে যেত। মির্জাগঞ্জ গিরিডি থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে।

এই রাস্তাটা ছোটুয়া তার এই আজব সাইকেলে অনায়াসে পাড়ি দিত।

একদিন তার কাছ থেকে সাইকেলটা চেয়ে আমি আমাদের বাড়ীর কাছের মাঠে ঘুরপাক্ খাচ্ছি,—ধারণা ছিল বাবা বাড়ীতে নাই, হঠাৎ শুনলাম বাবার গলা—"তোকে এত করে' মানা করলাম এখন সাইকেল চড়িস না,—আবার চড়েছিস্। শীগ্গির নাম্—।"

বাবার ধম্‌ক খেয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। ছোটুয়াকে সাইকেলটা দিয়ে দিলাম,—তারপর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম—ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া আর সাইকেল চড়্‌ব না।

নতুন মাষ্টারমশাই বল্লেন—"সাইকেল না চড়াই ভালো। গোঁয়ার লোকে সাইকেল চড়ে,—ভদ্রলোকের কি আর ওসব পোষায়?"

—ছত্রিশ—

ভালোয় ভালোয় 'টেষ্ট' পরীক্ষা দিলাম। যখন ফল বেরুলো তখন জান্‌লাম আমি বাংলা পরীক্ষায় বসন্তের চেয়ে আধ্ নম্বর বেশী পেয়ে প্রথম হয়েছি—অর্থাৎ বসন্ত পেয়েছে ৭১ আর আমি পেয়েছি ৭১½ ।

হিমাংশুবাবু খাতা দেখেছিলেন আর প্রশ্নপত্রও তিনি করেছিলেন।

বসন্ত বিকেলে আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির—"চল্ হিমাংশুবাবুর বাড়ী, খাতা দেখ্‌ব।"

—"তাই চল্!"

দুজনে উশ্রীনদীর তীরে হিমাংশুবাবুর বাড়ী এসে আমাদের বাংলা খাতা দেখতে চাইলাম।

হিমাংশুবাবু মুচ্‌কি হেসে বল্লেন—"কোন কিছু সন্দেহ হচ্ছে নাকি! দুজনেই ভালো লিখেছ,—এইবার আধ্ নম্বরের জন্যে সুনির্মলই প্রথম হয়েছে।"

এই বলেই হিমাংশুবাবু আমাদের খাতা দুখানা আমাদের দেখ্‌তে দিলেন।

খাতা দেখ্‌বার তেমন উৎসাহ আমার ছিল না—কিন্তু দেখি বসন্ত অধীর আগ্রহে আমার খাতাখানা দেখ্‌ছে—আর নম্বরগুলি এক সঙ্গে যোগ কর্‌ছে। হঠাৎ বসন্ত চিৎকার করে' উঠল—"ভুল, ভুল, স্যার, ভুল হয়েছে।"

হিমাংশুবাবু বাইরের রোয়াকে পায়চারি করছিলেন—বসন্তের কথা শুনে তিনি ভিতরে এসে প্রশ্ন করলেন—"কি ভুল দেখ্‌লে বসন্ত?"

বসন্ত বল্লে—"এই দেখুন স্যার, এই প্রশ্নটায় সব শুদ্ধ ৫ নম্বর ছিল, কিন্তু সুনির্মলকে ৬ দিয়েছেন।"

হিমাংশুবাবু হেসে বল্লেন—"তাই নাকি, দেখি—দেখি।"

সত্যিই তাই। একটা প্রশ্ন ছিল—তেপান্তরের মাঠ বল্‌তে তোমাদের কি ধারণা হয়! তাতে নম্বর ছিল ৫।—

হিমাংশুবাবু ভুল করে' তাতে আমাকে ৬ নম্বর দিয়েছেন,—বসন্ত পেয়েছে ৫।

হিমাংশুবাবু তৎক্ষণাৎ আমার এক নম্বর কেটে দিলেন। এবার আমি পেলাম ৭০½ আর বসন্ত পেল ৭১।

আধ নম্বরের জন্যে বসন্ত বাংলায় প্রথম হয়ে গেল। বসন্ত ভারি খুশি।

—"দেখ্‌লিতো—কেমন ভুল ধরলাম।"

আমি বল্লাম,—"তোর সঙ্গে আমি পারব কেন ভাই, বরাবর সব বিষয়েই তুই প্রথম হোস্‌। এবারে বাংলায় প্রথম হওয়ায় আমারও মনটা উস্‌খুস্‌ করছিল,—এতক্ষণে প্রাণটা শান্ত হোলো।"

বসন্ত পরম নিশ্চিন্তে বাড়ী চলে গেল।

হিমাংশুবাবু পরে আমাকে বল্লেন—"সত্যিই ভুল হয়ে গেছিল,—কিন্তু তুমি এত সুন্দর লিখেছ যে বসন্তের চেয়ে তোমাকে এক নম্বর বেশী দিয়ে ফেলেছিলাম। ওকে আর এক নম্বর কমিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। যাক্‌, যা হবার তা হয়ে গেছে। তুমি ভাল করে' পড়াশুনা কর—ম্যাট্রিকে ভালো হওয়া চাই।"

হিমাংশুবাবু আমাকে একটু বিশেষ স্নেহ করতেন, কাজেই বাংলা পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়ে যাওয়ায় তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হলেন।

আবার বল্লেন—"বসন্তের লেখাগুলি একটু সেকেলে ধরণের—কিন্তু তোমার রচনা-পদ্ধতি অতি সুন্দর। লেখায় একটা নিজস্ব ভঙ্গি আছে। কি সুন্দর 'essay' লিখেছ—তাতে কত সুন্দর সুন্দর 'Quotation' অর্থাৎ উদ্ধৃত অংশ, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা দিয়েছ, বড় চমৎকার, ভারি চমৎকার।—অবশ্য বসন্তের লেখাও বেশ—কিন্তু তোমার মত নয়।"

লজ্জিত হলাম। বসন্তের সঙ্গে কি আমার তুলনা।

সে সব বিষয়েই কত বেশী নম্বর পায়, আর আমি পাই কত কম নম্বর। অঙ্ক, সংস্কৃত যে কোনো বিষয়েই আমি তার ধারে কাছেও যাই না। অবশ্য 'ফেল'ও কোনো বিষয়েই করি না,—কিন্তু কার সঙ্গে কার তুলনা। বসন্ত বাংলায় প্রথম হবেনা তো কে হবে?

বাংলা পরীক্ষায় দ্বিতীয় হওয়ায় আমি মোটেই ক্ষুণ্ণ হই নি।

বসন্ত আমাদের শ্রেণীতে সব বিষয়ে প্রথম হয় বলে আমরা কত গর্ব করি।

একবার এক নতুন মাষ্টার এসে ক্লাশে প্রশ্ন করলেন—"Who is the first boy in your class?"

আমিই বুক ফুলিয়ে বলেছিলাম—"Basanta Kumar Datta, first in all Subjects."

ম্যাট্রিক পরীক্ষা সাম্‌নে এগিয়ে এসেছে,—আর মাত্র কয়েক দিন বাকী,—একদিন বাড়ীর নতুনমাষ্টারকে বল্লাম—"পরীক্ষা দিতে আমার ভয়ানক ভয় হচ্ছে।"—

নতুনমাষ্টার বল্লেন,—"ভয় কিসের হে, তোমারতো ভালোই পড়া হয়েছে, ভালো করেই পাশ করবে মনে হচ্ছে।"

বল্লাম—"ভয় তার জন্যে নয়, পরীক্ষা দিতে আমার মোটেই ভয় করছে না, তবে শুনেছি অন্য ব্যাপার।"

—"কি অন্য ব্যাপার?"

—"শুনেছি, পরীক্ষার সময় স্কুলে গুর্খা সৈন্যরা বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ একটু কাশ্‌লে বা হাস্‌লে অম্‌নি 'গুরুম্'।"

মাষ্টারমশাই হেসে উঠলেন—"এ আবার কে বল্লে?"

—"একজন মাষ্টার বলেছেন।"—

—"সব বাজে কথা,—তোমাকে ভয় দেখিয়েছে।—বন্দুক উঁচিয়ে গুর্খা থাকবে কেন? এ কি যুদ্ধের ঘাঁটি নাকি?

পরীক্ষা দিতে গিয়ে ছেলেরা যাতে ভড়্‌কে না যায় বরং তারই চেষ্টা করা হয় সেখানে।"—

—"তবে বন্দুক নিয়ে সৈন্যরা থাকে না ?—"

—"ছাই, ছাই, সেরেফ বাজে। বুক ফুলিয়ে যাবে,—পরীক্ষা দিয়ে বুক ফুলিয়ে চলে আসবে। —কিসের ভয় ?"

নতুন মাষ্টারমশাইয়ের কথায় কিছুটা ভরসা পেলাম।—

তিনি আবার বল্লেন—"তোমার বাবা বলে দিয়েছেন—তোমাকে পরীক্ষার সময় আমি এগিয়ে দিয়ে আস্‌ব রোজ।"

আমি বল্লাম—"গত বছর অজিত নাগরা পরীক্ষা দিতে যেত; টিফিনের সময় আমি তার জন্যে দুধ-সন্দেশ নিয়ে যেতাম। মা পাঠাতেন। কোনো দিনও গুর্খা সৈন্য দেখিনি।"

তিনি বল্লেন—"তবে বুঝে ছাখো,—ওটা একেবারে বাজে কথা।—"

আমি বল্লাম—"সেই মাষ্টারমশাই বলেছেন—এ বছর থেকে নাকি ঐ ব্যবস্থা হবে।—"

নতুনমাষ্টার বল্লেন—"ঘোড়ার ডিম হবে।—তোমার কোনো ভয় নাই। যে মাষ্টার তোমাকে মিথ্যে ভয় দেখিয়েছেন, তিনি বড় অন্যায় করেছেন। এ ভাবে ছাত্রদের ভয় দেখানো উচিৎ নয়। মাষ্টারটি কে-হে ?"

তাঁর নাম বল্লাম। নতুনমাষ্টার বল্লেন—"আমার সঙ্গে তাঁর একবার দেখা হলে হয়।—ভারি অন্যায়, বড় অন্যায়।"

মেয়েদের স্কুলের পণ্ডিতমশাইকে বাবা কিছুদিন আমাকে সংস্কৃত পড়াতে বল্লেন।

পরীক্ষার কিছুদিন আগে থেকে তিনি আমাকে সংস্কৃত পড়াতে লাগ্‌লেন।

সংস্কৃত আমি ভালোই জান্‌তাম,—পরীক্ষার নম্বর মন্দ পেতাম না। টেষ্ট পরীক্ষাতেও ভালো নম্বর পেয়েছিলাম।

এই পণ্ডিতমশাইটি ছিলেন বড়ই নিরীহ প্রকৃতির। খুব আস্তে আস্তে কথা বল্‌তেন,—ধীরে ধীরে পড়াতেন।

পরীক্ষার আগে আর কীইবা পড়াবেন। সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক দুখানি আমার আগাগোড়া মুখস্থ,—ব্যাকরণের শব্দরূপ, ধাতুরূপ পুরোপুরি কণ্ঠস্থ, আর যা পাঠ্য বা পঠিতব্য সবই প্রায় শেষ হয়ে গেছে,—নতুন আর কিছুই নাই।

তবু পণ্ডিতমশাই রোজই দুপুর বেলা আসেন—আর ইংরাজী থেকে সংস্কৃতের অনুবাদ করান,—কারক, তদ্ধিত, প্রত্যয়, সমাস প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেন; উদ্দেশ্য, বিধেয় প্রভৃতি শেখান, উপসর্গ ইত্যাদির শ্লোক শিখ্‌তে বলেন।

আমাদের স্কুলের পণ্ডিত নৃপতিবাবু অতি সরসভাবে আমাদের সংস্কৃত পড়াতেন। ক্লাশের মধ্যে তিনি খুব মজার মজার গল্প বল্‌তেন। তিনি উপসর্গ সম্বন্ধে একটা চমৎকার তোটক্ ছন্দের ছড়া আমাদের শিখিয়ে দেন—।

ছড়া খুব তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয় বলে—আমি আমার ইংরাজী ইতিহাসের বিখ্যাত কয়েকটি গোলমেলে নামের ছড়া তৈরি করে' মুখস্থ করেছিলাম। সেটা আমার পরে কাজে এসেছিল।

মেয়েদের স্কুলের পণ্ডিতমশাইকে আমার মুখস্থ-করা তোটক্ ছন্দের 'উপসর্গের' শ্লোকটি শোনালাম।

তিনি খুশি হলেন,—বল্লেন—"এতো চমৎকার শ্লোক—এটি মুখস্থ রাখবে।"

মেয়েদের স্কুলের পণ্ডিতমশাই আমাকে অল্পদিনই পড়ালেন,—বল্লেন—"এবার তুমি নিজেই পড়,—আর পড়াবার দরকার নাই। মোটামুটি তোমার শেখা হয়েছে,—এবার পুরানো পড়াই ভালো করে' ঝালাই কর।"

—সাঁইত্রিশ—

ম্যাট্রিক পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেল। নতুন মাষ্টারমশাই আমাকে রোজই সঙ্গে করে' স্কুলে নিয়ে যান্।

প্রথম দিন স্কুলে গিয়ে দেখি কোথায় বন্দুকধারী সৈন্যের দল, —তাদের টিকিরও খোঁজ নাই কোথাও। আশ্বস্ত হলাম।

আরো অনেক জায়গা থেকে ছেলেরা এসেছিল পরীক্ষা দিতে,—বালিকা-বিদ্যালয়ের মেয়েরাও এসেছিল।—এখানেই আলাদা একটি ঘরে তাদের পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। মনে পড়ে আমাদের সঙ্গে সেবারে খ্যাতনাম্নী শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী বসুও পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

কয়েকটি মুখ-চেনা ছেলেকেও দেখ্লাম। ওরা অনেক বছর ধরেই পরীক্ষা দিতে আসছে,—বিশেষতঃ দেওঘরের একটি লম্বা-চওড়া অবাঙালী ছেলেতো আমার বিশেষ পরিচিত। প্রতি বছরই তাকে পরীক্ষা দিতে দেখ্তাম।—তার উৎসাহ আছে।

মনে পড়ে গেল সুকুমার রায়ের একটি কবিতা—

"উনিশটি বার ম্যাট্রিকে সে
ঘায়েল হয়ে থাম্লো শেষে।"

কিন্তু এ ছেলেটি ঘায়েল হচ্ছে বটে কিন্তু থামছে না। আমাদের সঙ্গেও সে পরীক্ষা দিল, কিন্তু এবারও ঘায়েল হোলো।—আবার পরের বছরেও তাকে দেখ্লাম।

সব পরীক্ষাই ভালো দিলাম, এমন কি অঙ্কের পরীক্ষাও মন্দ হোলো না, কিন্তু মুশ্কিলে পড়লাম ইতিহাসের পরীক্ষা নিয়ে। বেশীর ভাগই কঠিন—ঘুরানো প্রশ্ন, তার উপর আবার একটি বে-আড়া ম্যাপ্ আঁকতে হবে।

চিরকাল ম্যাপ খুব ভালো আঁকতাম,—ভারতবর্ষের ম্যাপতো ছিল জল-ভাত। আমার ম্যাপ আঁকা দেখে মাষ্টারেরা মুগ্ধ

হয়েছেন—কিন্তু বিহার আর উড়িষ্যার ম্যাপ কখনো আঁকিনি। এ বছরে বিহার আর উড়িষ্যার ম্যাপ আঁকতে দেওয়া হয়েছে ইতিহাসের প্রশ্নপত্রে,—নম্বরও বোধ হয় অনেক ছিল।

England's works in India থেকে যে কয়টি প্রশ্ন এসেছে,—ভীষণ শক্ত। ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে আফিং থেকে কি ভাবে আয় করেন, এ বিষয়ে তাঁদের কি নীতি ইত্যাদি।

প্রশ্ন দেখে আমার তো মাথা গুলিয়ে গেল। শুন্‌লাম মেয়েদের ঘর থেকে কান্নার রোল উঠেছে—কেউ কেউ আবার ওয়াক্ দিচ্ছেন বমি করবার জন্যে।

যাক্ কোনো রকমে তো জোড়াতালি দিয়ে ইতিহাসের পরীক্ষা শেষ করলাম।

সংস্কৃত ভালোই জান্‌তাম,—পরীক্ষার দিন হলে গিয়ে দেখি আমাদের সবুজ কাগজে ছাপা সংস্কৃতের প্রশ্নপত্র দেওয়া হচ্ছে।

প্রশ্নপত্রতো নয় যেন ছোটখাটো একখানা পুঁথি বিশেষ। তিনঘণ্টা সময়ের মধ্যে উত্তর দিতে হবে।

যাই হোক্—ভগবানের নাম স্মরণ করে' শেষ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

নতুন মাষ্টারমশাই বিছানায় শুয়েছিলেন—আমাকে দেখেই লাফিয়ে উঠ্‌লেন—"কি নির্মল, পরীক্ষার শেষ? এইবার মুক্তি, মুক্তি, মুক্তি।"

বলেই তিনি যেন উল্লাসে ফেটে পড়লেন। হাঁ মুক্তি, নিশ্চয় মুক্তি, যদি পরীক্ষায় পাশ করতে পারি—স্কুল ছাড়্‌তে পারি।

কিছুক্ষণ পরই মেয়েদের স্কুলের পণ্ডিতমশাইকে বাবা ডেকে পাঠালেন। তিনি আসতেই বাবা বল্লেন—"দেখুনতো, সংস্কৃত কেমন দিয়েছে।"

পণ্ডিতমশাই প্রশ্ন করলেন—"কেমন পরীক্ষা হোলো?"

বল্লাম—"যদি ইতিহাসে পাশ করতে পারি তবে প্রথম বিভাগে চলে যাব।"

বাবা শুনে বল্লেন—"অত ফাঁকী দিলে কি আর ইতিহাসে পাশ করা যায়!"

পরীক্ষার পর মাকে ধরলাম—"আমাদের কয়েকটি বন্ধু দেওঘর বেড়াতে যাচ্ছে,—আমিও যাব। তুমি বাবাকে বলে অনুমতি নাও।—"

বাবাকে বলতে নিজের সাহস হোলো না—তাই মার কাছেই আর্জি পেশ করলাম।

মা বাবাকে বলে তাঁর অনুমতি চাইলেন—তিনিও শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন,—এবং আমাকে যাতায়াতের ভাড়া দিলেন।

আর আমাকে পায় কে? এই প্রথম বন্ধুদের সঙ্গে গিরিডির বাইরে বেড়াতে যাচ্ছি। —কি আনন্দ, কি আনন্দ!

শান্তিভূষণ রক্ষিত, বিপিনবিহারী সেন, অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আর আমি—এই চারজন বন্ধু যথা সময়ে দেওঘরে এসে উপস্থিত হলাম এবং ষ্টেশনের কাছে এক ধর্ম্মশালায় উঠলাম।

সমস্ত রাস্তা ট্রেনে সবাই গান করতে করতে, হল্লা করতে করতে এসেছি,—কেউ বাধা দেবার নাই; কেউ ধমক্ দেওয়ার নাই,—এ যে কি মুক্তির আনন্দ তা আর কি বলব।

রাত্রে এক হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে ধর্মশালায় রইলাম। সবাই অনেক রাত পর্যন্ত গল্প-গুজোব করে' ঘুমিয়ে পড়েছি,—হঠাৎ শেষ রাত্রে—শান্তি চিৎকার করে' উঠল—"ভূত, ভূত আমার গালে চাঁটি মেরেছে—।"

আমরা সবাই তড়্‌বড়িয়ে উঠে পড়লাম,—ঘরে একটি টেমী জ্বল্‌ছিল—তাও নিভে গেছে,—ঘর ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার।

বিপিন দেশলাই জ্বেলে আবার টেমীটা ধরালো,—ঘরে

আবার কিছুটা আলো হোলো।—সবাই ভূতের খোঁজ করলাম, কিন্তু ভূত কি অত সহজেই দেখা যায়?

তবে টেমীর আলোতে এ-ওর মুখের দিকে চেয়ে হাসাহাসি করতে লাগলাম। সবার নাকের ডগাটায় কালো কালি লাগানো! কে এ কাজ করল? আমরাই যে ভূত সেজে বসে আছি।

ভূতের ভয়ে সারারাত আর ভালো ঘুম হোলো না—তবুও চুপচাপ শুয়ে রইলাম।—রাতটা এখন কাট্‌লে হয়।

কিছুক্ষণ পর অজিত বলে উঠল—"আমার গালেও চাঁটি মারল কে?"

ভূত না হয়ে আর যায় না।—

এবার বিপিনের স্বর শোনা গেল—"না, জ্বালালে দেখছি,—আমাকেও থাপ্পর মেরেছে।"

আমরা সবাই এবার শশব্যস্তে উঠে বস্‌লাম। এ ঘরে নিশ্চয় কোনো ভূত আছে। চাঁটি, থাপ্পর, গোঁত্তা মারছে,—নাকের ডগায় কালির প্রলেপ দিচ্ছে—এখন গলা চেপে না ধরে!

এইবার ভূত ধরা পড়লো।—শান্তি রক্ষিত বল্লে—"এই যে বাবা ভূত—সশরীরে দেখা দিয়েছ—" বলেই দরজাটা খুলে দিল, একটা চাম্‌চিকে ফড়্‌ফড়্‌ করে' বাইরে উড়ে পালালো।—

তাতো হোলো! কিন্তু নাকের ডগায় কালি লাগালো কে?

অনেক গবেষণার পর ঠিক হোলো ঐ টেমীর কালো ধোঁয়াই আমাদের নাকে লেগেছে।

যাক্, এবার সব সমস্যার সমাধান হোলো। এবার আমরা পরম নিশ্চিন্তে বাকী রাতটুকু নাক ডেকে ঘুম দিলাম। —আর ভূতের উপদ্রব হোলো না।

পরের দিনই আমরা বাড়ী ফিরব। সকালে বৈদ্যনাথের মন্দির দেখতে বেরুলাম এবং সেখানে সবাই কিছু কিছু প্যাঁড়া কিন্‌লাম বাড়ীর জন্যে।—

আমাদের দেওঘরের অভিযান শেষ করে' প্যাঁড়াগুলি নিয়ে আমরা আবার ট্রেনে চড়লাম।—

তখন দেওঘর থেকে জসিডি পর্যন্ত ছোট গাড়ী ছিল। আমরা সেই গাড়ীতে উঠ্‌লাম। গাড়ী প্রায় খালি। দেখ্‌লাম একজন ভদ্রলোক গাড়ীর বেঞ্চে শুয়ে নাক ডেকে ঘুম দিচ্ছেন,—উপরের বাঙ্কে তাঁর কিছু মাল-পত্তর।

শান্তি ট্রেনে উঠেই আবিষ্কার করলো ভদ্রলোক সঙ্গে অনেক প্যাঁড়া নিয়ে যাচ্ছেন,—উপরের বাঙ্কে সেগুলি একটা ঝুড়ির মধ্যে রয়েছে।

ট্রেন ছাড়লো, ভদ্রলোক অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। শান্তি তড়াক্ করে' লাফিয়ে উঠ্‌ল আর ভদ্রলোকের ঝুড়ি থেকে কিছু প্যাঁড়া নিয়ে খেতে লাগল—"আরে, আমরা ঠকেছি,—এই ছাখ্ কত বড় বড় প্যাঁড়া আর খেতে কি সুন্দর।"

আর বলা-কওয়া নেই। শান্তি তাঁর ঝুড়ি থেকে সব প্যাঁড়াগুলি বের করে' নিয়ে আমাদের গুলি একত্র করে' তাঁর ঝুড়িতে রেখে দিল অতি সাবধানে।

ভদ্রলোক গাঢ় ঘুমে অচেতন। তাঁর অনেকগুলি প্যাঁড়া আমরা পেয়ে গেলাম। শান্তি বল্লে—"আমরা ঠকব কেন।"

আমরা ভদ্রলোকের বড় প্যাঁড়াগুলি নিয়ে গিরিডির ট্রেন ধরলাম। ভদ্রলোক আমাদের ছোট প্যাঁড়াগুলি নিয়ে সোজা কলকাতায় চলে গেলেন।

—আটত্রিশ—

একদিনের জন্যে বন্ধুদের সঙ্গে প্রথম স্বাধীনভাবে দেওঘর ভ্রমণ—এ আনন্দময় স্মৃতি আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে রইল।

একদিনেই যেন নতুন জীবন লাভ করলাম,—এ স্বাধীনতা আমার শরীরে মনে যেন রসায়নের কাজ করল। পড়া নাই, মাষ্টার নাই, বাধা দেবার কেউ নাই,—ওঃ, কী আনন্দ, কী আনন্দ!

ম্যাট্রিক হয়ে গেছে, ফল বেরুতে এখনো দুই তিন মাস বাকী,—কাজেই এ সময়টা পরিপূর্ণভাবে সার্থক করতে হবে।

এর মধ্যে বাবা আর একজন মাষ্টার ঠিক্ করলেন,—আমাকে কেমিষ্ট্রি পড়াবেন।

ফলই এখনো বেরুলো না,—এখনই কলেজের বই পড়ে' লাভ কি?

বাবা বল্লেন—"পাশ করলে কলেজে পড়তে হবে,—যদিও আই-এ পড়্বি, তবু তোর কেমিষ্ট্রি নিতে হবে। ওতে ভালো নম্বর ওঠে।"

এ মাষ্টারের নাম বিনয় ভৌমিক, আমার আগের বছর অর্থাৎ অজিত নাগদের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করে' সিটি কলেজে পড়ছে। কেমিষ্ট্রি ভালো জানে।

ছিল বন্ধু হোলো মাষ্টার।

বিনয় ভৌমিক খানিকক্ষণ এসে আমাকে কেমিষ্ট্রি পড়াতে লাগ্লো।

আঃ, কী জ্বালাতন,—বন্ধুরা সবাই হাস্ছে, খেল্ছে—আড্ডা মারছে, আমার আবার বন্দী জীবন।

বিনয় ভৌমিককে এ কথা বল্লাম। সে বল্লে—"তোমার বাবা যখন বলেছেন তখন একটু একটু কেমিষ্ট্রিটা বুঝে নাও। আমি বেশীক্ষণ পড়াব না। আমিতো বুঝি তোমার এখনকার মনের অবস্থা।"

যাক্—বিনয় এলেই আমি বইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করি,—একটুও মন লাগে না। বিনয়ও তা বোঝে। তাই সেও অল্পক্ষণ থেকে বিদায় নেয়।

বাবা এসে বিনয়কে প্রশ্ন করেন—"ও কেমন বুঝছে?" বিনয় বলে—"চমৎকার, চমৎকার,—Excellent."

একদিন বন্ধুর দল স্থির করলাম—শেষ রাত্রে উঠে হেঁটে উশ্রী প্রপাতে যাব, এবং সেখানে রান্না-বান্না করে' খাব।—

উশ্রী-প্রপাত গিরিডি থেকে প্রায় মাইল দশেক দূরে। হেঁটে যেতে হলে অনেক সময় লাগবে—তাই খুব ভোরেই যাওয়া স্থির হলো।

দশ-বারোজন ছেলে যাবে, সঙ্গে চাল, ডাল, আলু, ডিম প্রভৃতি নেওয়া হবে। আমাদের আর উৎসাহের শেষ নাই।—

সবাই বাড়ী থেকে কিছু কিছু চাল, ডাল দেবে—আর হাঁড়ি, ডেকচী, বালটি প্রভৃতি রান্নার সরঞ্জাম সঙ্গে নেওয়া হবে।

প্রতি দুইজনের কাঁধে থাকবে একটি করে' বাঁক, তাতে ঝুলিয়ে নেওয়া হবে ঐ সব রান্নার সরঞ্জামগুলি।

পরের দিন রাত থাকতেই আমরা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে জড় হলাম। দলের প্রায় সবাই এলো। তারপর জিনিষ-পত্তরগুলি বাঁকে বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে আমরা উশ্রী-প্রপাতের দিকে রওয়ানা হলাম।—

বাঁক কাঁধে নিয়ে দুজন দুজন করে' পথ চলেছি।

আমার সম্পর্কিত এক মামা—নাম তার পুলক,—তার সঙ্গে আমি জুড়ি হয়েছি—সে চলেছে আগে, আমি পিছনে,—কাঁধের বাঁকে ঝোলানো একটা বড় মাটির হাঁড়ি, তাতে ভর্তি চাল আর ডিম।

ফুর্‌ফুরে হাওয়া বইছে,—শীতটাও বেশ চন্‌চনে—হন্ হন্ করে'

আমরা এগিয়ে চলেছি। প্রাণে আনন্দের শেষ নাই,—সবার মুখেই গান।—

এখনো ঘুমন্ত গিরিডি। চারিধার কুয়াশার জালে আচ্ছন্ন,—শিশির পড়ছে টুপ্ টাপ,—চলার পথটা ভিজে ভিজে,—আমাদের কারুর পায়ে জুতো নাই। উপল-বহু উঁচু-নীচু পথ দিয়ে আমরা কোরাস গান গাইতে গাইতে চলেছি—"ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা—আমাদের এই বসুন্ধরা—।"

আমাদের গান শুনে কেউ কেউ জান্‌লা দিয়ে উঁকি মারছে, ভেবেছে হয়তো—নগর সংকীর্তন বেরিয়েছে।

একাদশীর চাঁদ পশ্চিমে হেলে পড়েছে।—মাঘ মাসের প্রত্যুষে—চাঁদের ক্ষীণ আলো গাছের মাথায় মাথায় ঝিক্‌মিক্ করছে; পাতায় পাতায় শিহরণ জাগছে। রোমাঞ্চ জাগছে একদল কিশোর অভিযাত্রীর।

দশ মাইল পথতো আর সোজা নয়। আমরা হাঁটছি তো হাঁটছিই,—হেঁটে হেঁটে ক্ষিধে পেয়ে গেছে। এক জায়গায় দেখলাম—একটি গ্রাম্য দোকানে জিলিপী ভাজা হচ্ছে।—

সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে' কিছু গরম জিলিপী খেয়ে নিলাম। পেটটা কিছু ঠাণ্ডা হোলো।

এইবার প্রায় উশ্রীর কাছাকাছি এসে গেছি—। পাকা রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছি। প্রপাতের ঝর্‌ঝর্ শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

অজিত বল্লে—"গিয়েই রান্না চড়িয়ে দেব—খিচুড়ি আর ডিমভাজা। দেখবি ক্যায়সা রাঁধতে পারি।"

এর মধ্যে হলো এক কাণ্ড।— পুলকমামা আর আমি বাঁকে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছি চাল আর ডিম মাটির হাঁড়ি করে'।

হঠাৎ পুলকমামা কাঁধ থেকে বাঁকটা নীচে ফেলে দিল।

ফটাস্ করে' মাটির হাঁড়ি ভেঙে দুখান্। চালগুলি পড়ে গেল আর ডিমগুলি ফেটে-ফুটে একাকার।

হাঁ হাঁ করে' অজিত তেড়ে এলো,—পুলকমামাকে এই মারে তো সেই মারে।—"আমার এত সাধের 'অর্পিণটন্' মুর্গীর তাজা ডিম রাস্কেল তুমি ভেঙে ফেল্‌লে। তোমার মাথা ভেঙে ফেলব।"

পুলকমামা অপ্রস্তুত হয়ে আমতা আমতা করে' বল্লে—"কি করব, হঠাৎ কাপড়টা খুলে গেছিল,—তাই কাপড় সাম্‌লাতে গিয়ে ঝাঁক পড়ে গেছে।"

যাই হোক্, কি আর করা যায়,—তখনই সবাই মিলে চালগুলি তুলে ফেল্লাম আর এক পাত্রে—আর ডিমগুলিও যথা সম্ভব বেছে বেছে তোলা হলো।

অজিত বল্লে—"আজ পুলকমামার বরাতে একাদশী,—ওকে উপোস করিয়ে রাখব। একটু আক্কেল নাই, কাপড় খুলে গেছে বলে আমার এমন ডিমগুলো নষ্ট করবে। আমার অর্পিণটন মুর্গীর তাজা ডিম।"

বেলা প্রায় ৯টায় আমরা উস্রী-প্রপাতে পৌঁছুলাম।

সেখানে একটু বিশ্রাম করে' স্নানের জন্য প্রস্তুত হলাম,—অজিত, পণ্টু, পাখী প্রভৃতি রান্নার ব্যবস্থা করতে লাগল।

ওরা রান্নায় ওস্তাদ।

স্নান করতে গিয়ে আর এক বিপদ।

পাহাড়ের উপর থেকে তিন ধারায় নীচে জল ঝরছে। মধ্যের ধারাটা বেশ চওড়া।

আমরা স্নানের জন্যে পাহাড়ের উপর উঠলাম। সেখানে ধারে ধারে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে জল জমে আছে। যেন বড় বড় পাথরের জল-ভর্তি চৌবাচ্চা।

উপরে উঠে সেই সব চৌবাচ্চায় নেমে স্নান করছি,—ভারী

আরাম লাগছে। এমন সময় একজন বল্লে—"ঐ ছাখ্ কয়েকটা পুঁটি মাছ স্রোতে ভেসে যাচ্ছে।"

ছুটলাম পুঁটি মাছের পিছনে,—ধরতে হবে। খিচুড়ির সঙ্গে পুঁটিমাছ ভাজা চমৎকার জমবে।

উপরের পাথরগুলি বেজায় পিছল, খুব সাবধানে চল্‌তে হয়।

পুঁটিমাছের ঝাঁকের পিছনে ছুট্‌তে গিয়ে মুখ থুব্‌ড়ে পড়লাম সেই বড় ধারাটার কাছে আর গড়াতে গড়াতে চল্লাম নীচের দিকে।

ধারার তোড়ের মুখে পড়লে আর রক্ষা নাই, একেবারে তলিয়ে যাব—অর্থাৎ সাক্ষাৎ মৃত্যু।

আমার এই অবস্থা দেখে বন্ধুরা ছুটে এলো আমাকে বাঁচাতে। তারাও পিছল পাথরের জন্যে তাড়াতাড়ি আস্‌তে পারছে না।

এমন সময় অজিত নাগ ছুটে এলো আমার কাছে, এবং সেও মুখ্ থুব্‌ড়ে পড়লো পাথরের উপর।

আমি গড়াতে গড়াতে একটা পাথরে এসে ধাক্কা খেলাম। অজিতও গড়িয়ে গড়িয়ে আমার কাছ পর্যন্ত এসে সেই বড় পাথরটা ধরে' ফেল্ল। দুজনেই বড় জোর বেঁচে গেলাম।

এতক্ষণে আমার স্নানরত বন্ধুরা এসে পড়েছে। তাদেরও মুখ শুকিয়ে গেছিল। ঐ জলের তোড়ের মধ্যে পড়লে আর উপায় ছিল না।

যাক্ বিপদ কাট্‌লো। প্রায় সারাদিন হৈ হল্লা করে' সময় কাটালাম। বেলা প্রায় তিনটার সময় গরম গরম খিচুড়ি, ডিম-ভাজা, আলুরদম, আর কুদ্রুমের চাট্‌নী খেয়ে পেট আঁই ঢাঁই। অজিতরা রাঁধে ভালো।

পুলকমামা সেদিন সব চেয়ে বেশী খিচুড়ি খেয়েছিল।

আবার হাঁট্‌তে হাঁটতে রাত্রি প্রায় আটটায় বাড়ী ফিরলাম।

—উনচল্লিশ—

আমার সাহিত্য ও শিল্প সাধনা সমান ভাবেই চলেছে। কত কি লিখি, কত কি আঁকি। একদিন কিছু না লিখলে বা আঁকলে মনে হোত দিনটা বৃথাই গেল, বাজে কাজে দিন কাটল।

পড়াশোনার আর তেমন তাড়া নাই। নতুন মাষ্টারমশাই এখন ভাইদের পড়ান। এক বিনয় ভৌমিক আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে কেমিষ্ট্রি পড়াতে আসে।

সকালে বিকালে যখন-তখন সাইকেল নিয়ে ছুটি—কোথায় কোথায় চলে যাই—সেই শ্লেটনদী, পচম্বা, ভাহুয়া-পাহাড়ের অঞ্চল, নদীর ওপারের রাণীডি, ব্যাঙ্গাবাদ,—কোথাও যেতে বাকী থাকে না।

সঙ্গী পাখী এসে জোটে—তার দাদার সাইকেল নিয়ে। রাত থাক্‌তে আমার জান্‌লার পাশে এসে টিং-টিং করে। আমি প্রস্তুতই থাকি—সাইকেল নিয়ে প্রভাতের প্রথম আলোতে বেরিয়ে পড়ি তার সঙ্গে,—কী অনাবিল আনন্দ, কী অপূর্ব উত্তেজনা।

ফাল্গুনের সুন্দর সকাল, গাছে কোথাও শুনি কোকিলের মধুর কণ্ঠ, কোথাও পাপিয়ার সুরেলা ছন্দ,—হাস্‌না-হানার মিঠে গন্ধ ভেসে আসে মৃদু-মন্দ বাতাসে,—প্রাণ আকুল করে।

নদীর ধারে গিয়ে দেখি শালবনে-বনে নতুন চোখ জুড়ানো কচি পাতা হাওয়ায় দোল্ খাচ্ছে। শালবনের মধ্যে মধ্যে বিশাল পলাশ গাছ তার ফুলের লাল লাল মশাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবুজ পটভূমির মধ্যে লালের ছোপ—সে যে কী শোভা তা আর কী বলব।

পরিষ্কার আকাশ, পরিষ্কার বাতাস—আমাদের দুটি কিশোর মনও তেমনি পরিষ্কার,—কোনো কুটিলতা, কোনো মলিনতা নাই।

তাই প্রকৃতির এ স্নিগ্ধ পরিবেশের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণরূপে নিজেদের খাপ খাইয়ে ফেলতাম।

এই সময়ে 'আশা' নাম দিয়ে আমরা একটা হাতের লেখা পত্রিকা বার করলাম। চারজন তার পরিচালক হলাম,—আমি, বসন্তকুমার দত্ত, অজিতকুমার নাগ ও সুশীলকুমার মিত্র। এই পরিচালক চতুষ্টয়ের পদবীর প্রথম অক্ষরগুলি নিয়ে আমি পরিচালক বর্গের একটা সংক্ষিপ্ত নাম স্থির করলাম 'বদনামি'।

বসুর ব, দত্তের দ, নাগের না আর মিত্রের মি—এই হোলো 'বদনামি' নামের ইতিহাস।

মহা-উদ্যমে আমরা কাগজ চালাতে লাগলাম। বসন্ত ভালো ছবি আঁকত,—সে সুন্দর সুন্দর রঙীন ছবি, রঙ্গ-চিত্র ব্যাঙ্গ-চিত্র প্রভৃতি আঁকতে লাগল,—আর আমরা গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা লিখে লিখে কাগজ পূর্ণ করতে লাগলাম। আমি কবিতা লিখি আর ছবি আঁকি।

'আশা'য় প্রকাশিত আমার দুটি কবিতার কিছু কিছু অংশ আমার মনে আছে।

'শরৎ' সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখেছিলাম—

সোনার আলো পড়ছে ঝরে,
বাদল হল দূর।
ফুল-বাগানের কুঞ্জগুলি
গন্ধেতে ভরপুর।
কুর্চি-কেয়া-কদম ফুলে
ভোরের হাওয়া উঠ্‌ছে দুলে,
হাওয়ায় হাওয়ায় আসছে ভেসে
হাজার পাখীর সুর।
সোনার আলো পড়ছে ঝরে,
বাদল হল দূর।

—ইত্যাদি।

আর 'বাদল' সম্বন্ধে লিখেছিলাম—

বাদল আসিল ঘনঘটা সাথে,
চকিতে চমকে আলা,
গর্জন করে জলদপুঞ্জ
কর্ণে লাগায়ে তালা।
বৃষ্টির ধারা ঝরিছে প্রচুর,
নদী খাল বিল্ জলে ভরপুর,
মেঘের আড়ালে সূর্যি ঠাকুর
লুকায়েছে আজ ত্রাসে,
দাদুরীর হাঁক, চাতকের ডাক
অবিরত কানে আসে।

—ইত্যাদি।

এই "আশাতে" আমাদের সাম্প্রতিক উশ্রী-প্রপাতের ভ্রমণ কাহিনী বার হোলো, তার সঙ্গে ছবি আঁকলাম আমি—কাঁধের বাঁকে বালটি, ডেক্‌চী প্রভৃতি নিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি প্রপাতের দিকে। ভ্রমণ-কাহিনীটা অজিত নাগ লিখল।

আমাদের কাগজের খুব প্রশংসা হোলো আর চাহিদাও বাড়ল। কিন্তু মাত্র একখানা কাগজ এক সঙ্গে আর কয়জন পড়তে পারে? তাই আমরা মুশকিলে পড়লাম। ঠিক করলাম একজন পাঠক তিন দিনের বেশী তার বাড়ীতে কাগজ রাখতে পারবে না।

কল্‌কাতা থেকে যে সব গুণী জ্ঞানী আসেন আমরা তাঁদের পাকড়াও করি, তাঁদের কাছ থেকে রসদ সংগ্রহ করি। যিনি ছবি আঁকতে পারেন তাঁর কাছ থেকে ছবি আদায় করি, যিনি লিখতে পারেন তাঁর কাছে লেখার দাবী জানাই।

তাঁরাও ছোটদের এই আবদার স্নেহের সঙ্গেই পালন করেন।

মনে পড়ে এক শিল্পীর কাছ থেকে আমরা কয়েকটি সুন্দর ছোট ছবি ও ছড়া আদায় করেছিলাম।

আমাদের বাড়ীর শিউলি গাছতলায় শরতের প্রভাতে রাশি রাশি শিউলিফুল ঝরে' পড়ত। শিশির-ভেজা সবুজ ঘাসের উপর শাদা শাদা ফুল পড়ে আছে—এই দৃশ্য আমি রং দিয়ে আঁকলাম—নীচে দিলাম রবীন্দ্রনাথের কবিতা "শিউলি তলার পাশে পাশে—ঝরাফুলের রাশে রাশে।"

ছবিটির খুব প্রশংসা হোলো।

আর একটি ছবি এঁকেছিলাম—"উষার উঁকি।" পূবগগনে মেঘে মেঘে রঙের ছোপ্ লেগেছে,—নীচে শুক্‌নো নদীর বালুর চড়ার একপাশে একটু জলের ধারা, তাতেও লাল্‌চে রং ধরেছে, দূরে কয়েকটি শালগাছ, আকাশে পাখী উড়ছে, সবে মাত্র সকাল হচ্ছে।

ছবিটিতে অনেক রকম রং দিয়েছিলাম,—বেশ খোল্‌তাই হয়েছিল।

আমাদের স্কুলের বাংলার শিক্ষক হিমাংশুবাবু আমাদের এ বিষয়ে খুব উৎসাহ দিতেন। তাঁর লেখা চাইবামাত্র আমরা পেতাম।

একবার আমি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান "লেগেছে অমল-ধবল পালে"র একটি ব্যাঙ্গানুকৃতি অর্থাৎ parody রচনা করি। তার সঙ্গে কয়েকটি ছবিও এঁকেছিলাম। সে কবিতাটির কয়েকটি লাইন মাত্র মনে আছে।

—"হাসে প্রিয়া যবে খল্ খল্ খল্—
কিবা সে দন্তরুচি,
মনে হয় কালো পাথর-বাটিতে
শাদা নারিকেল কুচি।"

তখনকার দিনে ঐ কবিতাটি আমার বন্ধুদের মুখে মুখে ফিরত।

আমার পরবর্তী কালের বহু বিখ্যাত কবিতা এই "আশা"তে বার হয়।

আমার প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'চন্দ্রভায়ার পদ্মাপার' এই "আশা"তেই প্রথম বার হয়। এটি পরে প্রবাসীর 'ছেলেদের পাত্‌তাড়িতে' প্রকাশিত হয়েছিল।

মোটকথা আমাদের এই 'আশা' পত্রিকা গিরিডি শহরে বেশ একটা আন্দোলন তুলেছিল।

যদিও পরিচালকবর্গের নাম দিয়েছিলাম 'বদনামি' কিন্তু বদনাম আমাদের হয় নি বরং অভিনন্দনের পর অভিনন্দনই আমরা পেয়েছি—'বদ্‌নামি' সুনামই লাভ করল।—

গিরিডিতে তখন কোনো ছাপাখানা ছিল না, থাকলে হয়ত "আশা" ছাপার অক্ষরেই প্রকাশিত হোত।

এই সময় আর একটি তরুণের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। তিনি গান-টান গাইতেন, কবিতা আর গল্পও লিখতেন।—তিনি আমাদের পত্রিকার জন্যে কিছু কিছু কবিতা লিখেছিলেন। তিনি আমাদের সঙ্গে মাঠে ফুটবলও খেলেছেন। এঁর নাম শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (বর্তমানে বিখ্যাত সাহিত্যিক।)

চল্লিশ

আমাদের বাড়ী থেকে ডাকঘর প্রায় দুই মাইল দূরে। শীগ্গিরই আমাদের পরীক্ষার ফল বেরুবার কথা, তাই আমরা রোজই সকালে ডাকঘরে গিয়ে হাজির হই নতুন কিছু খবর পাওয়া যায় কিনা, তাই জানবার জন্যে।

আমাদের ক্লাশের অনেকেই যায়। একদিন একটি ছেলের নামে পাটনা থেকে একটি চিঠি এলো।

সে ডাকঘরেই গেছিল,—চিঠিখানা পেয়েই সে উল্লাসে চিৎকার করে' উঠল—"হুর্‌রে—আমাদের পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে,—আমি প্রথম বিভাগে পাশ করেছি।"

আমরা তাকে ঘিরে ফেল্লাম,—চিঠিখানা নিয়ে সবাই কাড়াকাড়ি করতে লাগল,—যারা যারা গিরিডি স্কুল থেকে পাশ করেছে তাদের নাম এই চিঠিতে আছে।

আমার বড় বড় নিশ্বাস পড়ছে, সর্বনাশ, যদি চিঠিতে আমার নাম না থাকে তা হলে কি হবে,--কোথায় আমার মুখ থাক্‌বে!

শুনলাম গিরিডি স্কুল থেকে সব শুদ্ধ ২১ জন পাশ করেছে,—৯ জন প্রথম বিভাগে, ৭ জন দ্বিতীয় বিভাগে আর ৫ জন তৃতীয় বিভাগে।

অনেক কষ্টে চিঠিখানা আদায় করলাম। দেখলাম প্রথম বিভাগের নয়জনের মধ্যে আমার নাম রয়েছে। প্রথম ভাবলাম চোখে বুঝি ভুল দেখছি,—বার বার করে' দেখলাম,—তারপর রুদ্ধ নিশ্বাসে ছুটলাম সাইকেল করে' বাড়ীর দিকে।

রাস্তায় যাকে দেখি তাকেই এই সুখবরটি জানাই। পথে দেখলাম ছোটুয়া আসছে। তাকে চিৎকার করে' বল্লাম—"ছোটুয়া, first division"—আর কিছু বলার আগেই আমার সাইকেল

ঝড়ের মত ছুটে বেরিয়ে গেল। শুন্‌লাম ছোটুয়ার অস্পষ্ট কথার অংশ—"আরে ইয়ার—"আর কিছু কানে গেল না।

আমাদের বাড়ীর বাইরের রোয়াকে আমার মেজমামা বসেছিলেন। তিনি তখন বাতে ভুগছেন। আমি দূর থেকেই তাঁকে জানালাম—"First Division", অমনি মেজমামা বেতো পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভিতরে খবর দিতে ছুটলেন।

নতুন মাষ্টারমশাইকে এসে এই খবরটা দিলাম। তিনি খুব খুশি হয়ে বল্লেন—"যাক, এতদিনকার শ্রম সার্থক হেলো।"

বাবা কিন্তু খবরটা শুনে একটু হেসে বল্লেন—"যা, গাধা কোথাকার, পরীক্ষার খবর এখনো বেরুবার দেরী আছে শুনলাম। তুই বাজে খবর শুনেছিস্,—কেউ হয়ত ধাপ্পা দিয়েছে।"

আমি বল্লাম—"পাটনা থেকে নলুর কাছে চিঠি এসেছে,—তাতে পরিষ্কার দেখলাম প্রথম বিভাগে আমি পাশ করেছি—আমরা নয়জন প্রথম বিভাগে,—তাদের মধ্যে আমরা সাতজনই বাঙালী।"

বাবা প্রশ্ন করলেন—"কে কে প্রথম বিভাগে পাশ করেছে দেখলি— ?"

আমি বল্লাম—"বসন্ত, সুশীল মিত্র, গঙ্গেশ রায়, বিজয় মুখার্জি, শান্তি রক্ষিত, বিপিনবিহারী সেন, আর আমি।"

বাবা বল্লেন—"আর দুজন কে কে ?

আমি উত্তর দিলাম—"আবদুল্ রেজাক আর জেরালড্ ডেভিড্ গেড্।"

বাবা পুরোপুরি বিশ্বাস করলেন না—তিনি জানেন আমি ইতিহাস পরীক্ষা খুব খারাপ দিয়েছি।

তিনি সেইদিনই পাটনায় তাঁর এক বন্ধুপুত্রের কাছে টেলিগ্রাম করলেন আমার রোল্ নম্বর দিয়ে।

বিকেলে টেলিগ্রামের উত্তর এলো—

"Roll Gir.—Placed in the first dvision."

এইবার বাবার বিশ্বাস হোলো। তিনি দেখলাম বেশ খুশি হয়েছেন। বল্লেন—"যাক্, তা হলে সত্যিই প্রথম বিভাগে গেছিস্। তোর নম্বরগুলি আনাতে হবে।"

তখনকার দিনে টাকা পাঠিয়ে নম্বর আনতে হোত। বাবা টাকা পাঠিয়ে দিলেন।

পরের দিন বাবার নামে পাটনা থেকে আরো চিঠি এলো। সবার চিঠিতেই আমার পাশের খবর।

বাবা এইবার বল্লেন,—"যাক্, পাশ করেছিস্—এবার তোকে কল্‌কাতা যেতে হবে কলেজে পড়তে। আমি ভেবে দেখলাম কলকাতার সেণ্টপলস্ কলেজটাই ভালো। ওখানে ছেলেও অল্প, আর পড়াশুনাও ভালো হয়। সাহেবদের কলেজ তাই ফাঁকি দেবার জো নাই।"

কল্‌কাতায় পড়তে যাব শুনে আমার মনটা নেচে উঠ্‌ল।

বাবা আমার পাশ করা উপলক্ষ্যে বাড়ীতে একটা ভোজের ব্যবস্থা করলেন। বাবার বন্ধু, আমার বন্ধু আর আত্মীয়েরা সেই ভোজের আসরে জড় হলেন। খুব ধুমধাম্ করে' খাওয়া-দাওয়া হোলো।

ছোটুয়া খাওয়া-দাওয়া সেরে ভুঁড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বল্লে—"আরে ইয়ার—পাশের তো মজা আছে দেখছি। আজ্‌কের মাংসটা বড় বঁড়িয়া হুয়েছিল।" বলেই মস্ত একটা ঢেঁকুর তুল্ল।

আমি একটু রসিকতা করে' বল্লাম—"দেখি তোর পেট কতটা ফুলেছে।"

ছোটুয়া তার পেট্‌টা আমায় দেখালো। দেখ্‌লাম নাদুস্-নুদুস্ ভুঁড়িটা বেশ ফুলেছে।

দুষ্টমি করে' বল্লাম—"আরো ফোলাতো দেখি।" ছোটুয়া

তার ভুঁড়ি আরো ফোলাতে লাগ্‌লো, আমি গদাম্‌ করে' মারলাম তাতে এক মোক্ষম ঘুঁসি।"

ছোটুয়া পেটে হাত দিয়ে বসে পড়লো—"আরে বাপ্‌রে বাপ্‌, জান্‌ গিয়া রে ইয়ার—"

আমি তো অপ্রস্তুত। রসিকতা করতে গিয়ে এযে মারাত্মক কাণ্ড করে' বস্‌লাম।

ছোটুয়ার ভুঁড়িতে আস্তে আস্তে হাত বুলাতে লাগ্‌লাম। বল্লাম—"যা হবার তা হয়েছে ভাই, মাফ্‌ কর্‌। বাবার কানে তুলিস্‌ না।"

ছোটুয়া অল্পেতেই সুস্থ হোলো। সে বল্লে—"আরে ইয়ার, পেটে লেগেছে বলে দুঃখ নাই, এমন মাংসটা বেরিয়ে যেত—তাই ভয় হয়েছিল।"

স্থির হোলো আমি কল্‌কাতার সেণ্টপলস্‌ কলেজে পড়ব, আর কলেজের বোর্ডিংএ থাক্‌ব।

আমার সিদ্ধান্ত শুনে বন্ধু শান্তি রক্ষিত বল্লে—"আমিও সেণ্টপলস্‌ কলেজে পড়ব—আর বোর্ডিংয়ে থাক্‌ব।"

শুনে আমার খুব আনন্দ হোলো।

॥ এই খণ্ডে যে-সব বিশিষ্টলোকের নাম আছে ॥

বর্ণানুক্রমিক

প্রথম খণ্ড—সমাপ্ত